

এইসব দিনরাত্রি

হুমায়ূন আহমেদ

মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ভুবে যাওয়া ভালো

এইখানে-

পৃথিবীর এই ক্রান্ত এ অশান্ত কিনারের দেশে

এখানে আশ্রয় সব মানুষ রয়েছে

(এইসব দিনরাত্রি : জীবনানন্দ দাশ)

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG



সন্ধ্যার পর থেকে নীলুর কেমন যেন লাগতে লাগল। কেমন এক ধরনের অস্বস্তি। হঠাৎ খুম ভাঙলে যে রকম লাগে সে রকম। সমস্ত শরীর কিম্বা ধরে আছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। কম্পানপুরের দিকে শহর তেমন বাড়তে শুরু করেনি। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিলের মতো খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে। গত শীতের আগের শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস নামছিল। কি অদ্ভুত দৃশ্য। এ বৎসর নামবে কি না কে জানে। বোধ হয় না। শহর এগিয়ে আসছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না।

ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বেশ শীত পড়েছে এবার। আজ কালের মধ্যেই লেপ নামাতে হবে। নীলু বাড়ির আঁচলে মাথা ঢেকে দূরে ঝিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

বসার ঘরে তার নন্দ চৌকিয়ে চৌকিয়ে পড়ছে। “ক, খ, গ ও চ, ছ, জ দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ। ইহাদের কখ ও চছ বাহু দুইটি সমান। প্রমাণ কর যে...” মিষ্টি গলা শাহানার। পড়াটা সুনতেও গানের মতো লাগছে। আজ কি গুর প্রাইভেট মাষ্টারের আসার তারিখ? আজ বুধবার না মঙ্গলবার? নীলু মনে করতে পারল না। ভদ্রলোক বুধবারে আসেন। নীলু মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যেন আজ বুধবার না হয়।

বুধবার হলোই ভদ্রলোক আসবেন। এবং নীলুকে সারাক্ষণ তাদের আশেপাশে বসে থাকতে হবে। নজর রাখতে হবে। কারণ শাহানা গত সন্ধ্যাই চোখ-মুখ লাল করে তাকে বলেছে, ভাবী এই স্যারের কাছে আমি পড়ব না।

নীলু অবাক হয়ে বলেছে, কেন?

স্যারটা ভালো না ভাবী। চেয়ারের নিচে পা দিয়ে সারাক্ষণ আমার পা ছুঁতে চায়। কি যে বোলে। হঠাৎ হয়তো লেগে গেছে।

না ভাবী, হঠাৎ না। আমি বতই পা সরিয়ে নেই সে ততই নিজের পা এগিয়ে দেয়।

নীলু আর কিছু বলেনি। কিন্তু বললেই তো আর মাষ্টার বদলানো যায় না। এত কম টাকায় পাওয়াও যাবে না কাউকে। মাষ্টার ছাড়া চলবেও না। প্রিটেটে শাহানা অংকে পেয়েছে এগারো। তাদের বড় আপা গম্ভীর হয়ে জানিয়ে দিয়েছেন শাহনাকে যেন ইলেকটিভ অংকে কোচ করানো হয়। প্রাইভেট মাষ্টার হোসাউ করতে হয়েছে বহু ঝামেলা করে। কিন্তু বুড়োমত এই ভদ্রলোকের একি কাজ। অথচ ভালো মানুষের মতো চেহারা। পড়ায়ও ভালো। কত ধরনের মানুষ থাকে হুঁসিয়ারে।

নীলু ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। বারান্দা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।

আবার ভেতরে যেতেও ইচ্ছা করছে না। কেন জানি ইচ্ছা হচ্ছে চাঁচিয়ে কাঁদতে। এ রকম তার কখনো হয় না। নীলুর একটু ভয় ভয় করতে লাগল।

বাড়িতে সে এবং শাহানা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সবাই খিলগাঁয়ে এক বিয়ের দাওয়াতে গেছে। রাত এগারোটার আগে ফিরবে না। কিংবা কে জানে হয়তো আরো রাত হবে। বারোটো, একটো বাজবে।

শাহানা ভেতর থেকে ডাকল, ভাবী একটু শুনে যাও তো। নীলু ভেতরে ঢুকল।

জানালায় কে যেন খট খট করছে ভাবী। আমার ভয় ভয় লাগছে। তুমি এখানে বসে থাকো।

নীলু বসল তার পাশে। শাহানা বলল, তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন ভাবী?

কি রকম দেখাচ্ছে?

মুখটা কি রকম কালো কালো লাগছে।

কালো মানুষ, কালো কালো তো লাগবেই।

শাহানা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভাবীর দিকে। ভাবী কালো ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অস্বস্ত একটা স্নিগ্ধতা আছে। আর এত সুন্দর ভাবীর চোখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এ রকম তাকিয়ে আহ কেন শাহানা?

শাহানা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। নীলু বলল, আজ কি বার, মঙ্গলবার না বুধবার?

মঙ্গলবার।

তোমার স্যার আজ আসবে না তো?

না।

শাহানা ইতস্তত করে বলল- স্যারের কথাটা তুমি কাউকে বলোনি তো ভাবী?

না।

কাউকে বলবে না। বড় লজ্জার ব্যাপার। তুমি ভাবী ভ্রুলোককে নিষেধ করে দাও।

প্রাইভেট মাস্টার আমার লাগবে না।

নীলু কিছু বলল না। আড়চোখে দেখল শাহানার ফর্সা গাল লাল হয়ে আছে। এই মেয়েটা বড় সহজেই লজ্জা পায়। তার এ জন্যে লজ্জা পাবার কি আছে?

নীলু উঠে দাঁড়াল। শাহানা বলল, যাল্ল কোথায় ভাবী?

যাচ্ছি না। সোফায় একটু শোব। শরীরটা ভালো লাগছে না শাহানা।

কি হয়েছে?

বুঝতে পারছি না।

শাহানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল- সে সব কিছু না তো? তিন বছর আগে একদিন বিকেনবেরল ভাবী তার চুল বেগি করে দিচ্ছিল। হঠাৎ ক্রান্ত হয়ে বলল, শাহানা, মাকে একটু ডাকো তো শরীরটা কেমন যেন করছে।

দেখতে দেখতে নেতিয়ে পড়ল সে। কি কাণ্ড কি ছুটাছুটি। পেটে তিন মাসের

গাঢ়। ডাক্তার এসে বললেন অ্যাবোরসান হয়ে গেছে। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।
পনেরো দিন হাসপাতালে থেকে কাঠির মতো হয়ে সে ফিরে এলো।

ডাক্তার ডয় ধরিয়ে দিলেন। বলে দিলেন খুব সাবধানে থাকতে হবে। অ্যাবোরসান
একটা স্বাভাবিক টেভেসি তার আছে। কিছু কিছু মেয়ের থাকে এ রকম।

শাহানা লক্ষ করল নীলু খুব ঘামছে। সে রকম কিছু নাভো? সে ভয়ে ভয়ে ডাকল,
ভাবী! নীলু তাকাল কিছু বলল না।

ভাবী, সে রকম কিছু না তো?

না বোধ হয়। ডাক্তার বলেছিল সাত মাস পার হলে ভয় নাই।

তোমার এখন কতদিন? আট মাস না?

হঁ।

পানি খাবে ভাবী?

না।

ভাবী, বাড়িওয়ালাদের বাসায় গিয়ে কাউকে ডেকে আনব?

না। কাউকে ডাকতে হবে না।

শাহানা একটা বালিশ এবং চাদর এনে দিল। মৃদুস্বরে বলল, সোফার উপরই শুয়ে
পাকো। চুল টেনে দিব?

কিছু করতে হবে না। তুমি পড়তে বসো তো। আমার শরীর এখন ভালোই।

সত্যি বলছ?

হঁ। শুধু শুধু মিথ্যা বলব কেন?

শাহানার পড়ায় আর মন বসছে না। ভাবী কেমন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। এমন
মায়া লাগছে দেখতে। শাহানার মনে হলো এই পরিবারে এসে ভাবী ঠিক সুখী হয়নি।
বিয়ের পর সব মেয়েরাই নিজের একটা আলাদা সংসার চায়। ভাবীও নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু
এখানে ভাবীর কোনো আলাদা সংসার নেই।

মাসের এক তারিখে সংসারের পুরো টাকাটা মার হাতে তুলে দেয়। সব কেনাকাটা
হয় মার হাতে। ভাল রান্না হবে না আলুভাজা হবে এই সামান্য জিনিসটাও মাকে
জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। মার মেজাজের দিকে লক্ষ রেখেই ভাবী সব কিছু করে তবু
মাকে মাঝে মাঝে এমন ঝারাপ ব্যবহার করেন যে শাহানার নিজেরই লজ্জায় মরে যেতে
ইচ্ছে করে।

একবার ভাবী তার নিজের মার অসুখের খবর শুনে একশটা টাকা পাঠাল
মানিঅর্ডার করে। তার রসিদ এসে পড়ল মার হাতে। তিনি এমন হৈচৈ তুললেন,
সব টাকা-পয়সা পাচার হয়ে যাচ্ছে গোপনে। নিজের যেকোনো চাই-না ইত্যাদি
ইত্যাদি।

ভাবী লজ্জায়-অপমানে নীল হয়ে গেল। কিন্তু একটি কথাও বলল না। বারান্দায়
দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগল। ভাবী না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হলে কি যে কাণ্ড হতো
কে জানে। ঝাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিত নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাবী খুব স্বাভাবিক। যেন
তেমন কিছু হয়নি। বিকেলে ঠিকই রান্না করল। রাতে সবাইকে খাইয়ে নিজে শাওড়ির
সঙ্গে খেতে বসল।

মা তখন আবার টাকার প্রসঙ্গ তুললেন, বৌমা শোনো, কিছু কিছু মেয়ে আছে স্বামীর বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করতে পারে না। সুযোগ পেলেই বাপের বাড়িতে যা পারে পাচার করতে চেষ্টা করে। মনে করে সেটাই আসল জায়গা। এটা ঠিক নয়। বিয়ের পর বাড়ি একটা- স্বামীর বাড়ি। ভাবী শাস্ত হবে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না মা। আমি আর পাঠাব না। আর যেটা পাঠিয়েছি সেটা সংসারের টাকা না। আমার নিজের টাকা।

তোমার আবার টাকা এলো কোথেকে?

ও আমাকে মাঝে মাঝে কিছু হাত-খরচ দেয়। সেটা আমি খরচ করি না।

তোমার আবার আলাদা হাত-খরচের দরকারটা কি? তুমি তো আর স্থল-কলোজে যাও না যে রিকশা ভাড়া বাস ভাড়া লাগবে? আর হাত খরচের সেই টাকাও তো সংসারের টাকা। ঠিক না?

জানালায় আবার খট খট শব্দ হচ্ছে। শাহানা ভয়ে ভয়ে ডাকল, ভাবী। ও ভাবী। নীলু উঠে বসল।

কি?

জানালায় কিসের যেন শব্দ হচ্ছে।

বাতাসের শব্দ। তুমি দেখো তো শাহানা ক'টা বাজে?

আটটা।

মাত্র আটটা?

কি হয়েছে ভাবী?

নীলু জবাব দিল না। হঠাৎ তলপেটে একটা তীব্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বোধ করল। অন্য কোনো শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। এর জাত আলাদা। নীলুর চোখ ভিজে গেল। সোফা আঁকড়ে ধরে সে ব্যথার ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করল।

এ রকম করছ কেন ভাবী?

নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল- মরে যাচ্ছি শাহানা। শাহানা কি করবে ডেবে গেল না। তার গা কাঁপতে লাগল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাড়িওয়ালার এক ভাগ্নে চিলেকোঠার ঘরটার থাকে। সে নাকি? শাহানা গলা ফাটিয়ে ডাকল, আনিস ভাই, আনিস ভাই! খেঁচু জবাব দিল না।

শাহানা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায় দাঁতি নেই। সে ছুটে গেল ডান দিকের একতলা বাড়িতে। বাড়িওয়ালা রশীদ সাহেব তার দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে থাকেন। সে বাড়ি তাল্লা বন্ধ। দোতলার বাড়িতেও কোনো পুরুষ মানুষ নেই। রোগা একজন মহিলা (যাকে শাহানা আগে কোনোদিন দেখেনি) বিরক্ত স্বরে বলল, ছুটাছুটি করে তো লাভ হবে না- টেলিফোন করো হাসপাতালে।

কোথায় আছে টেলিফোন?

রাস্তার ওপাশে হলুদ রঙের বাড়িটাতে যাও। বাড়ির সামনে কাঁঠাল গাছ আছে।
চিনতে পারছ?

শাহানা চিনতে পারল না- তবু ছুটে গেল। হলুদ বাড়ি। সামনে কাঁঠাল গাছ। রাস্তার
দু'পাশেই ঘন অন্ধকার। শীতের জন্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে সবাই। কেমন
তুতুড়ে লাগছে চারদিক। পান-বিড়ির একটা দোকানে কয়েকজন ছোকরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
দেখছে শাহনাকে। একজন বুড়ো রিকশাওয়ালাও গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে।

এই শাহানা। কি ব্যাপার?

শাহানা কয়েক মুহূর্ত আনিসকে চিনতেই পারল না।

খালি পায়ে কোথায় যাচ্ছ?

বড় বিপদ আনিস ভাই। ভাবী যেন কেমন করছে।

বাসায় কেউ নাই?

না।

তুমি বাসায় যাও আমি বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসি।

আনিস দৌড়ে গেল বড় রাস্তার মোড়ের দিকে। সেখানে মাঝে মাঝে বেবিট্যাক্সি
পাওয়া যায়।

নীলুকে পিছিতে নেয়া হলো রাত নটায়। মরণাপন্ন রুগীকে ডাক্তাররা নিতান্ত
অবহেলায় ইমার্জেন্সিতে ফেলে রাখেন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেটা বোধ হয় ঠিক
না।

দুজন ডাক্তার নীলুকে তৎক্ষণাৎ অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেলেন। একজন
আনিসকে বললেন, রুগীর অবস্থা খুবই বারাপ, প্রচুর ব্রিডিং হচ্ছে। রক্ত লাগবে। রক্তের
ব্যবস্থা করুন।

শাহানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে শব্দ শুনছে করে কাঁপছে। আনিস কোনো কারণ ছাড়াই
একবার তিন তলায় উঠছে একবার নিচে নেমে যাচ্ছে। রক্তের ব্যবস্থা কিভাবে করতে
হয় সে কিছুই জানে না।

রাত নটা একচল্লিশ মিনিটে একজন ডাক্তার এসে শাহনাকে বললেন, খুকি কান্না
থামাও। মেয়ে হয়েছে একটি। রুগী ভালোই আছে।

বাক্সটি? বাক্সটি?

খুব ভালো না, তবে ঠিক হয়ে যাবে।

দাঁড়ি গোফওয়ালা ডাক্তারটি হাসলেন। শাহানার ইচ্ছা হলো সে প্রচণ্ড চিৎকার করে
ঢাকা শহরের সবাইকে জানিয়ে দেয়, তোমরা শোন আমাদের ভাবীর একটি মেয়ে
হয়েছে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। ব্যাকুল হয়ে ক্রোদেতে লাগল, সে বড় ভয়
পেয়েছে।

ট্যা ট্যা করে একটি বাক্স কাঁদছে। এটি কি-তপ্ত বাক্স? একজন নার্স কি যেন বলছে
কিছুই কানে যাচ্ছে না। নীলু চোখ মেলতে চেষ্টা করল, চোখ পাথরের মতো ভারী।
কিছুতেই মেলে রাখা যাচ্ছে না। রাজ্যের ঘুম চোখে। চারপাশে কারা যেন হাঁটাইটি

করছে। মুখের ঠিক উপরে হলুদ আলো। চোখ বন্ধ তবুও সে আলো কেমন করে যে চোখের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

কাঁদছে। একটা ছোট শিশু কেমন অদ্ভুত শব্দে কাঁদছে। বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। নীলু ঘুমের অতলে তনিয়ে যাবার আগে পরিষ্কার শুনল, শাহানা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলছে—ভাবী তাকিয়ে দেখো তোমার বাবুকে।

নীলু ঘুমের মধ্যেই হাসতে চেষ্টা করল। নতুন শিশুটি কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো কিছুই এখন আর তার ভালো লাগছে না। পৃথিবীর আশা, আনন্দ সুখ একদিন হয়তো তাকে স্পর্শ করবে কিন্তু আজ করছে না। সে তার ছোট ছোট হাত মুঠি পাকিয়ে ক্রমাগত কাঁদছে।



বাবু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে।

ঘুমের মধ্যেই কি কারণে যেন তার নিচের ঠোট বেঁকে গেল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল নীলু। কি অপূর্ব দৃশ্য! এমন মায়া লাগে। চোখে পানি এসে যায়, বুকের কাছটায় ব্যথা ব্যথা করে। নীলু মৃদু স্বরে ডাকল, “এই বাবু এই।” বাবুর বাঁকা ঠোট আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আহ! কেন এত মায়া লাগে? নীলু নিচু হয়ে তার কপালে চুমু খেল। কেমন বাসি শিউলী ফুলের গন্ধ বাবুর গায়ে। কি অদ্ভুত সেই গন্ধ!

ভাবী।

নীলু চমকে সরে গেল। কারো সামনে আবুকে আদর করতে তার বড় লজ্জা লাগে। শাহানা হাসি মুখে দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবু জেগেছে ভাবী?

নাহ।

জাগলেই আমাকে খবর দেবে। আমি কোলে নেব।

ঠিক আছে দেব।

এ তো দেখি রাতদিনই ঘুমায়। এত ঘুমায় কেন?

কি জানি।

শাহানা এসে বসল বাবুর পাশে।

কি ছোট ছোট কান দেখেছ? ইদুরের কানের মতো। তাই না ভাবী?

হঁ।

ছোট কান যাদের তাদের রাগ খুব বেশি হয়। এরা খুব রাগ হবে, মা'র চেয়েও ও বেশি রাগী হবে।

নীলু কিছু বলল না। শাহানা বাবুর হাত ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ তারপর ইতস্তত করে বলল, ওকে কোলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে একটু বসব ভাবী?

ঘুম ভাঙার আগেই?

৩।

ঠিক আছে নিয়ে যাও। এসো আমি কোলে তুলে দেই।

শাখানা হাত পেতে বসল। নীলু ছোট একটা নিশ্বাস গোপন করল।

বাণীকে সে খুব কম সময়ের জন্যেই কাছে পায়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই তার শাখানা মনোয়ারা এসে বাবুকে নিয়ে যান।

গোদ উঠলেই, বাচ্চাকে তেল মাখাতে বসেন। তেল মাখানো এত প্রবল বেগে চলে যে নীলুর ভয় ভয় লাগে। সট করে একটা নরম হাড় হয়তো ভেঙে যাবে। তেল মাখানোতেই শেষ নয়। তিনি নাক ঠিক করতে বসেন, দীর্ঘ সময় ধরে নাক টিপে টিপে ধরেন। যাতে ভবিষ্যতে বাচ্চার খাড়া নাক হয়। তারপর বুড়ো আসুল দিয়ে খুঁতনিতে আর অল্প চাপ দেন দীর্ঘ সময় ধরে। এরকম করলে বাচ্চার মুখ পরবর্তী সময়ে ফজলি আমের মতো হবে না।

বেলা এগারোটার দিকে বাবুর গোসল হয়। নীলুর খুব ইচ্ছা গোসলটি সে নিজে করায় কিন্তু এখন পর্যন্ত সে সুযোগ পায়নি। একদিন ভয়ে ভয়ে বলেছিল, আমার কাছে দেন মা আমি করিয়ে দেই।

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— তুমি এসব পারবে না। কানে পানি ঢুকবে। কান পঁচবে। তোমাকে যেটা করতে বলছি সেটা করো। গরম পানি মিশিয়ে গোসলের পানিটাকে কুসুম গরম করো।

পানি কুসুম গরম করাও একটা দীর্ঘ কামেলার কাজ। লাল প্রাক্টিকের গামলায় নীলু কেতলি থেকে গরম পানি ঢালে। মনোয়ারা হাত ডুবিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, একি কাও বৌমা। এ তো আন্তন গরম পানি। যাও ঠাণ্ডা পানি এনে মেশাও। ঠাণ্ডা পানি মেশানোর পর তিনি আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, এ তো দেখি বরফের মতো ঠাণ্ডা করে ফেললে। কোনো একটা কাজও কি ঠিক মতো পারো না?

গোসলের পর পরই বাচ্চার ক্ষিদে পায়। সেই দুধ খাওয়ানোর পর্বেও মনোয়ারা পাশে বসে থাকেন। নীলুর বড় লজ্জা লাগে। কিন্তু কোনো উপায় নেই।

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটা ঠিকমত হচ্ছে কি না সেদিকে লক্ষ রাখেন।

একি বৌমা, বুকের সঙ্গে এভাবে চেপে ধরে আছ কেন? দম বন্ধ করে ম্যুরতে চাও নাকি? মাথাট। আরেকটু উঁচু করে ধরো। আহ্ আঁচল ধরে এত টানাটনি করছ কেন? এখানে পুরুষ মানুষ কি কেউ আছে যে লজ্জায় মরে যান?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মনোয়ারা খানিকক্ষণের জন্যে ঘুমুতে যান। তখন আসেন নীলুর স্বতর হোসেন সাহেব। তিনি মাস ছয়েক হলো রিটারার করেছেন। ঘরে বসে থাকার নতুন জীবনযাত্রায় এখনো নিজেকে পুরোপুরি অভ্যস্ত করে তুলতে পারেননি। নানান ধরনের কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছেন। কোনোটিতেই সফল হননি। ইদানীং হোমিওপ্যাথির বইটাই খুব পড়ছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে হোমিওপ্যাথির পরে চিকিৎসাশাস্ত্রে এখনো কিছু তৈরি হয়নি। ঠিকমত লক্ষণ বিচারটাই হচ্ছে আসল কথা।

নীলু তার শ্বশুরকে খুবই পছন্দ করে। সব সময় চেষ্টা করে তাঁর জন্যে বাড়তি কিছু করতে। সেটা কখনো সম্ভব হয় না। বাঁধা আয়ের বড় সংসারে কারো জন্যে বাড়তি কিছু করা যায় না।

দুপুরে মনোয়ারা ঘুমিয়ে পড়লে হোসেন সাহেব আসেন। দরজার বাইরে থেকে চাপা গলায় বলেন— টুনী কি ঘুমাচ্ছে বৌমা?

জ্বি বাবা। আসুন।

তিনি এসে হাসি মুখে বিছানার পাশে বসেন। নিচু স্বরে ডাকেন— টুনী, টুনী। টুনটুনী, তুনতুনী, তুনতুনী, তুনতুনী, তুনতুনী।

বাবুর এখনো নাম ঠিক হয়নি। যখন যার যা ইচ্ছা তাই ডাকে। একমাত্র হোসেন সাহেব প্রথম দিন থেকে টুনী ডেকে আসছেন।

এই নাম মনোয়ারার মোটেই পছন্দ নয়। প্রথম দিনেই তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন— কি টুনী টুনী করছ? টুনী একটা নাম নাকি?

টুনী নামটা খারাপ কি?

টুনী নামের ছেলেপুলেরা বড় হয় না। টুনটুনী পাখির মতো ছোট থাকে।

মানুষের বান্ধা বড় হয়ে মানুষের মতোই হবে। করো নাম হাতি রাখলেই সে হাতির মতো হবে নাকি?

বাজে তর্ক করবে না।

বাজে তর্ক কি করলাম?

আমার সামনে তুমি টুনী ডাকবে না, বাস। যদি ডাকতে ইচ্ছা হয় আড়ালে ডাকবে।

হোসেন সাহেব প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্ত্রীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেন। এই একটি ক্ষেত্রে করেননি। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার তিনি বেশ উচ্চস্বরেই ডাকবেন— টুনী, টুনী। ব্যাপারটা উদ্দেশ্যমূলক। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে একটা চাল চালছেন। নিজের পছন্দের নামটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তাঁর সাধনা যে পুরোপুরি বিফলে যাচ্ছে সেটা বলা ঠিক হবে না। তিনি ছাড়াও এ বাড়ির লোকজনও এক-আধবার মনের ভূলে টুনী বলে ফেলেছে। মনোয়ারা নিজেই একদিন বলেছেন।

হোসেন সাহেবের ধারণা এ রকম ভুল এরা করতেই থাকবে এবং এক সময় টুনী নামটিই স্থায়ী হবে।

হোসেন সাহেব নিচু গলায় বললেন— দেখতে কার মতো হয়েছে বৌমা?

বুঝতে পারছি না তো। সবাই বলছে গুর বাবার মতোই হয়েছে।

সফিকের মতো হয়েছে? আরে না। সফিকের সাথে কোনো মিল নেই। তোমার সাথে কিছু মিল আছে। গায়ের রঙটা পেয়েছে তোমার স্বাতন্ত্র্য। একেবারে গোলাপের মতো রঙ।

নীলু হাসি গোপন করবার জন্যে মুখ অন্যদিকে ফেঁসাল। সে বুড়ো মানুষটির এই দুর্বলতাটা খুব ভালো জানে, ফাঁক পেলেই তিনি স্ত্রীর প্রশংসে একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। এখন যেমন হয়েছে। নীলু বলল— চা খাবেন বাবা? এক কাপ চা করে দেই?

দাও। চিনি দিও না। চিনিটা শরীরের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর।

আই নাকি বাবা?

হী। চিনি যেমন ক্ষতি করে লবণও সে রকম ক্ষতি করে। এই জন্যে প্রেসার হলে লবণ খাবেন। কমাতে বলে ডাকারেরা। সাদা রঙের সব খাদ্যদ্রব্যই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

নীলু হেসে বলল- দুধ? দুধও তো সাদা।

হোসেন সাহেব অপ্রকৃত ভঙ্গিতে বসে রইলেন। নীলুর নিজের কাছেই খারাপ লাগতে লাগল। দুধের প্রসঙ্গটা না তুললেও হতো।

‘খাপনার চায়ে দুধ দেব বাবা?’

নীলু তার স্বত্তরকে খুব ভালোমতই চেনে। লিকার চা এক চুমুক খেয়েই তিনি ঝলপেন এক চামচ চিনি দাও তো মা। চিনি দেবার পর বলবেন- আধাচামচ দুধও দাও, কখন কখন লাগছে চাটা। জ্বাল বোধ হয় বেশি হয়েছে।

নীলু চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকে দেখল হোসেন সাহেব বাবুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। তিনি নীলুকে দেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন- হাত-পা নাড়ানাড়ি করছিল। আবলাম উঠে পড়ে কিনা। কোলে নিতেই শান্ত।

চা নিন বাবা।

চায়ে চুমুক দিয়ে হোসেন সাহেব স্বস্তির স্বরে বললেন- আহ ফাস ক্লাস চা হয়েছে মা, একটু বোধ হয় চিনি দিয়েছ?

এক চামচ দিয়েছি।

ভালো করেছ। বিনা চিনির চা বিষের মতো লাগে।

নীলু বলল- সিগারেট খাবেন? দিব?

দেখি দাও। তোমার শাতড়ি উঠে না পড়লে হয়।

উনার উঠতে দেরি আছে।

নীলু ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। হোসেন সাহেব এবং নীলুর মধ্যে এই গোপন ব্যাপার আছে। মনোয়ারা যখন ঘুমিয়ে থাকেন কিংবা বাইরে কোথাও যান তখন হোসেন সাহেব ইতস্তত করে বলেন- বৌমা দেখো তো সফিক তার সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে কিনা। ফেলে গেলে দাও একটা।

সফিক সিগারেটের প্যাকেট ফেলে যাবার লোক না। নীলু তার স্বত্তরের জন্যে সিগারেট আনিবে আলাদা লুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে সফিকের হোট ভাই রফিক সেখানে ভাগ বসায়।

ভাবী গোপন জায়গা থেকে একটা সিগারেট ছাড়তো।

নীলু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে- আমার কাছে নেই।

দাও না ভাবী, প্রিজ। এ রকম কর কেন?

উলায় নেই দিতে হয়। রফিক আয়েস করে সিগারেট চিনি দিয়ে বলে- তোমার চেহারা এত মায়া মায়া কিন্তু আচার-আচরণ এত কঠিন কেন?

কঠিন কোথায়? দিলাম তো একটা।

তুমি বলেই একটা দিলে পৃথিবীর অন্য সব ভাবীরা গোটা একটা প্যাকেট আনিবে দিত।

ভাই নাকি?

হ্যাঁ। এখন শোনো ভাবী, তুমি তোমার মেয়েলি বুদ্ধি দিয়ে একটা সমস্যার সমাধান করো। একটা কঠিন সমস্যা।

রফিক আজগুবি একটা সমস্যা হাজির করবে। সেই সমস্যার কোনো আগা নেই মাথা নেই। যেমন গত সপ্তাহেই সে গম্বীর মুখে বলল- আচ্ছা ভাবী ধরো একটা ছেলের একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। খুবই পছন্দ। রীতিমত 'লভ' যাকে বলে। এখন ছেলেটা মেয়েটাকে সেই কথাটা বলতে চায়। বা নিজের অনুভূতির ব্যাপারটা মেয়েটাকে বুঝতে দিতে চায়। কিভাবে সেটা করা উচিত?

নীলু হাসি মুখে বলল- মেয়েটা কে?

মেয়ে যেই হোক। তুমি সমস্যাটার সমাধান করো।

ছেলেটা একটা ঠিঠি লিখবে কিংবা বলবে মুখে।

তুমি একেবারে পাগল ছাগলের মতো কথা বলছ ভাবী। আমি চাচ্ছি একটা ইউনিক কিছু। যেখানে হাই ড্রামা থাকবে। সাসপেন্স থাকবে।

তাহলে এক কাজ করো মেয়েটার সামনে হঠাৎ বুক হাত দিয়ে ভয়ে পড়ো। তারপর গড়াগড়ি খেতে থাকো। যখন চারদিকে লোকজন জমে যাবে এবং মেয়েটিও এসে পাশে দাঁড়াবে তখন ফিসফিস করে বলো...

একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছ থেকে এরকম ঠাট্টা-তামাশা আশা করিনি। মোস্ট আনফরচুনট।

খুব সিরিয়াস নাকি?

রফিক জবাব না দিয়ে উঠে পড়ে।

ভাইয়ে ভাইয়ে এমন অমিল হয় কি করে নীলু প্রায়ই ভাবে। সফিকের সঙ্গে রফিকের কোনো মিল নেই। সফিক উত্তর মেরু হলে রফিক দক্ষিণ মেরু।

সফিকের চরিত্রে হাচ্চা কোন ব্যাপারই নেই। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠবে। কনকনে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল সারবে। নাশতা খেয়ে অফিসের জন্যে তৈরি হবে। এক ফাঁকে শুধু বলবে- নীলু দেখতো পত্রিকা এসেছে নাকি। সকালবেলা কথাবার্তা এই পর্যন্তই। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ-হঁ ছাড়া অন্য কোনো জবাব দেবে না।

পারিবারিক সমস্যার ব্যাপারগুলি সে শুনবে খুব মন দিয়ে। কখনোই কোনো প্রশ্ন করবে না। সমস্যার সমাধান করবে এক লাইনে। নীলু প্রথম দিকে বলত- কথা কম বলো কেন? কথা বলতে কি তোমার কষ্ট হয়? সফিক বলত- না, কষ্ট হয় না।

তাহলে? দিনরাত মুখ বন্ধ করে থাকো কিভাবে?

অন্যের কথা শুনতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

এটাও সত্যি নয়। সবাই মিলে হয়তো কথাবার্তা বলছে ইঠাং দেখা যাবে সফিক নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে। যেন কোথাও তার কোনো অঙ্গ নেই।

ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে এই নিয়েও তার কোনো উৎসাহ নেই। শাহান একবার বলল- ভাইয়া তুমি তো কখনো বাবাকে কোলে নাও না। সে হেসে বলেছে- ছোট বাক্স ঘাড় শক্ত হয়নি এই জন্যেই নেই না। একটু বড় হোক। বড়সড় হলে দেখবি কোল থেকে আর নামাব না।

শীতল পায়ই মনে হয় সফিকের ভেতর মায়া-মমতাটা বোধ হয় একটু কম। একটু - কমাটা অনেকটাই কম। নীলুর যখন এবারসন হলো। কি ডয়াবই অবস্থা। বেনা হালই কাটাতে হলো পনেরো দিনের মতো। এই পনেরো দিনে সফিক তাকে বহু গেল মাত্র তিন দিন। যেন বাইরের কোনো অল্প পরিচিত আত্মীয় তাকে দেখতে চায়। পাঁচ মিনিট বসেই উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে- যাই নীলু!

নীলুর চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। সে কিছু বলল না। চোখের জল গোপন রাখার জন্যে অন্যদিকে তাকাল। শাহানা অবাক হয়ে বলল- এখনই যাবে কি ভাইয়া, এই মাত্র তো এলে।

এস থেকে করব কী?

কান্নার সঙ্গে গল্প করো।

সফিক অবাক হয়ে বলেছে- কী গল্প করব? মানুষ এমন অদ্ভুত হয় কেন? প্রায় পাঁচ বছর হয়েছে তাদের বিয়ের। এই দীর্ঘদিনে একবারও সে বলেনি- নীলু, এই নাও আমার জন্যে একটা শাড়ি কিনলাম।

এই যে সংসারে নতুন একটি বাবু এসেছে। সবার মধ্যে কত আনন্দ কত উত্তেজনা খবর গাফিক নির্বিচার। রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে ঘন্টা খানিক বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকবে। তারপর অত্যন্ত সহজভাবে ঘুমুতে যাবে। নীলু মাঝে মাঝে কথাবার্তা লাগাবার চেষ্টা করে।

বাবুর জন্যে কোনো নামটাম ভেবেছ?

তোমরাই ঠিক করো একটা।

বাবা টুনী রাখতে চান। টুনী কেমন লাগে তোমার?

ভালোই তো। টুনীই রাখো।

মায়ের টুনী নাম একেবারেই পছন্দ না। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর লেগে যাচ্ছে।

সফিক হাই তুলে বলে- সামান্য একটা নাম নিয়ে এত ঝামেলা কেন?

নামটাকে এত সামান্য ভাবছ কেন? সারাজীবন এটা থাকবে। এক জীবনে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে এই নামে ডাকবে। নামটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ঠিক না? হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। তুমি মাঝে মাঝে খুব গুছিয়ে কথা বলো।

নীলুর আরো কত কথা বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সফিকের নিশ্বাস অল্প সময়ের মধ্যেই ভরি হয়ে ওঠে।

সে ইদানীং খুব পরিশ্রম করছে। জয়দেবপুরে তাদের নাকি কি কনট্রাকশন হচ্ছে। রোজ তিনটার সময় মতিঝিল থেকে চলে যেতে হয় জয়দেবপুরে। বাসায় ফিরতে গিবেতে রাত নটা-দশটা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিছানায় শুতে না যেতেই ঘুম।

নীলুর ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকে। ঘরে একটা জিরো পাওয়ারের বাস জ্বলে সারারাত। নামেই জিরো পাওয়ার আসলে বেশ আলো। শট সবকিছু দেখা যায়। সে প্রায়ই চুপচাপ বসে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত

ভালো লাগে তাকিয়ে থাকতে। লাল কবনের ফাঁকে টুকটুকে ফর্সা একটা মুখ, ভাগ্যিস মেয়েটি তার মতো কালো হয়নি। গর চাচার রং পেয়েছে। নীলুর মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে সারারাত বাবুকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে। সে তার মেয়ের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথাবার্তাও বলে— কি হয়েছে সোনামণি। ওমা ওমা ঠোঁট বাঁকা করছে কেন আবার, স্বপ্ন দেবছ মা? ভয়ের স্বপ্ন? দূর বোকা মেয়ে এইত আমি পাশে। এইতো তোমার হাত ধরে বসে আছি।

উষ্ণ একটি শয্যা। একপাশে মা অন্য পাশে বাবা তবুও ছোট বাবু মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বা অন্য কোনো কারণে চোঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। সে কান্না সহজে থামে না।

মনোয়ারা উঠে দরজায় থাকা দেন— কি হয়েছে এই বৌমা?

কিছু না মা, এম্মি কাঁদছে।

আহ্ দরজাটা খোলো না। দেখি কি ব্যাপার।

সফিক ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে দেয়। মনোয়ারা বিরক্ত স্বরে বলেন, নিশ্চয়ই পিঁপড়া কামড়েছে। কতবার বলি শোবার সময় বিছানার চাদর ভালো করে ঝাড়বে। কোনো একটা কাজও ঠিকমতো করতে পারো না কেন?

পিঁপড়া ঝুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু দু'টি মশা পাওয়া যায়। রক্ত খেয়ে লাল হয়ে আছে।

বৌমা, শোবার আগে মশারিটাও দেখে নিতে পারো না?

বাবা কাঁদতেই থাকে। হোসেন সাহেব টর্চ হাতে উপস্থিত হন। গম্ভীর গলায় বলেন— পেট ব্যথা। পেট ব্যথার কান্না এ রকম খেমে খেমে হয়। এক ডোজ আর্নিকা টু হানড্রেড খেলে আরাম হবে।

মনোয়ারা চোখ লাল করে তাকাতেই তিনি চুপ করে যান। চটি ফট ফট করতে করতে রফিক এসে উপস্থিত হয়।

বড্ড বেশি ক্রাইং হচ্ছে। হোয়াট হেপেন্ড? দেখি আমার কোলে দাও তো ভাবী। এক মিনিটের মধ্যে কুল ডাউন করে দিচ্ছি।

মনোয়ারা ধমকে ওঠেন। ড্যাডার ড্যাডার করিস না। যা এখন থেকে।

আমি অসুবিধা কি করলাম? এরকম শকুন চক্ষুতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

কান্না যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করে থেমে যায়। বাবু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুতে শুরু করে। কে বলবে এই কয়েক মিনিট আগেই সে রীতিমত একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিল।

রফিক হাই তুলে বলে— কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে এখন ঘুমোনো কঠোর হবে। এক কাপ চা খেলে মন্দ হতো না। কি বলো ভাবী?

নীলু জবাব দেয় না। হোসেন সাহেব ক্ষীণ স্বরে রফিককে নির্দেশ করেন।

দুধ-চিনি ছাড়া হালকা লিকারের এক কাপ চা ঝাওয়া চায়। আইডিয়ারটা খারাপ না।

মনোয়ারা রাগী গলায় বলেন— ঘুমুতে আসো। রাত দুটোর সময় চা বানাতে হবে? মাথাটা খারাপ হয়েছে নাকি?

হোসেন সাহেব ঘুমুতে যান। নীলু সত্যি সত্যি রাত দুটোর সময় চা বানাতে যায়। চারদিকে সুনশান নীরবতা। গ্যাসের চুলার নীল আগুন জ্বলছে। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে

কেন জানি অন্য রকম একটা ভাব আসে নীলুর মনে। অন্য এক ধরনের আনন্দ। পৃথিবীটাকে বড় সুন্দর মনে হয়। ছোট ছোট দুঃখ তো থাকবেই তবু সব কিছু জটিল। আমাদের চারিদিকে গভীর একটা আনন্দ আছে। এটা যে আছে তা সব সময় ধরা পড়ে না। কিছু রহস্যময় মুহূর্তেই শুধু ধরা পড়ে।

গাঢ় আনন্দে নীলুর চোখ ভিজে ওঠে। সে গায়ের চাদর দিয়ে চোখ মুছে।

এক চায়ের তাগাদা দিতে এসে দৃশ্যটি দেখে থমকে দাঁড়ায়।

কান্দছ কেন ভাবী?

কান্দিছি না।

রফিক ইতস্তত করে বলল- এ বাড়ির আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসি এই কথাটা কি তুমি জানো?

জানি।

এবপরও যদি দুপুর রাতে একা একা কান্দ তাহলে খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আর কান্দবে না।

নীলু হাসল।

তুমি যদি চাও তাহলে একটা খুব মজার গল্প বলে তোমাকে হাসাবার চেষ্টা করতে পারি।

ঠিক আছে চেষ্টা করো।

রফিক কিছুক্ষণ অনামনক থেকে মৃদু স্বরে বলল, কাল ভোরে তুমি আমাকে একশটা টাকা দিতে পারবে? ধার। আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে কেবল দেব। অনেস্ট।

এইটা তোমার মজার গল্প?

মজার গল্পটা একটু পরে বলছি। আগে সমস্যার কথাটা বলে নেই। ভাবী পারবে? একশ পারব না। পঞ্চাশ দিলে হয়?

বাকি পঞ্চাশ পাব কোথায়?

খুব যদি দরকার হয় তাহলে তোমার ভাইকে বলে দেখতে পারি। বলব?

বলো। তবে ভাবী, আমার কথা বলতে পারবে না। বলবে তোমার নিজের দরকার।

ঠিক আছে বলব। এখন শোনাও তোমার হাসির গল্প।

তারা দুজন চায়ের কাপ হাতে বসার ঘরে এসে বসল। রফিক তার নতুন গজানো দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে গল্প শুরু করল-

“এক লোক মসজিদে গেছে নামাজ পড়তে। বদনায় পানি বেশি ছিল না কাজেই একটা মাত্র পা ধোয়া গেল। নামাজ যখন শুরু হলো তখন দেখা গেল ঐ লোক বকের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে। অন্য পাটি গুটিয়ে রেখেছে। তখন ইমাম সাহেব...”

এই পর্যন্ত শুনেই নীলু মুখে শাড়ির আঁচল টুকে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। রফিক এবার স্বরে বলল, গল্প না শুনেই হাসছ যে সখী! শুনে নাও। মেয়ে-ছেলেদের সাথে হাসির গল্প বলাও একটা মুসিবত। না শুনেই হাসি। হোয়াট ইজ দিস?



পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জির মধ্যে যে এমন একটি বিশাল এবং আধুনিক ধ্বননের বাড়ি থাকতে পারে সেটা রফিকের কল্পনাতেও আসেনি। সে গেটের ভেতরে পা দেবে কি দেবে না বুঝতে পারল না। এ জাতীয় বাড়িতে কুকুর থাকবেই। এসব কুকুররা আবার কোনো একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কারণেই বোধ হয় মানুষদের মধ্যে যে শ্রেণীর একটা ব্যাপার আছে সেটা চমৎকার বুঝে ফেলে। কোনো আগভুক তাদের মনিবের শ্রেণীর চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর হলেই কামড়াবার জন্যে ছুটে আসে।

বাড়ির গেট বন্ধ। তবে গেটের ভেতরও আবার ছোট গেট আছে। মাথ নিচু করে যার ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয়। রফিক তাই করল এবং আশ্চর্য সত্যি সত্যি একটি কুকুরের ডাক শুনা গেল। ভয়াবহ কিছু নয়। মৃদু গর্জন। রফিক চট করে মাথাটা টেনে নিল।

গেটের দারোয়ান বলল- ও কিছু করবে না। আসেন। কাকে চান?

বড়লোকের বাড়িতে ঢুকার এই আরেক ফ্যাকড়া জায়গায় জায়গায় জবাবদিহি করে ঢুকতে হবে। গেটে এবার বলতে হবে। বাড়িতে বেল টিপলে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি আসবে তাকেও বলতে হবে। তারপর তাকে বসানো হবে। এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হবে। বড় লোকেরা চট করে দেখা দেন না।

কার কাছে যাবেন?

ঐ দারোয়ানটির বাড়ি বোধ হয় রাজশাহী-টাজশাহীর দিকে হবে। শুদ্ধ ভষায় কথা বলছে। চেহারাও মাই ডিয়ার টাইপের। রফিক হাসি মুখে বলল- রহমান সাহেব কি আছেন?

জি না উনি নাই। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না।

তার মেয়ে কি আছে?

জি আপামনি আছেন। যান সোজা চলে যান। দরজার বাঁ দিকে কলিং বেল আছে। কুকুর কিছু করবে না।

রফিক খুব সহজ ভঙ্গিতে হাঁটবার চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরটা আসছে সঙ্গে সঙ্গে। বিশাল পর্বতের মতো একটা জন্তু। তার চোখে গভীর সন্দেহ। বোধ হয় গেটের পেয়ে ফেলেছে এই লোক তাদের সমাজের না। এবং এই লোকের পকেটে আছে মাত্র দু'টি পাঁচ টাকার নোট। যার একটি ছেড়া বলে কেউ নিতে চায়নি। গত এক সপ্তাহে কয়েকবার ভিড়ের মধ্যে বাস কণ্ঠস্বরের হাতে গচ্ছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজ হয়নি।

রফিক বেল টিপে দাঁড়িয়ে রইল। কুকুরটা কিছু বিরক্ত করছে তাকে ঠকে ঠকে দেখছে। সে বহু কষ্টে কুকুরটার পেটে প্রচণ্ড একটা কিক দেবার ইচ্ছা দমন করল। কলিং বেল নষ্ট কিনা বুঝা যাচ্ছে না। কারোর কোনো সাড়া নেই। রফিক দ্বিতীয়বার বেল টিপল।

তোকে অবাক করে দরজা খুলল শারমিন। শারমিনকে আজ অন্য দিনের চেয়েও
 আরও বেশি সুন্দর লাগছে। নিজের বাড়িতে আছে বলেই হয়ত চেহারায় কোনো কাঠিন্য
 নেই। চুল বাঁধা নয় পিঠময় ছড়ানো। সাধারণ একটা সুতির শাড়ি এলোমেলো করে
 পরা। গ্রাফিক বলল, চিনতে পারছেন তো?

চিনতে পারব না কেন? আসুন, ভেতরে আসুন।

গ্রাফিক হড়বড় করে বলল, আগামসি লেনে এসেছিলাম একটা কাজে তারপর
 জামলাম এত কাছে যখন এসেছি তখন বরং দেখেই যাই।

ভালো করেছেন। আমি যে এখানে থাকি সেটা জানলেন কিভাবে?

গ্রাফিক জবাব দিল না। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। বসার ঘরটা
 জমকালো না। বরং বলা চলে বেশ সাধারণ। বেতের তিনটি সোফা। পাশে ছোট
 ছোট কফি টেবিল। কার্পেটটিও বিবর্ণ। বাড়ির সঙ্গে খাপ খায় না। শারমিন হাসি মুখে
 বলল- এত মন দিয়ে কি দেখছেন?

আপনাদের বসবার ঘরটা আরো জমকালো হবে ভেবেছিলাম।

এটা ড্রইং রুম না। এটা হচ্ছে এন্ট্রি রুম। বসবার ঘরে ঢুকবার আগের ঘর।

বলেন কি?

ব্রিটিশ আমলের বাড়ি। ওদের মতো করে বানানো হয়েছে। এমন কি বসবার ঘরে
 একটা ফায়ার প্রেস পর্যন্ত আছে।

মাই গড!

আসুন আপনাকে দেখাই।

বসবার ঘরে ঢুকে রফিকের মন খারাপ হয়ে গেল। কেন একজন মানুষের এত বেশি
 টাকা থাকবে এবং অন্য একজনের পকেটে থাকবে দু'টি পাঁচ টাকার নোট যার একটি
 ভেঁড়া বলে চালানো যাচ্ছে না।

শারমিন বলল- এবার পছন্দ হয়েছে বসবার ঘর?

ইঁ।

তাহলে মুখ এমন গম্মির করে আছেন কেন? ক্রাসে তো আপনার কথায় যত্নপাতে
 পশাই অস্থির।

রফিক ফ্যাকাশে ভাবে হাসল।

বসুন দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

রফিক বসল। বসতে বসতে বলল- আপনারা এতটা বড়লোক আমি বুঝতে
 পারিনি।

বুঝতে পারলে আসতেন না?

রফিক সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, আপনার একদম সিগারেট খাওয়া বাবে?

যাবে না কেন এটা তো আর মসজিদ না। বান্ধা তারপর বলুন কোনো কাজে
 এসেছেন না এমনিতেই এসেছেন।

শারমিনের মুখ হাসি হাসি। রফিক বেশ অবাক হলো। এই মেয়েটি ক্রাসে প্রায়
 কোনো কথাই বলে না। হেলেরা কেউ কাছে গেলে চোখ-মুখ কঠিন করে রাখে। অথচ

এখন কেমন সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে। আরেকটি জিনিস দেখেও রফিক অবাক হলো, শারমিনের পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। সাত-আট টাকায় যে সব পাওয়া যায় সে সব। তার ধারণা এ রকম বাড়িতে যারা থাকে তারা ঘরে সাধারণত জয়পুরী ঘাসের স্যান্ডেল পরে।

শারমিন বলল- চুপ করে আছেন কেন বলুন। কোনো কাজে এসেছেন কি?

না কোনো কাজে আসিনি।

গল্প করবার জন্যে এসেছেন?

হ্যাঁ।

বেশ গল্প করুন, এমন ঠিক হয়ে আছেন কেন? আমার মনে হয় এই ডুইং রুমটায় আপনি ঠিক ইঞ্জি ফিল করছেন না। আমার নিজের একটি বসার ঘর আছে আমি আমার নিজের মতো করে সাজিয়েছি, চলুন ওখানে বসি। এই ঘরটা আমার নিজেরো ভালো লাগে না কেমন যেন ঠাকি মনে হয়।

শারমিনের নিজের বসবার ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে টুলিতে করে একটি কাজের মেয়ে চা নিয়ে এলো। চমৎকার একটি কপোর খালায় ফুট কেক। অন্য একটি প্লেটে শিউলী ফুলের মতো ধবধবে সাদা সন্দেশ।

এই সন্দেশ ঘরে তৈরি। আমাদের রমিজ ডাইয়ের করা, একবার খেলে সারা জীবন মনে থাকবে। এর একটি নাম আছে। নামটি আমার দেয়া- গোলাপ বাহার, সন্দেশে গোলাপের গন্ধ আছে।

খাবার জিনিসে ফুলের গন্ধ আমার ভালো লাগে না। ফুলের গন্ধ থাকবে ফুলে। সন্দেশে থাকবে সন্দেশের গন্ধ।

শারমিন খিলখিল করে হেসে উঠল। এত সুন্দর হয় মানুষের হাসি? রফিক তাকিয়ে রইল মুগ্ধ চোখে।

আপনি খুব ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মদিন। এই কেক অবশ্য জন্মদিনের কেক না। জন্মদিনের কেক বাবা সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসবেন। আপনি নিশ্চয়ই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন?

না আমি এখন উঠব।

রফিক উঠে দাঁড়াল।

এখনই উঠবেন কি? চা তো শেষ করেননি।

অনেক দূর যেতে হবে।

কত দূর।

আমরা থাকি কল্যাণপুর। শহরের বাইরে।

শারমিন মুখ টিপে বলল, ফার ফ্রম দি মেডিং ক্রাইড?

না সে রকম কিছু না। ঐদিকে বাড়ি ভাড়া কম। আসা যাই তাহলে?

এক মিনিট দাঁড়ান। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি আপনাকে পৌছে দেবে।

পৌছে দিতে হবে না।

দাঁড়ান তো। এ রকম করছেন কেন?

রাফিক শৌছে দেবার জন্যে চমৎকার লাল রঙের একটা গাড়ি বের হলো। রফিক দ্রুত গাশ করতে লাগল।

শারমিন হাসি মুখে বলল, আবার যদি কখনো আপনার বন্ধুর বাড়িতে আসেন তাহলে এদিকে আসতে পারেন। আমি বুশিই হব। কেউ কখনো আসে না।

আসে না কেন?

শুধু যাদের টাকা-পয়সা আছে তাদের কেউ পছন্দ করে না। আমার বন্ধু বাস্তবরা একথা এসে দ্বিতীয়বার আসতে চায় না। আজ আমার জন্মদিন অথচ কাউকে আমি খালাস দিলাম। আপনি হঠাৎ করে এলেন।

রাফিক ইতস্তত করে বলল, আপনার জন্যে একটা বই এনেছিলাম।

শারমিন অবাক হয়ে বলল, আমার জন্যে? কেন?

রাফিক জবাব দিতে পারল না। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া বইটি এগিয়ে দিল।

একটা কবিতার বই— এই বসতে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হচ্ছে বইটিতে লেখা-শারমিনের জন্মদিনে। তার মানে জন্মদিনের কথাটা রফিক জানতো!

রাফিক বলল, যাই শারমিন।

শারমিন কিছু বলল না। সে বড়ই অবাক হয়েছে এবং তার কেমন যেন লজ্জা লজ্জাও করছে। কোথায় যেন সূক্ষ্মভাবে মন খারাপ হবার মতো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

এই ছেলটিকে সে পছন্দ করে। দারুণ হজুগে ছেলে। সারাক্ষণই একটা না একটা ঠোঁটে নিয়ে আছে। গত মাসে সে হঠাৎ ঘোষণা করল—এটা হচ্ছে সাম্যের যুগ। কবি নজরুলের ভাষায় পুরুষ-রমণীতে কোনো ভেদাভেদ নাই। কিন্তু এই আমাদের ক্লাসেই ব্যাপারটা উল্টো। এ ক্লাসের সব কয়টা মেয়ে প্রথম দিকের দু'সারি চেয়ারে এসে বসবে। এই দু'সারি ওদের জন্যে রিজার্ভ। এখন থেকে এটা বাতিল। মেয়েদের জন্যে এখন আর খালাস জায়গা থাকবে না। যে আগে আসবে সে আগে বসবে।

ক্লাসের সব ছেলেরা হৈ হৈ করে তাকে খুব সাপোর্ট দিল। কাজের সময় সবাই পিছিয়ে গেল। শুধু রফিককে দেখা গেল মেয়েদের মাঝখানে বই-খাতা নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। স্যার অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার তুমি এদের মধ্যে কেন? ক্লাসে দারুণ হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, বাও যাও নিজের জায়গায় গিয়ে বসো। সবার চোঁটা কিতাবে মেয়েদের বিরক্ত করা যায়। এটা ভালো না। মেয়েদের দিকে মন দেবার সময় অনেক পাবে এখন পড়াশোনার দিকে মন দাও। আবার হাসির ঝড় উঠল।

আবার একদিন সে ডায়াসে উঠে গম্ভীর গলায় এক বক্তৃতা দিয়ে বসল, আমরা ছেলেরা দুই দুই করে বলি অথচ মেয়েদের বলি আপনি করে। আজ এই বারই সেপ্টেম্বরের সকালবেলা আমি ঘোষণা করছি এখন থেকে আমরা মেয়েদেরও দুই করে বলব।

ক্লাসে নাসরিন হচ্ছে সবচেয়ে গম্ভীর ধরনের মেয়ে। মেয়ে না বলে বলা উচিত মহিলা। দু'টি বাচ্চা আছে তার। রফিক নাসরিনের কাছে গিয়ে বলল, নাসরিন তুমি কেমন আছিস? নাসরিন বেগেমেগে অস্থির। চোখ-মুখ লাল করে বলল, আমার সঙ্গে ফাজলামি

করবেন না। মেয়েদের তুই ডাকার ব্যাপারে এখানেই চাপা পড়ে গেল। এক ধমকেই উৎসাহ মিইয়ে গেল রফিকের। কত বিচিত্র ধরনের মানুষই না আছে।

শারমিন অলস ভঙ্গিতে বাড়ির পেছনের দিকে রওনা হলো। সেখানে তিনটা বড় বড়ই গাছ আছে। রোদের মধ্যে হাঁটতে ভালোই লাগছে। বিশাল গ্র্যান্ডশেশিয়নটি আসছে তার পেছনে পেছনে। শারমিন তার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যালো মার্টি সাহেব। কুকুরটি লেজ নাড়াল।

চমৎকার একটি সকাল কি বলো মার্টি?

মার্টি মাথা নাড়াল। যেন সে শারমিনের কথা অর্থ বুঝতে পারছে।

চমৎকার একটি সকালে সম্পূর্ণ অকারণে মাঝে মাঝে মানুষদের মন খারাপ হয়। তাদের কিছুই ভালো লাগে না। তোমাদেরও কি সে রকম হয়?

মার্টি সাহেব লেজ নাড়াল। যার কোনো অর্থ বোঝা গেল না।

কুল গাছে হেলান দিয়ে পা ছাড়িয়ে বসে থাকলে কেমন হয়?

শারমিন তাই করল। মার্টি সাহেবের বসে থাকার পরিকল্পনাটা মনে ধরল না। সে রওনা হলো গেটের দিকে।

গাছ ঝেপে কুল হয়েছে। পাকা কুলের গন্ধে ম ম করছে চারদিক। খাবার লোক নেই। প্রকাণ্ড এই বাড়িতে তারা দু'টি মাত্র মানুষ সে এবং বাবা। চার-পাঁচজন কাজের মানুষ আছে, ড্রাইভার এবং দারোয়ান আছে কিন্তু ওদের থাকার জায়গা ভিন্ন। গেটের কাছে তাদের জন্যে বড় একটা ঘর তৈরি আছে।

সব কিছুই মানুষের অভ্যাস হয়ে যায়। এই বিরাট বাড়িতে কত দীর্ঘদিন ধরেই তারা দুজন থাকছে। খুব ছোটবেলায় সে ঘুমাত বাবার সঙ্গে। কোনো কোনো রাতে ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে কাঁদত। বাবা বলতেন, এইতো আমি, তোমার হাত ধরে আছি। কোনো ভয় নেই। স্বপ্ন দেখেছ?

হঁ।

কি স্বপ্ন মা?

ভূতের স্বপ্ন।

দূর বোকা মেয়ে, ভূত আছে নাকি পৃথিবীতে? ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই।

বাতি জ্বালিয়ে রাখো বাবা।

বাবা বাতি জ্বালিয়ে দিতেন।

বাথরুম করব।

তিনি তাকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে যেতেন।

শারমিনের প্রায়ই মনে হয় পৃথিবীর কোনো বাবা বোধ হয় তার স্বামীর মতো নয়। কোনো বাবা তাঁর মেয়েকে এতটা ভালোবাসেন না। সেই কবে শারমিনের মা মারা গেলেন। বাবা তখন যুবক মানুষ, সাতাশ-আটাশ বছর বয়স। কিন্তু মেয়ের কষ্ট হবে এই ভেবে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন না।

তাঁর অর্থবিশ্বাস কোনো কিছুর অভাব ছিল না। ইচ্ছা করলেই তিনি মেয়ের দেখা শোনার জন্যে কয়েক ডজন কাজের লোক রাখতে পারতেন। তাও তিনি করেননি। মেয়ের প্রতিটি প্রয়োজন নিজে মেটাতে চেষ্টা করেছেন।

। মাঝে তাকে কুলে নিয়ে যেতেন। ক্লাস শেষ হলে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেন।
 ৩০। ক্লাস পর্যন্ত সন্ধ্যার পর পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন। মায়ের ভালোবাসার অভাব তিনি
 ৩১। খেতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু অভাব আছে যা কিছুতেই বোধ হয় মেটে
 ন। মাশ পড়ে থাকে শুধু।

মামামনি! আপনার টেলিফোন।

কে ধরেছে?

না স্যার।

শারমিন উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

কি করছিলে মামনি?

কিছু না। কুল গাছের নিচে বসে রোদ পোহাচ্ছিলাম।

এতদূর কাউকে আসতে বলেছ?

না বাবা। আমরা দুজনেই জন্মদিন করব। তুমি কখন আসবে?

পাচটার মধ্যে এসে পড়ব। খুব বেশি দেরি হলে সাড়ে সাতটা।

না এত দেরি করলে চলবে না। তোমাকে আসতে হবে হুটার মধ্যে। পজিটিভলি।

আজ রাতে কি আমরা বাইরে খাচ্ছি?

না ঘরেই খাবে। আমি রান্না করব বাবা।

চমৎকার। কি রান্না হচ্ছে?

তা বলব না। একটা সারপ্রাইজ আছে।

খাওয়া যাবে তো মা?

যাবে। যাবে না কেন?

রহমান সাহেব হাসতে লাগলেন। শারমিন বলল, তুমি কিন্তু হুটার মধ্যে আসবে।

হ্যাঁ আসব। আর শোনো মা, আমেরিকায় একটি কল বুক করে সাক্ষরের সঙ্গে কথা

বল।

শারমিন লজ্জিত হয়ে বলল, কেন?

জন্মদিন উপলক্ষে কথা বলা।

সে তো উনি আমাকে করবেন। আমি কেন করব?

তাও তো ঠিক।

তুমি আসছ তো বাবা সন্ধ্যা হুটার মধ্যে?

হ্যাঁ।

আমি কিন্তু পাঁচটার সময় আবার তোমাকে টেলিফোন করব। মনে করিয়ে দেবার

জন্যে।

ঠিক আছে মনে করিয়ে দিও।

শারমিন টেলিফোন রেখে দিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় একটা কল বুক
 করল। সেখানে এখন বাজে রাত বারোটা। সাক্ষরকে পাওয়া যাবার কথা। শারমিন
 একবার ভাবল নিজের পরিচয় না দিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললে কেমন হয়?

হ্যালো। কে?

গলা শুনে বুঝতে পারছেন না কে?

ও শারমিন, কি ব্যাপার?

কোনো ব্যাপার নেই। আপনার গলা এমন লাগছে কেন?

কেমন লাগছে?

ভাঙা ভাঙা। মনে হচ্ছে কোনো কারণে খুব কান্নাকাটি করেছেন।

কি যে পাগলের মতো কথা বলো।

শারমিন বিলবিল করে হাসল। হাসি ধামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, আপনাকে লিখেছিলাম কয়েকটা সায়েন্স ফিকশন পাঠাতে আপনি পাঠিয়েছেন ভূতের উপন্যাস।

সিঁফান কিং পাঠিয়েছি। খুব ভালো লেখা।

ভূতের গল্প পড়ে শেষে রাতে ভয়ে মরি আর কি? আপনি সায়েন্স ফিকশন পাঠাবেন। এসিমন্ডের নতুন কোনো বই।

ঠিক আছে। আর শোন তোমাকে যে একটা জিনিস পাঠাতে বলেছিলাম সেটা তো পাঠালে না।

শারমিন লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

ঐ সব পাঠানো যাবে না।

যাবে না বললে হবে না। পাঠাবে।

শারমিন কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন।

তাই নাকি? মাই গড, আমার মনেই ছিল না।

তা থাকবে কেন? আশ্চর্য রেখে দিচ্ছি।

না রাববে না। অনেক কথা আছে।

শারমিন হাসল।



শাহানার স্যার এসেছেন। শাহানা অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছে। ভাবীর এসে কাছেই কোথাও বসবার কথা। কিন্তু ভাবী আসছে না। স্যার ভারি গলায় বললেন, এত ছটফট করছ কেন কি হয়েছে?

কিছু হয় নাই স্যার।

তাহলে মন দিয়ে শোনো কি বলছি। এ কিউব প্রাস বি কিউব ...

স্যার, আমি একটু আসছি।

শাহানা উঠে রান্নাঘরে গেল। নীলু ভাত চড়িয়েছে। সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগেই ভাত হয়ে যায় আজ দেরি হচ্ছে। বাসাবো থেকে নীলুর এক খালি পাতড়ি এসেছিলেন। মাত্র কিছুক্ষণ আগে গেলেন।

ভাবী!

কি ব্যাপার।

একটু এসে বসো না ভাবী। স্যার এসেছেন।

চাও চড়িয়েছি শাহানা, বাবাকে বলো।

বাবা রশীদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন। স্যারকে বলে দেই আজ পড়ব না? ঠিক আছে। তোমার যদি পড়তে ইচ্ছা না করে বলে দাও। শাহানা দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক আর কিছু বলবে?

তুমি এসে বলে দাও না ভাবী।

আমি কেন?

শাহানা ইতস্তত করে বলল, বলে দাও আমি আর তাঁর কাছে পড়ব না। আজও সে একম হয়েছিল ভাবী।

ভুলে হয়। সামান্য জিনিসটাকে এত বড় করে দেখছ কেন? শাহানা অন্য দিকে মুখ ফিরায়ে বলল, ভুলে না ভাবী।

ঠিক আছে। চলো বলব উনাকে।

আমি যাব না। তুমি একা গিয়ে বলবে।

‘আর পড়াতে হবে না’ শুনে মাষ্টার সাহেব কিছু বললেন না। নীলুর ধারণা ছিল জিজ্ঞেস করবেন— কেন? কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

আপনার পাওনা টাকাটা আপনি সামনের মাসের তিন তারিখে এসে নিয়ে যাবেন।

মাষ্টার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

বসুন চা খেয়ে যান।

মাষ্টার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বসলেন। শাহানা নিজেই চা এনে দিল। চায়ের সঙ্গে দেবার মতো কিছু ছিল না। শুধু চা দিতে শাহানার লজ্জা লাগছিল। মাষ্টার সাহেব খুব আগ্রহ করে চা খেলেন। মৃদু স্বরে বললেন, যাই শাহানা মন দিয়ে পড়বে।

শাহানার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন একজন ভালো টিচার কিন্তু কি বাজে একটা ভাব। নিশ্চয়ই আরো অনেক জায়গা থেকে তাঁকে এভাবে বিদায় নিতে হয়েছে।

শাহানার আজ আর বই নিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে ভাবীর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু এখন সেখানে মা আছেন।

রান্নাঘরে গেলেই মাষ্টার চলে গেল কেন সেই প্রশ্ন উঠবে। শাহানার ঠিক এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা করছে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনল মা চড়া গলায় চেঁচাচ্ছেন—

মনটা কত ছোট দেখো বৌমা। বাবুর মুখ দেখে দশটা টাকা দিয়ে গেল। তাও ময়লা একটা নোট। হাতে নিলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়।

বাদ দেন মা।

কেন বাদ দিব কেন? তার নাতনির মুখ দেখে দেড়শ টাকা খরচ করে আংটি দিয়েছি। তার ছোট মেয়ের বিয়ের সময় তিনশ টাকা খরচ করে জামদানি দিয়েছি। আমার টাকা কি গাছে ফলে? বল বৌমা গাছে ফলে?

সবাই টাকা খরচ করতে পারে না মা।

বাজে কথা বলবে না। খরচ ঠিকই করতে পারবে নিজের বেলায় পারে। পঁচিশ বছর ধরে দেখছি তো। নাড়ি-নক্ষত্র জানি। যাও বৌমা এ দশ টাকাটা তুমি রাত্তায় ফেলে দিয়ে আসো, আমার আলমারির উপর আছে।

বাদ দেন মা।

তোমাকে ফেলতে বলেছি ফেলে দিয়ে আসো। ঐ দশ টাকা নিয়ে আমি স্বর্গে যাব না।

নীলু বেরিয়ে আসতেই শাহানা ফিসফিস করে বলল, আমাকে দিয়ে দিও ভাবী।

এসো নিয়ে যাও। আর একটু বাবুর কাছে গিয়ে বসো, একুণি দুধ খাবার জন্যে কান্দবে।

বাবুর পাশে সফিক বসে ছিল। গভীর মনোযোগে সে ফাইল দেখছে। আজ সারাটা দিন তার নষ্ট হয়েছে। হিসাবে কোথাও জট পাকিয়ে গেছে। হিসাবশত্রু দেখার দায়িত্ব মনিন্দ্রনাথের। সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

ভাইয়া আসব ভেতরে?

আয়।

কী করছ?

একটা ফাইল দেখছি।

বসি একটু?

সফিক অবাক হয়ে বলল-বোস। জিজ্ঞেস করছিস কেন?

তোমাকে কেমন জানি ভয় ভয় লাগে ভাইয়া। সারাক্ষণ এমন গভীর হয়ে থাকো।

সফিক হাসল।

অফিসে সবাই নিশ্চয়ই তোমাকে ভয় পায়। পায় না?

পায় বোধ হয়। জানি না।

তুমি মাষ্টার হলে ছাত্রদের অবস্থা কাহিল হয়ে যেত ভাইয়া।

সফিক ফাইলে মন দিল। হিসাবের জটটা না খুললে কিছুতেই আর মন বসবে না। মনিন্দ্র মহা ঝামেলা লাগিয়ে রেখে গেছে।

ভাইয়া একটা কথা শোনো।

পরে শুনব। কাজটা শেষ করে নেই।

কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকা মুশকিল। শাহানা উসখুস করতে লাগল।

কাজ শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে ভাইয়া?

সফিক জবাব দিল না। শাহানা ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

রান্না শেষ হতে রাত নটা বাজল। নীলু এসে বলল, শাহানা চট করে যাও তো আনিসকে বলে আসো খাবার দেয়া হয়েছে।

শাহানা অবাক হয়ে তাকাল।

আমি আজ রাতে গুকে খেতে বলেছি।

কেন ভাবী?

এমনি বলেছি। খেতে বলার জন্যে আবার বিরাট কোনো কারণ লাগবে না কি? যাও বলে আসো।

সিঁড়ি দিয়ে একা একা উঠতে ভয় লাগবে ভাবী। তুমি দরজা খুলে একটু দাঁড়িয়ে থাকো।

আনিস চিলেকোঠার ঘরে থাকে। খাওয়া-দাওয়া করে বাড়িওয়ালা রশিদ সাহেবের কাছে। রশিদ সাহেবের সঙ্গে তার স্বীর্ণ একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক টেঙা জোরালো নয়। এক সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন। চেষ্টা-চরিত্র করে সিটি কলেজে পড়াশোনা করিয়েছেন। গত বৎসর আই, এ ফেল করেছে এবং পড়াশোনা করবে না বলে জানিয়েছে। এ রকম একজনকে ঘরে রেখে পোষার কোনো মানে হয় না। রশিদ সাহেব বেশ প্রাণপণ চেষ্টা করছেন আনিসকে খেড়ে ফেলতে। পারছেন না। আনিসের এ প্রচেষ্টা ছেড়ে নতুন কোথাও যাবার জায়গা নেই। জোর করে তাকে বের করে দেবার চেষ্টা নিষ্ঠুরতা তিনি দেখাতে পারছেন না।

ওছাড়া ছেলে হিসেবে আনিসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তাঁর নেই। অত্যন্ত ভদ্র ছেলে। চেহারা ভালো। আচার-ব্যবহার ভালো। চায়ের দোকানে বসে বিড়ি ফুঁকে না। মেয়েদের দেখে শিস দেয় না। রশিদ সাহেবের মনে একটা গোপন পরিকল্পনা ছিল আনিসকে পড়াশোনা করিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিবেন। বীণার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। মেয়ে জামাই তার কাছেই থাকবে।

রশিদ সাহেবের স্বীর্ণ সেই পরিকল্পনা একেবারেই পছন্দ করেননি। স্বামী নির্বুদ্ধিতায় দেশে অস্থির হয়েছেন। তার মেয়ে কালো নয়, কানা খোঁড়া নয় তাকে হাতাতে ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে? দশটা-পাঁচটা মেয়েও তার না। একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে হবে চাকর শ্রেণীর একটি ছেলের সাথে? দেশে কি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের অভাব রয়েছে? না তাদের সহায়-সম্পদ নেই? ঢাকা শহরে তিনটি বাড়ি, গ্রামের সম্পত্তি সবই তার মেয়েই পাবে।

আনিসের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুরু থেকেই খারাপ ছিল। ইদানীং তিনি তাকে সহ্য করতে পারছেন না। কারণটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি লক্ষ্য করেছেন আনিস খেতে বসলে বীণা এটা সেটা তার পাত্তে তুলে দিতে চেষ্টা করে।

তিনি একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ওর খাওয়ার সময় তোর থাকার দরকার কি? কেন খালাসটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করিস।

বীণা অবাক হয়ে বলেছে, একটা লোক একা একা বসে খাবে?

একা একা কোথায়? আকবরের মা আছে। রহিম আছে। তোর যাবার দরকারটা কি?

অসুবিধা কি?

অসুবিধা আছে। এতে লাই দেয়া হয়। লাই দিলেই এরা মাথায় উঠবে। শব্দবদার খুঁজি যাবি না।

বীণা এর পরেও গিয়েছে। তিনি মনের মধ্যে একটা ভয় অনুভব করেছেন। সময়েসি দুটি ছেলেমেয়ের ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া শুরু। বয়স খুব খারাপ আনিস। একটা বয়সে সবাইকে ভালো লাগে।

আনিস ঘর অঙ্ককার করে বসে ছিল। শাহানা বাইরে থেকে ভয় পাওয়া গলায় গলায়, আনিস ভাই।

এসো শাহানা।

ঘর অন্ধকার কেন?

বালু ফিউজ হয়ে গেছে।

আপনি আসুন ভাত দেয়া হয়েছে।

ভেতরে এসে শাহানা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

না আমি ভেতরে আসব না।

কেন?

শাহানা জবাব দিল না। আনিস বের হতেই শাহানা বলল, দরজা লাগাবেন না?

অন্ধকারে তলা-চাবি খুঁজে পাব না। চোর আমার ঘরে আসবে না। নেবার মতো

কিছু নেই।

সিঁড়ি অন্ধকার। এরমধ্যে কে আবার পানি ফেলে রেখেছে। শাহানা খুব সাবধানে পা ফেলছে। একবার পিছলে পড়ার মতো হলো। আনিস বলল, আমার হাত ধরো শাহানা। পিছলে পড়ে হাত ভাঙবে। শাহানা কঠিন স্বরে বলল, হাত ধরতে হবে না। আমি ভালোই দ্বেতে পাচ্ছি। আনিস হাসল। অন্ধকারে তার হাসি দেখা গেল না।

আনিসকে খেতে বলা হয়েছে শুনে মনোয়ারা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। হুট করে কাউকে খেতে বসার অর্থটা কি? কোনো উপলক্ষ-টুপলক্ষ থাকলেও একটা কথা। হঠাৎ তার মজি হলো ওম্মি খেতে বলা হলো। দুপুর রাতে শাহানাকে পাঠানো হলো ডেকে আনতে।

নীলুর এটা আজ নতুন না। আগেও বেশ কয়েকবার আনিসকে খেতে বলেছে। প্রথমবার তিনি নীলুকে তেমন কিছু বলেননি। শুধু শুকনো গলায় বলেছেন, কাউকে দাওয়াত-টাওয়াত করতে হলে আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। বুঝলে বৌমা?

নীলু বলেছে, দাওয়াত না তো। ঘরে যা রান্না হয়েছে তাই খাবে।

সেটাও আমাকে জানিও।

নীলু কোনে উত্তর দেয়নি কিন্তু আবার খেতে বলেছে এবং তাকে কিছুই বলেনি। শাতড়ির কথার অবাধ্য হবার ঐয়ে নীলু না কিন্তু এই একটি ব্যাপারে সে মনে হয় ইচ্ছা করেই অবাধ্য হচ্ছে। মনোয়ারার মনে হলো এটা নীলুর একটা ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা। জানিয়ে দেয়া যে, সেও এই সংসারের কষ্টী তারও অধিকার আছে।

মনোয়ারা গম্বীর মুখে সফিকের ঘরে ঢুকলেন। সফিক চোখ তুলে তাকাল কিছু বলল না।

কি করছি?

কিছু করছি না।

ভাত খেতে দেয়া হয়েছে। খেতে যা।

সফিক উঠ দাঁড়াল। মনোয়ারা শীতল গলায় বললেন, বৌমা দেখলাম আনিস ছোড়াটাকে খেতে বলেছে। তুই বৌমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতো কেন বলেছে?

এম্মি বলেছে। জিজ্ঞেস করবার দরকার কি?

মনোয়ারা আরো গম্বীর হয়ে গেলেন। সফিক বলল ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার কিছু না।

কি? না তো তুমি এমন গভীর হয়ে আছ কেন?

মনোয়ারা তার জবাব দিলেন না। চলে গেলেন রান্নাঘরে। নীলু ব্যস্ত হয়ে বাটিতে তরকারি ঢালছে। আয়োজন খুবই সামান্য। ছোট মাছের তরকারি, একটা সজি ও ডাল। তরকারি মনে হয় কম পড়ে যাবে। হোসেন সাহেব দরজা গলায় বললেন, ছোট মাছের তরকারিটা বড় ভালো হয়েছে। আরো নিয়ে আসো। নতুন টমেটো দিয়ে রাখলে যে শোনো জিনিস ভালো হয়। নীলু পড়েছে মুশকিলে। তরকারি কিছুই নেই। মনোয়ারাকে তাকিয়ে দেখে বলল, আপনি ওদের সঙ্গে বসে পড়ুন না মা।

না আমি আজ আর খাব না।

কেন?

পরীর ভালো লাগছে না। এই জন্যে খাব না। তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে না কি?

নীলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কোনো কারণে তার শাতড়ি রেগে আছেন। সে কারণটা খুঁজে পাবে না।

তরকারিভো সবটাই ঢেলে ফেললে। রফিক বাবে কি?

ওকে একটা ডিম ভেজে দেব মা। ছোটমাছ সে এম্মিতেই পছন্দ করে না।

করুক আর না করুক একটা জিনিস রান্না হয়েছে সেটা তাকে দিবে না? সে তো আর কাজের লোক না। এই বাড়িরই ছেলে। না তুমি সেটা মনে করো না?

নীলু বড় লজ্জায় পড়ে গেল। মার গলা যে ভাবে উঁচুতে উঠছে তাতে মনে হয় বাবার ঘর থেকে সবই শোনা যাচ্ছে।

হাগারের পাগারের লোকজন ধরে ধরে আনলে খাবার তো কম পড়বেই। এটা তো আর হোটেল না।

নীলু কি বলবে ভেবে শেল না। এখন কিছু বলা মানেই তাঁকে আরো রাগিয়ে দেয়া।

শোনো বৌমা, তোমাকে আরেকটা কথা বলি, শাহানা এখন বড় হয়েছে। কাউকে তাকে আনার জন্যে রাত দুপুরে তাকে ছাদে পাঠানো যায় না। বুঝতে পারছ?

পারছি।

নীলুর চোখে পানি এসে গেল। মনোয়ারা তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখের পানি তাঁকে বিস্ময়াবৃত্ত নরম করতে পারল না। হোসেন সাহেব দরজায় এসে উঁকি দিলেন।

কই বৌমা, তরকারির কথা বলছিলাম।

আনছি বাবা।

মনোয়ারা না খেয়েই ঘুমুতে গেলেন। খাওয়া নিয়ে তাকে পীড়াপীড়ির সাইন নীলুর হলো না। সে নিজেও না খেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত জেপে বসে রইল রফিকের জন্যে। টানানীং রফিক ফিরতে রোজ এগারোটা বারটা বাজাচ্ছে। নীলুকে বলা আছে খাবার ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু তাতে লাভ নেই— উঠে এসে দরজা তো খুলতেই হবে।

এখন সাড়ে বারোটা বাজে। আজ বোধ হয় আর আসবে না। নীলু ঘুমুতে গেল। বাবু কেমন দু'হাত উপরে তুলে ঘুমাচ্ছে। কফল সঙ্গে গেছে গা থেকে। টুকটুকে কর্সা পা ধর হয়ে আছে। ফানেলের পাজামা বানাতে হবে। যাতে কফল সরে গেলেও ঠান্ডা না লাগে।

নীলু, তোমার একটা চিঠি আছে। দিতে মনে ছিল না। দেখো টেবিলের উপর।
নীলু অবাক হয়ে বলল, তুমি ভেগে ছিলে নাকি?
হঁ।

বাবুর গা থেকে কখন সবে গেছে তুলে দাওনি কেন?

সফিক কিছু বলল না। নীলু চিঠি নিয়ে আবার বসার ঘরে চলে এলো। চিঠি মা'র কাছ থেকে এসেছে। কাজেই এই চিঠি পড়তে পড়তে অনেক বার চোখ ভিজে উঠবে। আড়ালে পড়াই ভালো। মা, তার সব চিঠিই সফিকের ঠিকানায় পাঠান। হয়তো ভাবেন এ ভাবে পাঠালে অন্য কেউ পড়বে না।

আমার মামনি,

মাগো, তোমার সোনারমণিকে এখনও দেখিতে আসিতে পারিলাম না। যতবার মন হয় ততবার কষ্ট পাই। কি করিব মা হাত-পা বাঁধা। বজলুর হাতে টাকা নাই। আসা যাওয়ার খরচ আছে। এই দিকে বৌমাও অসুস্থ। ঘরে কাজের লোক নাই। সব কিছু আমাকেই দেখাশোনা করিতে হয়।

লক্ষী মা আমার, রাগ করিও না ফেব্রুয়ারি মাসে যে ভাবেই হউক আসিব। আর মা শোন তোমার স্বতর-শাতড়ি যে নাম রাখিতে বলেন সেই নামই রাখিও। তাঁদের অশুশি করিয়া কোনো কাজ করিও না।

এই দিককার খবর ভালোই। বিলু বেড়াইতে আসিয়াছিল। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া বৌমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হইয়াছে। দোষ বৌমার। মেয়েটা কয়েকদিন ভাইয়ের বাসায় থাকতে চেয়েছিল রাগারাগির জন্যে পারে নাই। তুমি তাকে চিঠিপত্র দাও না কেন মা? মেয়েটা বড় দুঃখী। তাকে নিয়মিত চিঠি দিও।

বড় জামাইয়ের স্বভাব চরিত্র আগের মতোই আছে। বিলুর সঙ্গে তার সশর্ক নাই বললেই চলে। বুঝতে পারি না আত্মাহুপাক কেন আমার জন্যেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট জমা করিয়া রাখিয়াছেন।

যাই হোক মা তুমি এইসব নিয়া চিন্তা করিও না। জামাইয়ের যত্ন নিও। তোমার সোনার সংসারের কথা যখন ভাবি তখন মনে বড় শান্তি পাই। তুমি বড় ভাগ্যবান মা। আত্মাহুপাকের কাছে সবুর স্বীকার করিও। না হইলে আত্মাহুপাক নারাজ হইবেন।

সুদীর্ঘ চিঠি। নীলু চিঠি শেষ করে দীর্ঘ সময় একা একা বসে রইল। মাকে কিছু টাকা পাঠাতে পারলে হতো। এই মাসে সম্ভব হবে না। সফিকের হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই।

সংসারের খরচ বেড়েছে। আয় বাড়েনি। ক্রমে ক্রমেই সফিকের উপর চাপ বাড়ছে। এই চাপ আরো বাড়বে। সামনের দিনগুলি কেমন হবে কে জানে। গত মাসে সে নীলুকে হাত খরচের টাকা দেয়নি। লজ্জিত মুখে বলেছে, এই মাসে দিতে পারলাম না নীলু। এদিকে রফিক বলে রেখেছে— যেভাবেই হোক দু'শ টাকা দিতে হবে ভাবী। নয়তো একেবারে বেইজ্ঞ হব।

প্রতি বৎসর শীতের সময় দেশের বাড়ি থেকে কিছু চাল আসে এবার তাও আসেনি। কেন আসেনি কে জানে।

হাথ উঠে পড়েছে। প্রচণ্ড জোর তার গলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সবাইকে ফিরাতে থাকবে। নীলু নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল। মনোয়ারার ঘুম ভেঙে গেছে, তিনি কান পেঁচাচ্ছেন, কি হয়েছে? ও বৌমা কি হয়েছে?



রফিকের মনে ক্ষীণ আশা ছিল শারমিনের আচার-আচরণে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করবে। পড় ধরনের কিছু না হলেও চোখে পড়বার মতো। পরিচিত ভঙ্গিতে একটু হাসবে কিংবা কার্গডোরে দেখা হয়ে গেলে বলবে- কী কেমন আছেন?

অপচ শারমিন আগে যেমন ছিল এখনো তেমন। গঞ্জির হয়ে ক্লাসে আসে। লেকচার শেষ হওয়া মাত্রই বিদায়। রফিকের আশা ছিল ডিপার্টমেন্টাল পিকনিকে সে যাবে তখন রফিককে কিছু কথাবার্তা বলা যাবে। কি ধরনের কথাবার্তা বলবে তাও সে ভেবে নিশ্চয়। যেমন,

জন্মদিন কেমন হলো?

ভালোই। কবিতার বইটির জন্যে ধন্যবাদ। আমি ভাবতেই পারিনি আপনি আমার জন্মদিন কবে সেটা জানেন।

অনেক ঝামেলা করে বের করেছি। গরজটা যখন আমার।

আপনার গরজ তার মানে?

মানে কিছু নেই।

ডেবে রাখা কথা কিছুই বলা হয়নি। শারমিন যায়নি পিকনিকে অথচ একশ টাকা টীকা দিয়েছে। চাঁদা দিয়ে না যাওয়া হচ্ছে একটা বড়লোকী দেখানো। রাগে গা জ্বলে গেছে রফিকের। পিকনিকের সমস্ত আয়োজনটা তার করা। টাকাটা ফেরত দিয়ে অপমান করে দু'একটা কড়া কড়া কথা বলা যায়। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলা যেতে পারে, "আপনার টাকা আছে জানি। কিন্তু টাকার খেলাটা এভাবে না দেখালেও পারতেন। টাকার খেলা আর যাকে দেখান দেখান। আমাদেরকে দেখাবেন না।"

রফিক ভেবে পেল না কথাটা ইউনিভার্সিটিতে বললে ভালো হবে না বাড়িতে গিয়ে বলবে। অনেক ভেবেচিন্তে সে বাড়িতে যাওয়াই ঠিক করল। অকারণে হতাশা হচ্ছে না। একটা কাজে যাচ্ছে। ইতস্তত বোধ করার কিছুই নেই।

কিন্তু রফিক ইতস্তত করতে লাগল। গেটের কাছে এসেও ঘাসে হলো কাজটা ঠিক হচ্ছে না। ফিরে যাওয়াই ভালো। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। এতদূর এসে ফিরে যাবার মানে হয় না।

রহমান সাহেবের মেয়ে বাসার আছে?

জি আছে। যান কুকুর কিছু করবে না, আপনি সোজা চলে যান, কলিং বেল টিপ দেন।

দারোয়ান তাকে চিনতে পারছে না। তার চেহারা কি এতই সাধারণ যে মাত্র দু'সপ্তাহ আগে দেখাও ওবলেট করে ফেলেছে। দারোয়ান একা নয় কুকুরটা পর্যন্ত তাকে চিনতে পারছে না অথচ নিম্ন শ্রেণীর পণ্যদের নাকি শ্রুতিশক্তি খুব ভালো। একবার কোনো একটি জিনিসের দ্রাণ নিলে একটা কুকুর নাকি সারাজীবন সেটা মনে রাখে। এই কুকুরটার সেদিন সর্দি ছিল বোধ হয়। সেদিন যেমন ঠংকতে ঠংকতে আসছিল। আজও তাই আসছে।

গতবার বেল টিপতেই দরজা খুলে দিয়েছিল শারমিন। আজও তাই হবে নাকি?

না সে রকম হলো না। বয়স্কা একজন মহিলা দরজা খুলল। কাজের মেয়ে না আত্মীয় স্বজনদের কেউ? আত্মীয় স্বজনদের কেউ হলে সালাম দেয়া দরকার। রফিক নরম স্বরে বলল, শারমিন আছে।

জি আছে।

একটু বলেন রফিক এসেছে।

বসেন। স্বর দেই।

রফিক এম্বিক্রমে বসে রইল। তার মনে হতে লাগল— যেসব কড়া কড়া কথা সে ভেবে রেখেছে সে সব বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কারো বাড়িতে এসে অভদ্র হওয়া যায় না। তাছাড়া পিকনিকে না যাবার তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। অসুখ-বিসুখ হতে পারে। জরুরি কাজকর্ম থাকতে পারে, না জেনে হাউ হাউ করা ঠিক না। রফিক বেশ অনেকক্ষণ বসে রইল।

যে মহিলাটি বসতে বলেছে সে এলো না, অল্প বয়সী একটি মেয়ে এসে বলল আপামণি বাসায় নাই।

তার মানে?

রফিকের বিশ্বয়ের সীমা রইল না। সে কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। মেয়েটি দ্বিতীয়বার বলল, আপামণি বাসায় নাই। রফিক উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা বলা উচিত কিন্তু কিছুই মনে আসছে না।

তোমার আপাকে বলবে মিথ্যা কথা বলবার কোনো দরকার ছিল না। দেখা করবে না বললেই চলে যেতাম।

রফিকের ইচ্ছা করছে ছুটে পালিয়ে যেতে কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাকে হেঁটে হেঁটে গেট পর্যন্ত যেতে হবে। এই বিশাল বাড়ির কম্পাউন্ড থেকে বেরুতেও সময় লাগবে।

রফিক তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

না।

সারাদিন শুয়ে আছ। ব্যাপার কি?

ব্যাপার কিছু না।

আমার তো মনে হয় তোমার জ্বর-টর কিছু হয়েছে। চোখ লাল।

তোমার মনে হলোই তো হবে না ভাবী। আমার মনে হতে হবে। আমার মনে হচ্ছে শরীর ঠিকই আছে।

তুমি উঠে আসো তোমাকে ডাকছেন।

কি ডাকছেন?

কবির মামা। ঘণ্টা খানিক আগে এসেছেন। কি আসবে না?

কবির মামা তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না। আসছেন যখন ইনশাআল্লাহ মাস খানিক
= কবির মামা : দীরেসুস্থে আসছি।

কবির মামা তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

কবির মামার বয়স প্রায় ষাট। ছোটখাটো মানুষ। পুতনিতে অল্প কিছু দাড়ি আছে।
= কবির মামা : তুল দাড়ি সমস্তটাই ধবধবে সাদা। স্বাস্থ্য বয়সের তুলনায় অনেক ভালো। এবং
= কবির মামা : ভালো তিনি নিজে মনে করেন তার চেয়েও ভালো, যার জন্যে মাঝে মাঝে
কবির মামা : গামেলার সৃষ্টি হয়।

কবির মামা এ রকম একটা কামেলা বাধিয়েছেন। ছুটি বুনা নারিকেল নিয়ে কমলাপুর
= কবির মামা : শৈশব থেকে কমলাপুর পায় হেঁটে চলে এসেছেন। এরকম একটা কাণ্ড করার
= কবির মামা : একমাত্র যুক্তি হচ্ছে কোনো বাস কভারিং নারিকেল হাতে বাসে উঠতে দিতে রাজি
= কবির মামা : একজন রাজি হয়ে ছিল কিন্তু সে নারিকেলের জন্যে আলাদা ভাড়া দাবি করার
কবির মামা : রেগে আগুন হয়ে যান এবং হাঁটতে শুরু করেন। কমলাপুর এসে পৌছতে
কবির মামা : পৌনে চার ঘণ্টা সময় লাগে।

কবির মামা দুকেই তিনি সোফায় লম্বা হয়ে পড়েছেন। উঠে দাঁড়াতে পারছেন না।
কবির মামা : একটা পুরনো ব্যথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

মনোয়ারা বললেন, পিঠে তেল মালিশ করে দিবে?

দিক। বৌমাকে বল তেল গরম করতে। হোসেন কোথায়?

পেনশনের টাকা তুলতে গেছে। এসে পড়বে।

আসুক তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

চা করে দিক?

চা না। লেবু দিয়ে এক গ্রাস সরবত করে আনতে বলো।

নীলু পিঠে তেল মালিশ করতে বসল। কবির মামা কীণ হয়ে বললেন, মানুষের
সেবা আমি নেই না লজ্জা লাগে। কিন্তু মা তোমার সেবা নিতে লজ্জা লাগে না। মনে হয়
এই সেবাটাতে আমার অধিকার আছে।

অধিকার তো আছেই।

নাগো মা অধিকার নাই। দুই মাস আগে তোমার একটা মেয়ে হলো। আমাকে কেউ
একটা খবর দেয় নাই। এখানে এসে জানলাম মেয়ে হবার খবর। নীলু খুব খুশি।
মনোয়ারা সরে গেলেন। কবির মামা গঞ্জির গলায় বললেন, বুঝলে কবির মামা, সত্যিকার
আত্মীয়তা সম্পর্ক নাই তো সে জনোই এই অবস্থা। যখন উপস্থিত হই তখন আমার কথা
মনে হয়। সন্ধ্যার বিয়ের কার্ড পাই বিয়ের এক সপ্তাহ পর।

নীলু চুপ করে বইল।

বিয়ের পর হঠাৎ মনে পড়েছে আরে কবির মামাকে তো বলা হয় নাই। তখন একটা
কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে।

নীলু দৃঢ় হয়ে বলল, আর এ রকম ভুল হবে না মামা।

না হওয়াই উচিত। ভালোবাসার জবাব ভালোবাসা দিয়েই দিতে হয়। রফিক
আসছে না কেন? এই রফিক। রফিক।

রফিক উকি দিল।

আহ কেমন মামা?

ভালোই আছি

কোমর ভেঙে ফেলেছ নাকি?

কবির মামা জবাব দিলেন না।

দেখি পাটা দাও। সালাম করি নয়ত পরে ক্যাট ক্যাট করবে।

তোমর অসুখ-বিসুখ নাকি?

না।

এরকম গম্ভীর হয়ে আছিস কেন? মনে হয় বিরক্ত।

বিরক্ত না হবে উপায় আছে? ভূমি এসেছ ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে।

সোফায় আমি ঘুমাতে পারি না।

আয়েসি হয়ে গাছিস মনে হয়? পরীক্ষা কবে?

এপ্রিল মাসে।

প্রিপারেশন কেমন?

সেকেন্ড ক্লাস টাইপ। আমি তো মামা লাইফ লং সেকেন্ড ক্লাস ছাত্র। পড়াশোনা
ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাইলে করো।

পড়াশোনার আলাপ করতে ভালো লাগে না?

না।

যা আমার সাধনে থেকে।

রফিক খুশি মনেই বের হয়ে গেল। কবির মামা বহু কষ্টে উঠে বসলেন। ব্যথা
অনেকখানি কমেছে। এখন আর একে প্রশ্ন দেয়া যাবে না। এসব জিনিস প্রশ্ন দিলেই
বাড়ে।

এবার তোমার কন্যাকে নিয়ে এসো গো মা।

নীলু তার মেয়েকে নিয়ে এলো।

চশমাটা দাও। চশমা ছাড়া ভালো দেখি না।

বাবুকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বারবার বলতে লাগলেন, তোমার এই মেয়ে
শাহানার মতো রূপসী হবে। বড় সুন্দর। গোলাপ ফুলের মতো লাগছে।

আপনি মামা দোয়া করবেন।

এই যুগে মা দোয়াতে কাজ হয় না। কোনো যুগেই হয় না। কাজ হয় কর্মে। কর্মে
ঠিক রাখবে। তাহলেই হবে। নাম কী রেখেছ মেয়ের?

এখনো রাখা হয় নাই। বাবা রেখেছেন টুনী।

টুনী ফুনী আবার কিরকম নাম?

আপনি একটু নাম রাখেন মামা।

আমার নাম কি আর পছন্দ হবে?

পছন্দ হবে আপনি রাখেন।

কণা মা মা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, তোজলি। তোজলি রাখে। এর মানে
তোজলি রাখে।

নীলগঞ্জ মুখ তকিয়ে গেল। ঠিক তোজলি ধরনের নাম সে আশা করেনি।

নাম পছন্দ হয়েছে তো মা?

হ্যাঁ হয়েছে।

হাতের তোজলিই রাখে।

নিম্ন কতুয়ার পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে মেয়ের মুখ
বললেন। এই একশ টাকাই ছিল তাঁর সঙ্গে।

রাত কবির মামার জুর এসে গেল। বেশ ভালো জুর। হোসেন সাহেব বললেন,
তোজলি আর্নিকা খাবে? ব্যথা সেরে যাবে।

নিম্ন বিরক্ত হয়ে বললেন- কয়েকটা জিনিসে আমার বিশ্বাস নাই। হোমিওপ্যাথি
জন্ম মধ্যে একটা।

তাহলে ডাক্তার ডেকে আনুক।

এই দুপুর রাতে ডাক্তার ডাকতে হবে না। তোমরা ঘুমাতে যাও। রাতে তিনি কিছু
বলেন না। নীল এক গ্রাস দুধ নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ছুঁয়েও দেখলেন না।

দুধ শিশুদের খাবার মা, দেশে দুধের অভাব। আমরা বুড়োরাই যদি সব দুধ খেয়ে
কোন ওরা খাবে কি?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলল- তুমি এক গ্রাস দুধ খেলে ওদের কম পড়বে না।

এক গ্রাস এক গ্রাস করেই লক্ষ গ্রাস হয়। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু বিচার করতে হয়।
একটা রাত উপোস দিলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। উপোসের মতো বড় অমুখ কিছু
নাই।

কবির মামার ঢাকা আসার উদ্দেশ্য দ্বিতীয় দিনে জানা গেল। তাঁর মাথায় বিরাত
একটা পরিকল্পনা এসেছে। তিনি নীলগঞ্জকে সুখী নীলগঞ্জ বানাতে চান। নীলগঞ্জের সব
জানুষকে তিনি সুখী দেখতে চান। সেখানে কোনো দুঃখ থাকবে না। সবাই দু'বেলা ভাত
খাবে। সবটাই তিনি করবেন বৈদ্যশ্রমের বিনিময়ে। তাঁর পুরনো ছাত্রদের কাছ থেকে
টাকা তুলে। মনোয়ারা বললেন, আপনার তো ভাইজান এখন বিশ্রামের সময়। রিটায়ার
করেছেন এখন বিশ্রাম করবেন।

তবে থাকলেই বুঝি বিশ্রাম হয়? বিশ্রাম হচ্ছে কাজে। একটা ভালো কাজ করার
মধ্যে বিশ্রাম আছে। সফিক কি বলিস?

সফিক কিছু বলল না।

হোসেন তোমার কি মত?

ভালোই তো।

ভালোই তো বলছ কেন? আইডিয়া পছন্দ হচ্ছে না? কবির আগে যদি এটা করে
গেতে পারি তাহলে কাজের মতো কাজ হয়। কিছুই হেঁচকরণ না জীবনে।

কিছুই করোনি কথাটা তো ঠিক বললে না। হাজার হাজার ছাত্র তৈরি করেছ। এটা
তো কম না।

নীলগঞ্জের এই কাজটাও করতে চাই। আমাকে দেখে অন্যরা উৎসাহী হবে।

বাংলাদেশে হাজার হাজার নীলগঞ্জ হবে। দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ঠিক কি না বলো?

ঠিক।

একটা বড় জাবদা খাতা কিনেছি, ছাত্রদের সব নাম ঠিকানা বের করে করে লিখছি। এদের সবার কাছে চিঠি দেব। তারপর দেখা করব। কাজে নেমে পড়তে হবে। কতদিন বাঁচি তার ঠিক নাই কোনো।

তিনি সবার সঙ্গেই মহা উৎসাহে নীলগঞ্জ নিয়ে আলাপ করলেন। রফিক শুধু বাদ পড়ল। রফিকের সঙ্গেও তুলতে চেয়েছিলেন রফিক হাই তুলে বলল— এইসব বোগাস আদর্শবাদী স্বপ্নের কথা জনতে আমার ভালো লাগে না মামা।

বোগাস?

বোগাস তো বটেই। একজন রিটার্ডার্ড স্কুল মাস্টার বাংলাদেশের চেহারা পাটে ফেলবে?

বাংলাদেশের কথা তো বলছি না। নীলগঞ্জের কথা বলছি।

তোমাকে দিয়ে এসব হবে না মামা। এই বয়সে খামখা দৌড়াদৌড়ি করে শরীর নষ্ট করবে। এগ্নিতেই কোমর ভেঙে কাত হয়ে আছ।

কবির মামা দু'দিন ঢাকা থাকলেন। ফিরে যাবার ভাড়া ছিল না। সফিকের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা ধার করলেন।

ধরের টাকা সাত দিনের মধ্যে ফেরত এলো। মানি অর্ডারের কুপনে তোজগিরি নামের আরবি বানান, ব্যাপ্তিস্থিত অর্থ বিশদভাবে লেখা। সেই সঙ্গে লেখা আমার পুরনো কোনো ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলে অবশ্যই তার নাম-ঠিকানা লিখে রাখবে। ভুল হয় না যেন।

সব মানুষের মধ্যেই কিছু রহস্য থাকে।

অমীমাংসিত রহস্য। কবির মামার মধ্যে সেই রহস্যের পরিমাণ কিছু বেশি। তাঁর বাড়ি চব্বিশ পরগনার বারাসতে। বারাসত থেকে এগারো মাইল দূরে বনম্বামের এক কুলে মাটির করতেন। ভদ্র মাসের এক ভোরবেলার হঠাৎ তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল। ক্যান্সাসের ব্যাগ এবং একটি ছাতা নিয়ে গৃহ ত্যাগ করলেন। কাউকে কিছু বলে গেলেন না।

পাথে বিধু মল্লিকের সঙ্গে দেখা। বিধু মল্লিক বলল, সাত সকালে কোথায় যান? মাস্টার তার জবাবে ক্যাকাশে ভাবে হাসলেন। পরিষ্কার কিছু বললেন না। বিধু মল্লিক বলল, হাবড়া যান না কি?

ই।

গাতে কিরবেন না?

ই ফিরব।

কিন্তু তিনি ফিরলেন না। সেটা বাংলা তেরশ বাহার সন। ভারতবর্ষের ক্রান্তিকাল। দীর্ঘদিন তাঁর আর কোনো বোজ পাওয়া গেল না।

প্রায় এক যুগ পর ইংরেজি উনিশশো চুয়ান্ন সনে তাকে দেখা গেল ময়মনসিংহের নীলগঞ্জে। মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মুখ ভর্তি দাড়িগোফ। অত্যন্ত রাশভারী

কিন্তু মানুষ কিন্তু কাজকর্মে খুব উৎসাহ। ছ'মাসের মধ্যে ফুলের চেহারা পাল্টে ফেললেন। কোদাল দিয়ে মাটি কুণিয়ে ফুল কল্যাণ্ডের সামনে চমৎকার একটি ফুলের বাগান করলেন। গ্রামের লোকজন বলাবলি করতে লাগল তেলসমৃদ্ধি কাণ্ড। করছে কি পাগল! মাষ্টার?

সেবার শীতে ময়মনসিংহ থেকে ফুল ইন্সপেক্টর জমীর আলী সাহেব ফুল ইন্সপেকশনে এলেন। বাগান দেখে অবাক হয়ে বললেন এই বাগান আপনার করা?

জি স্যার।

নিজের হাতেই করেছেন?

ছাত্ররা সাহায্য করেছে। নিজেরও করেছি।

জমীর আলী সাহেব ক্রিয়ে গিয়ে ফুলের সরকারি সাহায্য বাড়িয়ে দিলেন। শুধু তাই না ময়মনসিংহ জেলার সবক'টি মাইনর ফুলের হেড মাষ্টারকে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। এরা সরমর্ম হচ্ছে— ছাত্রদের মানসিক বিকাশ সাধনের জন্যে প্রতিটি ফুলে ফুলের বাগান থাকা বাঞ্ছনীয়। ফুল ছাত্রদের মনোজগতের উন্নতি ও সৌন্দর্যস্বাদ বৃদ্ধির সহায়ক। ইত্যাদি।

অজ্ঞপাড়াগার একটি দরিদ্র, দীনহীন ফুলে রকমারি ফুলের সমারোহ জমীর আলী সাহেবকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। যার জন্যে তিনি পরের বছরই আবার ফুল ইন্সপেকশনে এলেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে দেখলেন ফুলের কোনো চিহ্নই কোথাও নেই। সে জায়গায় নানা ধরনের সবজির চাষ করা হয়েছে। জমীর আলী প্রথমতঃ গলায় বললেন, কী ব্যাপার? কবির মাষ্টার গম্ভীর গলায় বললেন, দরিদ্র দেশে ফুলের বিলাসিতা ঠিক না। শাকসবজি বিক্রি করে কিছু পয়সা হয়। সেই পয়সা ছাত্রদের পিছনে খরচ করা হয়। সবাই এখানে খুব দরিদ্র।

জমীর আলী রাগী গলায় বললেন, দরিদ্রদের সৌন্দর্য বোধ থাকবে না?

জি না। আগে পেটে ভাত তারপর অন্য কিছু। এখানে আমার অনেক ছাত্র আছে, তারা আজ ফুলে না খেয়ে এসেছে।

জমির আলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ফুল গাছগুলি আপনি কি নিজের হাতেই নষ্ট করেছেন?

জি স্যার।

আপনার কষ্ট হয় নাই?

জি না।

পাগল নাকি আপনি? আমি কত জায়গায় আপনার ফুলের বাগানেই প্রশংসা করেছি, আর আপনি কি না সব উপরে লাউ, কুমড়া লাগিয়েছেন আবার কলহেই কষ্ট হয় নাই। আপনাকে বোঝা মুশকিল। ইউ আর এ ভেরি স্ট্রেন্জ ম্যান।

নীলগঞ্জের লোকেরাও বোধ হয় তাকে বিচিত্র মানুষ হিসেবেই জানে। জীবন প্রায় পার করে দিয়েছেন এখানে। এখানকার সবাই তাঁকে চেনে, পাগলা মাষ্টার হিসেবে। দেখে একটু অন্য রকম চোখে। শ্রদ্ধা ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সেই দৃষ্টিতে কিছু ভয়ও হয়ত থাকে।

গ্রাম্য বড় বড় সালিশিশুলিতে তাঁকে থাকতে হয়। সমস্যার যখন কোনোরকম মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন একজন কেউ বলে- মাষ্টার সাব যা বলেন তাই। কবির মাষ্টারকে তখন কিছু একটা বলতে হয়। এবং তাঁর কথাই হয় সালিশির শেষ কথা। তাঁর মীমাংসা বাদের পছন্দ হয় না তারাও চুপ করে থাকে। তখনো মুখে বলে- আচ্ছা ঠিক আছে, মাষ্টার সাব বলছেন এর উপর আর কথা কি? মাষ্টার সাবের কথার একটা ইচ্ছাত আছে না? একজন মানুষের জন্যে এটা হয়ত তেমন বড় কোনো সম্মান নয়, আবার হয়ত ঠিক তুচ্ছ করবার মতোও কিছু নয়।

ভাটি অঞ্চলের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে নীলগঞ্জের একজন কেউ। স্বস্তরবাড়ির সঙ্গে তার বিবাদ। স্বীকে নাইয়ের যেতে দিচ্ছে না। দু'বছর হয়ে গেল বাপের বাড়ি যেতে পারছে না মেয়েটি। কোনো উপায় না দেখে এক সময় সে মাষ্টার সাবের কাছে জড়সড় হয়ে দাঁড়াবে।

মাষ্টার সাহেব বলবেন- কার বাড়ির বউ তুমি? কোনোদিন তো দেখি নাই। বৌটি ক্ষীণ স্বরে বলবে- মিয়া বাড়ির।

ও, আচ্ছা সোলায়মানের বৌ। বাটিতে করে কি এনেছ গো মা?

মাছের সালুন।

ভালো। খুব ভালো। রাতে আরাম করে খাব। রেখে দাও।

বৌটি তরকারির বাটি রেখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আর কিছু বলতে চাও নাকি? বলে ফেল মা। ছেলের কাছে লজ্জার কিছু নাই।

বৌটি তার সমস্যার কথা বলে। মাষ্টার সাহেব গম্বীর হয়ে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে রাত্রে যাব একবার তোমাদের বাড়ি। চারটা ডাল ভাত খাব তোমাদের গুখানে।

মাষ্টার সাহেব যান রাতের বেলা। সোলায়মানকে তাকে প্রচণ্ড একটা ধমক দেন- চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। বাক্সা মেয়ে আটকে রেখে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছে। কাল ভোরেই যেন নৌকা ঠিক হয়।

নৌকা ঠিক হয় ভোরবেলাঙেই। আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে দীর্ঘদিন পর বৌটি রওনা হয় বাপের বাড়ি।

একজন ডিনদেশি মাষ্টারের এই ক্ষমতাও তো তুচ্ছ করার মতো নয়। এ ধরনের ক্ষমতা হঠাৎ করে আসে না। অর্জন করতে হয়। কবির মাষ্টার তা করেছেন।



কেনাকাটা করতে নীলু কখনো একা একা আসে না। স্টোর সঙ্গে থাকে শাহানা কিংবা রফিক। আজ সে এসেছে একা। এবং আসার সঙ্গে সারা পথেই মনে হয়েছে গিয়ে দেখবে নিউমার্কেট বন্ধ। সে লক্ষ্য করেছে সেদিনই কোনো একটা বিশেষ কিছু কেনাকাটার থাকে, সেদিনই নিউমার্কেট থাকে বন্ধ। হয় সোমবার পড়ে যায়, কিংবা

বসন্ত। আজ অবশিষ্ট বুধবার। কে জানে এখন হয়তো নিউমার্কেট বুধবারেই বন্ধ
করবে। অনেকদিন এদিকে আসা হয় না।

নিউমার্কেট খোলাই ছিল। দুপুরবেলার দিকে শুধু বয়স্ক মহিলারাই বাজার করতে
গেলেন। নীলু লক্ষ করল তার চারদিকে খালাস শ্রেণীর মহিলা। দরদাম করছে।
কমাকাটা বিশেষ করছে না। সময় কাটাবার জন্যেই আসা বোধ হয়।

এতদিন চকমকে শাড়ি পরা মহিলা সবকিছুর দাম জানতে জানতে এগুচ্ছে। নীলুর
বল মত লাগল। সে তার পেছনে পেছনে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগল। অনেকদিন
এখানে থেকে বের হয়েছে। ভালোই লাগছে তার। সে অন্যদের মতো দরদাম শুধু
করল। একটা ট্রাই সাইকেলের দাম করল।

এত টাকা?

তেরশ টাকা।

এত দাম? বলেন কি?

বিদেশী জিনিস। আমেরিকান। দেশীটা দেখবেন আপা?

আজ্ঞা দেখান।

দোকানি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখাতে লাগল। নীলুর মায়াই লাগল। সে কিছু কিনবে
না। শুধু শুধু বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছে। এত টাকা দিয়ে বাবুর জন্যে ট্রাই সাইকেল কেনার
প্রশ্নও ওঠে না।

জাপানি সাইকেল দেখবেন আপা? মিডিয়াম দামের মধ্যে পাবেন।

দেখান দেখি কেমন।

নীলু ছোট্ট একটা নিম্বাস ফেলল। একটা সাইকেল কিনতে পারলে ভালোই হতো।
কিন্তু দেখবে নাকি সফিককে? না বলাটা ঠিক হবে না। সফিক কিনে নিতে পারবে না।
শেষে কষ্ট পাবে। কাউকে কষ্ট দিতে তার ভালো লাগে না।

এই নীলু না? এখানে কি করছিস?

নীলু তাকিয়ে রইল, মেয়েটিকে চিনতে পারল না।

এমন করে তাকাচ্ছিস কেন? চিনতে পারছিস না নাকি? চিনতে না পারলে চড় খাবি।

বন্যা না?

বন্যা এত লোকজনের মধ্যেও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। প্রায় ন'বছর পর দেখা।
কুল জীবনের তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় দুজনে একবার প্রতিজ্ঞা
করেছিল সারাজীবন তারা বিয়ে করবে না। কোনো পুরুষের অধীনে থাকবে না।
স্বাধীনভাবে বেঁচে থেকে পৃথিবীকে দেখিয়ে দিবে মেয়েরাও ইচ্ছা করলে একা একা
শাকতে পারে। প্রতিজ্ঞা করবার পর কি ভেবে যেন দুজন বানিকশ কেঁদেছিল।

বন্যা, নীলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, বিয়ে করেছিস তাই না?

হঁ। তুই?

আমিও করেছি। এখন বল আমাকে চিনতে পারিস কি? কেন?

বন্যা আগের মতোই আছে তবুও কেমন খেঁচা অন্য রকম লাগছে। কিছু একটা
পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পরিবর্তনটা ধরা যাচ্ছে না। বন্যা বলল- কি কথা বলছিস না
কেন? আমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখছিস?

না, তেমন কিছু দেখছি না।

বলিস কি, ববকাট করেছি। গাদাখানিক চুল কেটে ফেলে দিয়েছি। তোর চোখেই পড়ল না? তোর হয়েছেটা কি বল তো?

তাই তো! শিঠি ভর্তি চুল ছিল বন্যার। চুলে নজর লাগবে বলে বন্যার মা কি একটা তাবিজও তার গলায় দিয়ে রেখেছিলেন। এই নিয়ে ক্লাসে কত হাসাহাসি।

চুল কেটে ফেললি কেন?

হ্যাসবেডের সঙ্গে ঝগড়া করে কেটে ফেলেছি।

বলিস কি?

হ্যাঁ। আমার জিনিস আমি কাটব গুর বলার কি?

তুই এখনো আগের মতোই পাগল আছিস।

আর তুই আছিস আগের মতোই বোকা। চল যাই চা খাব।

কোথায় চা খাবি?

কোথায় আবার রেটুরেন্টে।

একা একা চা খাব নাকি আমরা?

বন্যা বিরক্ত মুখে বলল, দুটা মেয়ে যাচ্ছি আমরা একা বলছিস কেন? আজ তুই সারা দিন থাকবি আমার সঙ্গে। ম্যাটিনিতে ছবি দেখবি।

নীলু হকচকিয়ে গেল। বন্যা বলল, নাকি স্বামীর অনুমতি ছাড়া মুভি দেখা যাবে না?

তা না। ঘরে বাচ্চা আছে।

এর মধ্যে বাচ্চাও বাঁধিয়ে ফেলেছিস? এমন গাধা কেন তুই?

বন্যা তাকে নিয়ে অসংকোচে একটা রেটুরেন্টে ঢুকে পুরুষের ভঙ্গিতে ডাকল— এই বয় আমাদের দু'কাণ চা দাও। নীলু মৃদুস্বরে বলল, এড পুরুষদের মধ্যে বসে চা খেতে তোর অস্বস্তি লাগবে না?

অস্বস্তির কি আছে? ওরা কি আমাদের খেয়ে ফেলবে নাকি?

কেমন তাকালে আমাদের দিকে।

তাকাক না।

তুই আগের চেয়ে অনেক শার্ট হয়েছিস।

শার্ট হতে হয়েছে। চাকরি করি তো। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়।

চাকরি করিস?

করব না। তোর মতো ঘরে বসে বছরে বছরে বাচ্চা দেব নাকি?

নীলুর এই কথাটা ভালো লাগল না। বন্যা এমনভাবে বলছে যেন বাচ্চা হওয়াটা একটা অপরাধ। কিন্তু বন্যাকে বড় ভালো লাগছে। আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে।

কোথায় চাকরি করছিস?

ইরানিয়ান এম্বেসীতে। রিসিপসনিস্ট।

নীলু একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে বেতন কত কিন্তু জিজ্ঞেস করল না। বন্যা বলল বেতন কত জিজ্ঞেস করলি না? নাকি জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগল?

বেতন কত?

১৩ন হাজার টাকা। যাতায়াতের একটা এ্যালাউন্স পাই। মেডিকেল এ্যালাউন্স ৩০০। সব মিলিয়ে চার হাজার টাকার মতো।

বলিস কি?

বেতন ভালোই। নিজের টাকা খরচ করি। ওর কাছে চাইতে হয় না। আগে জাতির বাড়িতে যাবার জন্যে পাঁচ টাকা বিকশা ভাড়া পর্যন্ত চাইতে হতো। আর সে ক্ষেত্রে এমন ভাবে যেন দয়া করছে ভিঙ্কা দিচ্ছে। এখন সে মাসের শেষে আমার কাছে ধাও চায়।

বন্যা আশেপাশের টেবিলের সবাইকে সচকিত করে হেসে উঠল। নীলুর অবস্থা লাগতে লাগল। লোকগুলি কি ভাবছে কে জানে। নীলু বলল, আজ তোর অফিস নেই?

না, আজ ইরানের কি একটা জাতীয় উৎসব। নওরোজ নাকি কি যেন বলে। চল ছাট সিনেমা দেখি।

নারে সিনেমা দেখব না।

না দেখলে না দেখবি। আমি একাই যাব।

বন্যা উঠে গেল বিল দিতে। নীলু দুঃখিত হয়ে লক্ষ করল বন্যা একবারও জিজ্ঞেস করেন না- তোর ছেলেমেয়ে ক'টি ওদের নাম কি? নীলু বলল বন্যা তুই একবার আমার বাসায় আসিস। আমার বাবুকে দেখে যাবি।

যাব। ঠিকানাটা বল লিখে নেই।

বন্যা ঠিকানাটা লিখে নিল নিকুৎসাহ ভসিতে। যেন নেহারতে লেখার জন্যেই লেখা। বন্যা বলল, তুই এখন কি করবি? বাসায় যাবি?

একটা জিনিস কিনব তারপর বাসায় যাব।

কি জিনিস?

আগামীকাল ওর জন্মদিন সেই উপলক্ষে ওর জন্যে কিছু একটা কিনব।

ও, ও করছিস কেন? নাম ধরে ডাকিস না? তুই এমন গ্রামা মেয়েদের মতো করছিস কেন? পড়াশুনা করে এই লাভ হলো তোর? কোন পর্যন্ত পড়েছিস?

বি.এ. পাস করেছি। এম.এ. ভর্তি হয়েছিলাম তারপর বিয়ে হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে ঢুকে পড়লি? পড়াশুনা মাথায় উঠল।

নীলু কিছু বলল না। বন্যা বলল- জন্মদিনের জন্যে কিছু কেনার দরকার নেই ওতে বেশি লাই দেয়া হয়। তাছাড়া উপহারটা তুই তোর হ্যাসবেন্ডের টাকাতেই কিনছিস। তুই নিজের টাকায় তো দিতে পারছিস না।

নিজের টাকা পাব কোথায়?

চাকরি করলেই পাবি।

চাকরি আমাকে কে দেবে?

চেঁটা না করেই বলছিস কে দেবে। চেঁটা করেছিস কখনো?

নীলু কিছু বলল না। হাঁটতে লাগল বন্যার সঙ্গে সঙ্গে। বন্যা বলল- সব অফিসেই এখন মেয়েদের কোটা আছে। চেঁটা করলেই পাওয়া যায়। ছেলেদের চাকরি পাওয়া সমস্যা মেয়েদের চাকরি সমস্যা নয়। তুই সত্যি সত্যি চাইলে আমি চেঁটা করতে পারি। চাস নাকি?

নীলু কিছু বলল না। বন্যা চলে গেল মুভি দেখতে। ঘরে তার এখন ফিরতে ভালো লাগছে না।

নীলু একা একা ঘুরতে লাগল। তার হাতে টাকা আছে মাত্র দুশ। দুশ টাকায় পছন্দসই কিছু পাওয়া যায় না। হালকা বাদামি রঙের একটা শার্ট পাওয়া গেল। খুব পছন্দ হলো নীলুর কিছু দাম চাইল তিনশ টাকা। এর নিচে নাকি এক পয়সাও নামা যাবে না। নীলু মন খারাপ করে শেষ পর্যন্ত একটা লাইটার কিনল একশ পঁচাত্তর টাকায়। সার্টটা কেনা হলো না এইজন্যে মনে একট আফসোস বিধে রইল। ওকে শার্টটায় খুব মানাত।

সফিক লাইটার দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। নীলু বলল- পছন্দ না হলে ওরা ফেরত নেবে। পছন্দ হয়নি?

পছন্দ হয়েছে।

তাহলে এমন মুখ কালো করে আছ কেন? নাও একটা সিগারেট মুখে নাও, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

সফিক একটা সিগারেট বের করে স্নান গলায় বলল, টাকা-পয়সার এমন টানাটানি এর মধ্যে এতগুলি টাকা বাজে খরচ করার কোনো মানে হয় না।

নীলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। চোখ ভিজ্জে উঠতে শুরু করল। সফিক বলল, এইসব জিনিস খুব হারায়। এ সপ্তাহের মধ্যেই দেখবে হারিয়ে ফেলেছি। কই ধরিয়ে দাও।

নীলু সিগারেট ধরিয়ে দিল। এবং কিছুক্ষণ পরই বারান্দায় গিয়ে চোখ মুছে এলো। অকারণে অন্যকে চোখের জল দেখানোর কোনো মানে হয় না।

বাবু জেগে উঠেছে। কান্দছে ট্যা ট্যা করে। নীলু ঘরে ঢুকে বাবুকে কোলে তুলে নিল। ওর গা একটু গরম। কোলে উঠেও কান্না থামছে না। হাত মুঠি করে কঁদে কঁদে উঠেছে। সফিক বলল, ওকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও বড় বিরক্ত করছে।

নীলু বসার ঘরে চলে এলো। শাহানা পড়ছে বসার ঘরে। সে পড়া বন্ধ করে উঠে এলো- আমার কোলে দাও ভাবী। আমি কান্না থামিয়ে দিচ্ছি এক মিনিট লাগবে।

তুমি পড়াশোনা করো, কান্না থামাতে হবে না।

আহা ভাবী, দাও না। প্রিয়।

শাহানা সত্যি সত্যি কান্না থামিয়ে দিল। চিত্তিত মুখে বলল, ওর গা বেশ গরম ভাবী।

হঁ। একটু গরম।

বাবাকে শুনিও না। বাবা শুনলেই বেলাডোনা-ফোনা খাইয়ে দেবে। শাহানা খিলখিল করে হেসে উঠল। নীলু হাসল না।

এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন ভাবী?

এমনি। কারণ নেই কোনো।

মন খারাপ নাকি?

না।

আজ শুনলাম পোলাও রান্না হচ্ছে, ব্যাপার কি ভাবী? মা খুব চটামেচি করছিল মাসের শেষে এত খরচ।

কখন করলেন?

কুমার হাইরে ছিলে- নিউমার্কেটে। আজ কি কোনো বিশেষ দিন ভাবী?

বিশেষ দিন আর কি? তোমার ভাইয়ের জন্মদিন।

শাওনা মুখ টিপে হাসতে লাগল। নীল বলল, হাসছ কেন?

এমান হাসছি। ভাবী, তুমি ভাইয়াকে খুব ভালোবাস তাই না?

নীল লজ্জিত হয়ে পড়ল। বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। নীল বলল- ওকে শুইয়ে দাও
কখনো ঘুমুচ্ছে।

শাওনা একটু। কি আরাম করে ঘুমুচ্ছে দেখ না।

শাওনা শাহানা। বাবুকে নিয়ে ঘুরতে দেখলে মা রেগে যাবেন।

বাওক আমি কেয়ার করি না।

নীল রান্নাঘরে উঁকি দিল। মনোয়ারা বিরক্ত মুখে কি বেন জ্বাল দিচ্ছিলেন। নীলকে
নোংরা রেগে উঠলেন- ইঠাৎ করে তোমার এমন পোনাও খাবার সখ হলো কেন বলো
কথা?

নীল বড় লজ্জা পেল।

সংসারের এই অবস্থা এর মধ্যে হুটহুট করে এত বাজার করা ঠিক না। সবাই অবুঝ
হলে? বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া বাড়িয়েছে।

আবার?

হ্যাঁ। একশ টাকা বাড়িয়েছে। আর কি মিষ্টি মিষ্টি কথা। আমাকে ডাকছে বড়
খানা। ইচ্ছা করছিল এক চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেই।

নীল হাসতে গিয়েও হাসল না। মনোয়ারা নিজের মনে গজগজ করতে লাগলেন-
শহরে চাকরি বাকরি করতে হলে নিজের বাড়ি থাকতে হয়। ভাড়া বাড়িতে থেকে
শহরে চাকরি করা যায় না।

নীল অশ্রু ঝরে বলল- একদিন হয়তো বাড়ি হবে। মনোয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঝিয়ে
ঠেলেন- হবেটা কি ভাবে? আকাশ থেকে টুপ করে একটা পড়বে নাকি? না তোমরা
আপাউদ্দিনের চেরাগ টেরাগ শেয়েছ? যাও তোমার স্বত্তরকে জিক্সেস করে এসো তো,
তিনি এখন দয়া করে ভাত খাবেন কিনা। না খেলে কখন উনার মর্জি হবে।

মনোয়ারা আজ বিকাল থেকে হোসেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে
দিয়েছেন। এরকম তিনি প্রায়ই করেন এবং হোসেন সাহেব বড়ই কাবু হয়ে পড়েন। স্ত্রীর
এক ভাস্কানোর জন্যে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম কায়দা করেন। আজ কিছুই করছেন না।
সহ্যা থেকে চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘর অন্ধকার। ব্যক্তি জ্বালানো
হয়নি।

নীল মৃদু স্বরে ডাকল- বাবা। হোসেন সাহেব উঠে বসছেন।

মা জিক্সেস করেছেন ভাত খাবেন কিনা।

খাব। বলে আসো খাব।

মার সঙ্গে কথা বন্ধ নাকি?

ইং।

কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে?

তেমন কিছু না। পেনশন তুলতে গিয়েছিলাম। তুলতে পারিনি তাতেই তোমার মা গেছে স্কেপে। বললাম কাল তুলব। এই ভিড়ের মধ্যে আমি বুড়ো মানুষ ধাক্কাধাক্কি করতে পারি নাকি?

তাতো ঠিকই।

এই জিনিসটা তোমার শাতড়িকে বুঝাব কি ভাবে? অন্যদেরও যে ছোটখাটো প্রবলেম হতে পারে, এটা সে বুঝবে না। কি মুশকিল বলো তো দেখি।

হোসেন সাহেব চাদর গায়ে দিলেন। বাতি জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছু বলবেন। নীলু তার স্বত্বের এই ইতস্তত ভঙ্গিটি খুব ভালো চেনে।

কিছু বলবেন বাবা?

হঁ। ছাদে চলো তো মা আমার সঙ্গে। তোমার শাতড়ি যেন আবার না দেখে। বড় সন্দেহ বাতিক্ষত্ত্ব মহিলা ডিলকে ভাল করবে।

তারা নিঃশব্দে ছাদে উঠে এলো। হোসেন সাহেব নির্জন ছাদেও গলা নিচু করে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। সেই সমস্যার কথা শুনে নীলুর মাথায় বাড়ি পড়ল।

হোসেন সাহেব পেনশন না তুলে ফিরে এসেছেন কথাটা ঠিক না। পেনশনের সাতশ এগারো টাকা তেত্রিশ পয়সা যথারীতি তুলেছেন। এবং একটা রিকশা নিয়ে গিয়েছিলেন বায়তুল মুকাররমে এক পাউন্ডের একটা ফ্রুট কেক কিনবার জন্যে। ফ্রুট কেকও ঠিকই কিনেছেন দাম দিতে গিয়ে দেখেন পকেট ফাঁকা একটা পয়সাও নেই। নীলু শুকনো গলায় বলল- ভালো করে পকেট দেখেছেন।

খুব কম হলেও দশ বার করে প্রতিটি পকেট দেখলাম। পকেটে টাকা না থাকলে টাকা পাওয়া যাবে না। একবার খোঁজাও যা একশবার খোঁজাও তা।

তা ঠিক।

এখন কি করি তুমি বলো বৌম। কাল তো তোমার শাতড়ি ঠেলে ঠেলে আমাকে আবার পাঠাবে। পাঠাবে না?

হঁ পাঠাবেন।

চিত্তায় আমার ঝাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কি করব একটা বুদ্ধি দাও মা।

নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল, সত্যি কথাটা বললে কেমন হয় বাবা? হোসেন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, সত্যি কথা বললে উপায় আছে? আমাকে টিকতে দিবে এ বাড়িতে? তুমি তোমার শাতড়িকে কতটুকু চেনো? আমি চিনি চক্লিশ বছর ধরে।

নীলু চুপ করে রইল। হোসেন সাহেব বললেন, তুমি বরং সফিককে আজ রাতে কথাটা বলো। সে কাল সাতশ টাকা জোগাড় করে রাখুক। আমি তাঁর অফিস থেকে নিয়ে আসব।

ঠিক আছে বলব।

এইটাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। এর আর দ্বিতীয় কোনো সমাধান নেই।

হোসেন সাহেব ছট চিন্তে নিচে নেমে এলেন। তাঁর মনের মেঘ কেটে গেছে। খেতে বসে রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। তাঁর কলেজ জীবনের দু'একটা মজার মজার গল্প বললেন। ঝাওয়া-দাওয়ার পর বাড়িওয়ালার বাসায় রওনা হলেন। খানিকক্ষণ টিভি দেখবেন।

মনোহারা বিরক্ত হয়ে বললেন, লজ্জা লাগে না পরের বাড়িতে বসে টিভি দেখতে?
লজ্জা? এর মধ্যে কি আছে?

রোজ রোজ অন্যের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নাই?

না, কিছুই নাই। তাছাড়া ওরা আমাকে পছন্দ করে। বাড়িওয়ালার মেয়েটা আমাকে
পছন্দ করে। রশীদ সাহেবও আমাকে খুব খাতির করে।

গাজে বকবক করবে না। দুনিয়াসুদ্ধ লোক তোমাকে খাতির করে। বা মনে আসে
কি? খালস। আজ কোথাও যেতে পারবে না বসে থাকো এখানে।

এসে থেকে করবটা কি?

গা ইস্কা করো।

হোসেন সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন তবে খুব একটা বিচলিত হলেন না।
মনোহারা কথা বলা শুরু করেছেন এটা একটা সুলক্ষণ। তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথি বই
খুলে এসলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন। এক ফাঁকে নীলুর কাছ
থেকে সিগারেট নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেনে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি
একজন সুখী পরিতৃপ্ত মানুষ। তাঁর কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই। এই পৃথিবীতে বাস করতে
হচ্ছে তিনি আনন্দিত।

গাহানা লক্ষ করল বই পড়তে পড়তে হোসেন সাহেব গুনগুন করে গান গাইছেন।
গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, তবে “না গো না গো” এই শব্দগুলি আছে। শাহানার
কথা মজা লাগল। বাবার মনে এত ফুর্তি কেন কে জানে? মাঝে মাঝেই তাঁর মধ্যে এমন
কিছু ভাব আসে। শাহানা বলল— তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন বাবা? হোসেন
মাঝে মাঝে জবাব না দিয়ে পা নাচাতে লাগলেন।

নীলু পেনশনের ব্যাপারটা কি করে বলবে বুঝতে পারছে না। আজকের দিনটিতে
কিছুকে কোনো খারাপ খবর দিতে ইচ্ছা করছে না। ইঠাৎ করে বেচারী একদিনের
মধ্যে সাতশ' টাকা জোগাড় করবে কি ভাবে?

সফিক ঘুমবার আয়োজন করছে। শেষ সিগারেটটি ধরিয়েছে। এখন সে বানিক্ষণ
পায়চারি করবে। নীলু হালকা গলায় বলল, আজ আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা
হয়েছিল— বন্যা নাম। সফিক কিছু বলল না। নীলু বলল, তোমাকে তো তার কথা
হলেহিলাম এক পুলিশ ইন্সপেক্টরের মেয়ে। খুব ছটফট করত। সারাক্ষণ কথা বলত।
কাসে গুর নাম ছিল ফরফরানি। প্রায় ন'বছর পর গুর সঙ্গে দেখা। অবিকল আগের
মতোই আছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সারাক্ষণ বকবক করছে। ও আবার চাকরিও করে, চার হাজার টাকার মতো
পায়।

সফিক কিছু বলল না। মশারি তুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সহজ হয়ে বলল— বাতি
লাগিয়ে নাও নীলু। তোমার ঘুমুতে দেবি আছে নাকি?
না আমিও শোব।

নীলু বাতি নিভিয়ে সফিকের গা ঘেঁষে ঘুমুতে গেল। সফিক হেসে বলল— কি

ব্যাপার আজ আমার সঙ্গে কেন? নীলু লজ্জিত হয়ে বলল, কেন তোমার সঙ্গে আমি ঘুমাই না? তুমিই তো টুনীকে রেখে দাও মঝখানে।

সফিক হাত বাড়িয়ে নীলুকে আকর্ষণ করল। পুরুষদের এই আকর্ষণের অর্থ পৃথিবীর সব নারীদেরই জানা। নীলু জড়িয়ে ধরল সফিককে। চারদিক অন্য রকম হতে শুরু করল। শারীরিক ভালোবাসাও এক ধরনের ভালোবাসা। এ ভালোবাসাও নীলুর ভালোই লাগে। এই সময়টাতেই সফিক তরঙ্গ ভঙ্গিতে কিছু কথাবার্তা বলে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়। হাসির কথা বললে হাসে।

আমার এই বন্ধু কি বলছিল জানো?

কি বলছিল?

আমাকে বলছিল একটা চাকরি চাকরি জোগাড় করতে। চেষ্টা করলেই নাকি পাওয়া যায়।

তুমি কি বললে?

আমি আবার কি বলব? কিছুই বলিনি।

নীলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চাকরি একটা পেলে মন্দ হয় না কি বলো? ভালোই হয়। সংসারের টানাটানি দূর হয়।

চেষ্টা করে দেখব নাকি?

সফিক তরল হয়ে বলল- তুমি কি চাকরি করতে পারবে?

পারব না কেন?

চাকরি করার মেয়ে অন্য রকম হয়। তুমি সেই টাইপ না। তুমি গৃহী টাইপ মেয়ে। আমি ঠিকই পারব। গৃহী টাইপ হই আর যাই হই।

আচ্ছা দেখা যাবে।

সফিক এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। নানা রকম স্বপ্ন দেখতে লাগল। মন্দ হয় না একটা চাকরি পেলে। সংসারের কষ্ট দূর হয়। মাসে মাসে মাকে কিছু টাকা পাঠানো যায়। একটা টেলিভিশন কেনা যায়। টিভি দেখার জন্যে বাবাকে তাহলে আর রোজ রোজ অন্যের বাড়ি যেতে হয় না। রফিকের হঠাৎ আসা আসার মেটানো যায়। শাহানাকে গলার একটা চেইন বানিয়ে দেয়া যায়। এত বড় মেয়ে অথচ কানে দু'টি ছোট্ট ফুল ছাড়া কোনো সোনার গয়না নেই। গয়না দূরের কথা একটা ভালো শাড়ি পর্যন্ত নেই। গত ঈদে সে লাজুক ভঙ্গিতে বলেছিল- ভাবী আমাকে একটা কমলা রঙের রাজশাহী সিঁকের শাড়ি কিনে দেবে?

নীলু বলেছে, হ্যাঁ দেব। নিশ্চয়ই দেব।

আমাদের ক্লাসের অরুণার এ রকম একটা শাড়ি আছে। অবিকল সে রকম একটা শাড়ি চাই।

ঠিক আছে।

তোমাকে আমি প্রিন্টটা দেখিয়ে দেব।

শাহানা প্রিন্ট দেখিয়েও দিল কিছু সেই শাড়ি কেনা হলো না। হলো না বলা ঠিক না বলা উচিত কিনে দেয়া গেল না। শাহানা কিছুই বলল না। শুধু নীলু লজ্জায় এবং

দুঃখ বাধা দরজা বন্ধ করে ইদের ভোরবেলায় দীর্ঘ সময় কেঁদেছিল। কত রকমের দুঃখ না আছে মানুষের।

একদিন শাহানার হয়তো খুব বড় লোকের ঘরে বিয়ে হবে। ভাইয়ের বাড়ির ছোট্ট দুঃখ নয় মনেই থাকবে না। কিন্তু নীলুর মনে তো এই দুঃখ থাকবেই। প্রতিটি দিনই ভোরবেলা মনে পড়বে।

নীলু সাপধানে বিহানা ছেড়ে উঠল। একটা বেজেছে। বাবুর জেগে উঠার সময় একটা দুধ খাওয়ার জন্যে কাঁদতে শুরু করবে। দুধ বানিয়ে রাখাই ভালো।

হাস্য করে শাহানা পড়ছে। খুব খাটাখাটনি করছে। নিশ্চয়ই ভালো করবে।

নীলু দরজা খুলে বেরুতেই শাহানা বলল, তুমি এখনো ছেগে আছ?

হ্যাঁ।

পড়াশোনায় দারুণ উৎসাহ দেখি।

তুমি কি চাও আমি ফেল করি?

না, তা চাই না। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ করে ফেলো তাও চাই না।

শাহানা বই বন্ধ করে উঠে এলো।

ভাণী একটা কথা বলল।

বলো।

মাঝে তোমাকে ছাদে নিয়ে কি বলল?

কেন কিছু না।

না ভাবী বলো। তোমার পায়ে পড়ি।

নীলু অল্প হেসে বলল, তোমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বললাম।

এ সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না ভাবী।

ঠাট্টা কোথায় সত্যি কথা বললাম।

না ভাবী বলো কি ব্যাপার।

বললাম তো একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ছেলে বিনেতে গেলো। দেখতে খুব সুন্দর। ছবি আছে আমার কাছে, তুমি চাইলে ছবি দেখাতে পারি।

কসম বলো।

কসম।

তিন কসম।

তিন কসম আবার কি?

শাহানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। সে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার বিশ্বাসও করতে পারছে না। তার মুখ কান্দো কান্দো হয়ে গেল। নীলু হাসতে হাসতে বলল, ঠাট্টা করছিলাম। মনে হয় তোমার আশা ভুল হয়েছিল।

শাহানা ছুটে এসে নীলুর চুল টেনে দিল—কেন তুমি এমন আজ্ঞেবাজে ঠাট্টা করো। আমি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। দেখো এখনো আমার গা কাঁপছে। নীলু শাহানাকে জড়িয়ে ধরল।



বুধবারটা রফিকের জন্যে খুব লাকি। বুধবারে সে নিশ্চিত হয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারে। এই দিন কোনো অঘটন ঘটবে না। কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখা হবে। বাসে উঠলে জানালার পাশে বসার সিট পাওয়া যাবে। বাসের কন্ডাক্টর ভাংতি হিসেবে তাকে দেবে চকচকে নতুন নোট।

আজ বুধবার কিন্তু তবু অঘটন ঘটল। ফার্মগেটে বাস থেকে নামার সময় নতুন পাঞ্জাবিটা ফস করে পেটের কাছে ছিড়ে গেল। অনেকখানি ছিড়ল। রফিকের সঙ্গে তখনো 'অদ্রলোক' বললেন— কন্ডাক্টরকে একটা চড় দেন ডাই। তাড়াতাড়ি করেন, বাস ছেড়ে দেবে।

রফিক অবাক হয়ে বলল, তাকে চড় দেব কেন? সে তো ছিড়ে নাই।

সে না ছিড়ুক তার বাস তো ছিড়েছে।

অকাটা যুক্তি। কিন্তু বাস ছেড়ে দিয়েছে। রফিক বিমর্ষ মুখে স্টেডিয়ামের দিকে এগুতে লাগল। তার প্যান প্রোগ্রাম বদলাতে হবে। ছেড়া পাঞ্জাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না। সবচে' ভালো বুদ্ধি হচ্ছে একটা বই কিনে পেটের কাছে ধরে রাখা। অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার।

রফিক নিউজ স্ট্যান্ড থেকে এক কপি বিচিত্রা কিনে ঊঁঠে দাঁড়ানো মাত্র মেয়েলী গলা শোনা গেল— রফিক সাহেব।

সে তাকিয়ে দেখে শারমিন। হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি গায়ে। লাল টুকটুকে একটা শাল। হাতে পাটের ব্যাগ। শারমিন বলল, এভাবে তাকাচ্ছেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না।

চিনতে পারছি।

আমি তখন থেকে লক্ষ করছি।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। দেখলাম পেটে হাত দিয়ে খুব চিন্তিত মুখে আপনি হাঁটছেন।

কী হয়েছে আপনার?

রফিক কিছু বলল না।

আপনার শরীর খারাপ করেছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

শরীর ঠিকই আছে। বাস থেকে নামার সময় পাঞ্জাবি ছিড়ে গেছে।

ছেঁড়াটা হাত দিয়ে ঢেকে হাঁটছি।

শারমিন হেসে ফেলল। রফিক বিরক্ত মুখে বলল— আপনি হাসছেন?

স্মারি আর হাসব না।

এখানে কি করছেন?

কি কিনা? এসেছি। বিদেশে কিছু বই পাঠাতে হবে। একজন চেয়েছে।

কি বই? গল্প-উপন্যাস?

না, সে গল্প-উপন্যাস পড়ে না। সিরিয়াস ধরনের বই পড়ে।

একটা ডিকশনারি কিনে পাঠিয়ে দিন।

কারণ খলবিল করে হেসে ফেলল। রফিকের মনে হলো বুধবার দিনটি আসলে

কি উপা? ভালোই।

কি? সাহেব আপনার কাজ না থাকলে আসুন আমার সঙ্গে বই পছন্দ করে

কি? আছে কোনো কাজ?

না, কাজ নাই কোনো। আর থাকলেই বা কি?

কি? এটিতে শুরু করল। শারমিনের হাঁটার ভঙ্গি স্বাভাবিক। কোনো রকম সংকোচ

কি? নেই। যেন তারা দীর্ঘদিনের বন্ধু। শারমিন হালকা গলায় বলল, ঐদিন

কি? খুব বাগ করেছিলেন তাই না?

হ্যাঁ।

কি? বেশি রাগ করেছিলেন?

হ্যাঁ।

এখনো রাগ আছে?

নাহে।

কি? এবেলে আপনার রাগ কমবে?

শারমিন যদি আজ সারাদিন আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে রাগ কমবে।

শারমিন চমকে তাকাল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। রফিক বলল, এখন

কি? আপনি রাগ করেছেন তাই না?

না, আমি রাগ করিনি।

তাহলে কি আজ সারাদিন থাকবেন আমার সঙ্গে? বাজার শেষ করে আমরা

কি? চাওয়াখানায় যেতে পারি।

শারমিন হেসে ফেলল। রফিক বলল- হাসছেন কেন?

চাওয়াখানায় যাবার কথা শুনে হাসছি।

তাহলে অন্য কোথাও, মিউজিয়ামে কিংবা সোনারগাঁয়ে যেতে পারি। প্রাচীন বাংলার

কি? খানী।

আজ আপনার এত ঘুরাঘুরির শখ হয়েছে কেন?

কারণ আজ আমার জন্মদিন।

এলেই রফিকের একটা খারাপ লাগল। একটা মিথ্যা কথা বলল হলো। কিছু কিছু

কি? বাগসে সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কপটতা করতে ইচ্ছা করে না। রফিক

কি? সীপারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। জন্মদিন প্রসঙ্গে এই মিথ্যাকথাটা বলে তার খুব খারাপ

লাগতে।

আপনার জন্মদিন আজ? বাহ বেশ মজা তো। দুই ভালো দিনে দেখা হলো আপনার

কি? আসুন আপনাকে একটা গিফট কিনে দেব। আপনি কিছু না বলতে পারবেন না।

রফিক কিছু বলল না।

আপনাকে খুব সুন্দর একটা পাঞ্জাবি কিনে দেব। ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরা কেউ আমার পাশে পাশে হাঁটলে আমার ভালো লাগে না।

শারমিন আবার হেসে উঠল। কিশোরীদের মতো হাসি। রিনরিন করে কানে ব্যঞ্জে হঠাৎ করে মন খারাপ করে দেয়।

রফিক মৃদু স্বরে বলল— শারমিন, আমার জন্মদিনের কথাটা মিথ্যা। আজ আমার জন্মদিন নয়।

জন্মদিন নয় তাহলে জন্মদিনের কথাটা কেন বললেন?

আমার ধারণা ছিল এটা বললে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।

আমার থাকটা এত জরুরি কেন?

রফিক কোনো জবাব দিল না। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যার জবাব সরাসরি দেয়া যায় না। শারমিন দ্বিতীয়বার বলল, বলুন কেন আপনি চান আমি আজ সারাদিন আপনার সঙ্গে থাকি?

জানি না কেন চাই।

শারমিন হালকা গলায় বলল, আমরা সারা জীবনে অনেক কিছুই চাই কিন্তু সবকিছু পাই না। আমি সব সময় স্বপ্ন দেখি আমার অনেকগুলি ভাইবোন। সবাই হেঁচো ছুটাছুটি করছে। ঝগড়া করছে। কিন্তু থাকি একা একা। আমার কি মনে হয় জানান, কেউ যদি তীব্র ভাবে কোনো জিনিস চায় সে সেটা পায় না। কোনো কিছুর জন্যেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা ঠিক না। বুঝতে পারছেন।

পারছি।

চলুন, পাঞ্জাবি কিনি। জন্মদিন উপলক্ষেই দিলাম। গ্র্যাডভান্স গিফট।

না, কোনো দরকার নেই। আচ্ছা আমি যাই।

চলে যাবেন?

হ্যাঁ।

শারমিন বলল, রফিক সাহেব আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। আসুন কোথাও বসে কথাটা বলি। এখানে কোনো ভালো রেস্তোরাঁ আছে?

না, এদিকে তেমন কিছু নেই।

চলুন কোনো একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ গিয়ে বসি। চাইনিজ রেস্তোরাঁগুলি এই সময় ফাঁকা থাকে। আসবেন?

চলুন যাই।

রফিক শারমিনের সহজ-স্বাভাবিক আচার আচরণের প্রশংসা করল। এই মেয়েটি জানে সে কি বলছে কি করছে। এটা খুব বড় কথা। বেশিরভাগ মানুষই জানে না সে কি করছে, কি বলছে।

শারমিন বলল, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন? এরা খুব ভালো সমুসা জাতীয় একটা খাবার তৈরি করে। চায়ের সঙ্গে ভালো লাগবে। দিচ্ছে বউদি?

বলুন।

শারমিন খাবারের কথা বলল। অস্বস্তির সঙ্গে এনিক-ওনিক খানিকক্ষণ তাকাল। ঘেন কি বলবে তা একটু গুছিয়ে নিচ্ছে। রফিক বলল, বলুন কি বলবেন।

খাপনা এত গভীর হয়ে থাকলে বলি কি করে? সহজ হয়ে বসুন। আপনাকে দেখে
জন হাঙ্গ আপনি ডাইভা দিতে এসেছেন।

হাঙ্গ হাসতে চেষ্টা করল। শারমিন কি বলবে তা সে বুঝতে চেষ্টা করছে।

শারমিন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সাক্ষির আহমেদ নামে একজন উদ্ভলোক আছেন।
নাইট করছেন আমেরিকায়। অত্যন্ত ভালো ছাত্র এবং আমার বাবা তাকে খুব
বললেন। আমি নিজেও করি। পছন্দ করার মতোই মানুষ। তাঁর মাকে আমি চাচি
কি। মন আমার কোন কারণে খুব মন খারাপ লাগে তখন আমি উনার কাছে যাই,
মন ভালো করবার জন্যে। বুঝতেই পারছেন ইনি কেমন মহিলা। পারছেন না?

পারছি।

এ সাক্ষির আহমেদ ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, যখন আমি
কলেজে পড়ি তখন থেকে। সে জুলাই মাসে দেশে ফিরবে তখন আমাদের বিয়ে হবে।

হাঙ্গ কিছু বলল না। শারমিন মৃদু স্বরে বলল, আমি সুখী হতে চাই। এবং আমি
জানি এই বিয়ে আমার জন্যে সুখ নিয়ে আসবে। আমার ইন্ট্রাশন তাই বলে।

হাঙ্গ সিগারেট ধরাল। শারমিন বলল, আমি আসলে একজন দুঃখী মেয়ে। আমি
খুশি চাই, সুখী হতে চাই।

সবাই চায়।

হ্যাঁ, সবাই চায়। তবে আমি বোধহয় একটু বেশি চাই।

সে মুখ নিচু করে হাসল। রফিক বলল, কঠিন কঠিন বইগুলি ঐ উদ্ভলোকের জন্যে
কিগণেন?

হ্যাঁ। আপনার কথামত একটা ডিকশনারিও কিনে দেব। ওর খুব মেজাজ খারাপ
হবে।

রফিক হেসে ফেলল। শারমিন বলল, বই পছন্দ করবার জন্য আপনি আসবেন তো
আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, আসব।

কেনাকাটার পর আপনার কথামত আমরা ঘুরে বেড়াব। সারাদিন ঘুরব।

তার দরকার নেই।

দরকার আছে। আজ আমার খুব ঘুরতে ইচ্ছা হচ্ছে। এবং আরেকটা কথা রফিক
না।

বলুন।

এখন থেকে আমরা ভূমি ভূমি করে বলব। আপনি আপনি তুমি খারাপ লাগছে।
ঠিক আছে।

প্রথম প্রথম বলতে হয়তো একটু অস্বস্তি লাগবে পরে আর লাগবে না।

সত্যি সত্যি তারা সারাদিন ঘুরে বেড়াল। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখার
পর শারমিনের ইচ্ছা হলো, প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও দেখবে। রফিক বলল,
ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

হোক সন্ধ্যা, আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সঙ্গে গাড়ি আছে, অসুবিধা কি?

উৎসাহে ও আনন্দে শারমিন বলমল করছে। এই আনন্দের উৎসটি কোথায় কে জানে? সারা পথ হাত নেড়ে নেড়ে সে অনেক গল্প করতে লাগল। তুচ্ছ সব কথা এতেই একেকবার সে হাসতে হাসতে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে।

রফিক মোটামুটি চুপচাপই আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। পরিষ্কারভাবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

সোনারগাঁ যাওয়ার পথে শারমিনের চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল। পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে তারা চা খেল। শারমিন বলল, কেমন গ্রাম গ্রাম চারদিক তাই না?

এটা তো গ্রামই। গ্রাম গ্রামতো লাগবেই।

তুমি কখনো গ্রামে গিয়েছ রফিক?

যাব না কেন, অনেকবার গিয়েছি।

আমি কখনো গ্রাম দেখিনি। একবার তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব।

বেশ তো।

গ্রামের জোছনা নাকি খুব সুন্দর হয়?

হয় বোধ হয়, আমার এমন কাব্য ভাব নেই। মন দিয়ে দেখিনি কখনো।

তেমন কোনো হাসির কথা নয়, কিন্তু বিলবিল করে হেসে উঠল শারমিন যেন খুব মজার কথা। রফিক বলল, তোমার সান্নিধ্য সাহেব কি তোমাকে আমার সঙ্গে গ্রামে যেতে দেবেন?

দেবে না কেন? নিশ্চয়ই দেবে।

দেখা যাবে।

ওর মধ্যে কোনো প্রিজুডিস নেই।

না থাকলেই ভালো।

আর সে ভাবুক ধরনের, রাতদিন বই নিয়ে থাকে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ইঠাৎ রোমান্টিক হতে চেষ্টা করে সেটা আরো হাস্যকর লাগে।

দু'একটি উদাহরণ দাও শুনি।

না, থাক, আমার লজ্জা করবে।

আহ লজ্জার কি আছে এর মধ্যে?

শারমিন গম্ভীর হয়ে বলল, যেমন গত মাসে ইঠাৎ চিঠি লিখল— শারমিন তুমি অবশ্যই তোমার মাথার একগাছি চুল ঝামে ভরে পাঠাবে।

বলেই শারমিন লজ্জা পেল। সন্ধ্যার আলোর তার লজ্জারাজ্য মুখ দেখতে বড় ভালো লাগল রফিকের। তার জীবনে এই দিনটি বিশেষ দিন হয়ে থাকবে। একটি গোপন সঙ্কল্প। রফিক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস গোপন করল। তার মনে হলো সুখ এবং দুঃখ একসঙ্গে মিশে থাকে এমন ঘটনার সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি।

পাণামন বাড়ি ফিরল রাত আটটায়। রহমান সাহেব উদ্দিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখেই বললেন,

কোথায় ছিলে মা?

বুকে বেড়াছিলাম। আমেরিকায় পাঠাবার জন্যে কিছু বই কিনলাম, তারপর এক ঘণ্টা পড়ে দেখা হয়ে গেল। ওকে নিয়ে খুব ঘুরলাম।

কেন তো দেবে। খুব চিন্তা করছিলাম।

আই গ্রাম স্যারি।

একটা টেলিফোন করে দিলেই হতো।

একদম মনে হয়নি। পুত্র বাবা রাগ করো না।

পাণামিন বাবাকে জড়িয়ে ধরল। রহমান সাহেব হেসে ফেললেন।

খুশি ভালো বন্ধু বুঝি?

হ্যাঁ।

অনেকদিন পর দেখা হলো?

হ্যাঁ।

পাসায় নিয়ে এলে না কেন?

নিয়ে আসব একদিন।

সাক্ষিরের চিঠি এসেছে। তোমার টেবিলে রেখে এসেছি।

প্যাংকস।

কিছু বইপত্রও বোধহয় পাঠিয়েছে। বিরাট একটা প্যাকেট দেখলাম।

ভুতের বই পাঠাতে বলেছিলাম। তাই পাঠিয়েছে।

সাক্ষিরের চিঠিগুলো সাধারণত ছোট হয়। “তুমি কেমন আছ? আমি ভালো। কলকাতার গুয়েদার এখন বেশ চমৎকার।” এতেই শেষ।

কিন্তু এবারের চিঠিটি বেশ দীর্ঘ। গুয়েদার ভালো ছাড়াও অনেক কিছু লেখা। পাণামিন লক্ষ করল চিঠি পড়তে তার কেমন যেন আগের মতো ভালো লাগছে না। কোনো ধরনের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে তার সত্যি সত্যি হাই উঠল।

পাঠানো বইগুলিও খুলে দেখতে ইচ্ছা করছে না। এরকম হচ্ছে কেন? দায়িত্ব পালনের মতো করে সে চিঠি শেষ করল। বইয়ের প্যাকেট খুলে বইগুলি উল্টে পাল্টে দেখল। রাত দশটার দিকে গেল বাবার ঘরে। শোবার আগে ‘ওড নাইট’ জানাতে।

রহমান সাহেব বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে চুরুট টানছিলেন। ঘরে একটা হালকা শব্দ। রাতের স্বাবারের পর তিনি সাধারণত এক পেগ হুইকি খোলে থাকেন।

পাণামিনকে ঢুকতে দেখে নড়ে চড়ে বসলেন। আদুরে গলায় বললেন; ঘুমুতে যাচ্ছি।

হাঁ।

বসো, একটু।

পাণামিন বসল।

কি লিখেছে সাক্ষির? কেমন আছে সে?

ভালোই আছে।

কবে আসবে কিছু লিখেছে?

না।

আমি ভাবছি ওকে লিখব জুন-জুলাইয়ের দিকে একবার দেশে আসতে। বাই দিস টাইম তোমার এম.এ. পরীক্ষার রেজাল্টও নিশ্চয়ই বের হয়ে যাবে। হবে না?

হ্যাঁ হবে। আগস্টেই হবার কথা।

ওড। তাই লিখব। যাও মা এখন ঘুমুতে যাও। মনে হয় অনেক রাত হয়েছে।

শারমিন উঠে দাঁড়াল এবং হঠাৎ রহমান সাহেবকে অবাক করে নিয়ে শান্ত স্বরে বলল, বাবা আমি ঠিক করেছি সাক্ষির ভাইকে বিয়ে করব না।

রহমান সাহেব পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর চেহারা বা বসে থাকার ভঙ্গিতে পরিবর্তন হলো না। চুকট নিতে গিয়েছিল, তিনি চুকট ধরালেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বললেন, এই নিয়ে আমি কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব, এখন ঘুমুতে যাও।

শারমিন নড়ল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। রহমান সাহেব শীতল কণ্ঠে বললেন, ঘুমুতে যাও শারমিন।

শারমিন ঘর ছেড়ে গেল। রহমান সাহেব সাধারণত এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন। রাত একটায় বারান্দায় হাঁটতে গিয়ে দেখেন শারমিনের ঘবেও বাতি জ্বলছে। একবার ভাবলেন, ডাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকলেন না।

ছোটবেলায় শারমিন মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বাতি জ্বালিয়ে বিছানায় বসে থাকত। তিনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতেন- ভয় পাচ্ছ মা?

হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে ঘুমুবে?

না।

মজনুর মাকে বলব তোমার ঘরে ঘুমুতে? মোঝেতে বিছানা পেতে সে ঘুমুবে।

না।

আজ্ঞা ঠিক আছে সে না হয় দরজার বাইরে ঘুমাক।

না দরকার নেই।

শারমিন অত্যন্ত জেদী। তাকে দেখে অবশিষ্ট খুব নরম ধরনের মেয়ে বলেই মনে হয়। রহমান সাহেব অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করলেন। শারমিনের ভেতর এক ধরনের দৃঢ়তা আছে, যাকে তিনি ভয় করেন। তার সঙ্গে খুলাখুলি আলাপ করতে হবে। সেজন্যে তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার খতো বাজ্ঞে ব্যাপার আর কিছুই নেই।

ভোরবেলা শারমিনকে খুব স্বাভাবিক মনে হলো। নিছের হাতে বাবার জন্যে বেড

৬ মিঃ গেলো। মার্টিকে খাবার দিয়ে বাগানে বেড়াতে গেল। তার রোজকার অভ্যাস হলো নানাশ্রমে নাশতা না দেয়া পর্যন্ত বাগানে হাঁটা। তার সঙ্গে হাঁটবে মার্টি। মার্টি হাঁটবে আবার দৌড়ে গিয়ে তার খাবার খাবে, আবার ছুটে আসবে শারমিনের কাছে।

মাশ তার টেবিলে রহমান সাহেব শারমিনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। চেহারাযে মার্টি খাবারের ক্রান্তি নেই। ভোরবেলায় গোসল করেছে। শিশু একটা ডাব এসেছে। রহমান সাহেব চা খেতে খেতে বললেন, কাল রাতে তুমি একটা প্রশ্ন করলে আমরা কি সেটা নিয়ে এখন আলাপ করব?

শারমিন মৃদু স্বরে বলল, আলাপ করার দরকার নেই।

আমি কি লিখব সাক্ষরকে আসবার জন্যে?

হ্যাঁ লেখো।

কোনো কারণে কি তোমার মন বিক্ষিপ্ত?

না।

রহমান সাহেব নিঃশব্দে চা পান পর্ব শেষ করলেন। চুরুট ধরালেন এবং এক সময় একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, চলো আমরা বরং বেড়িয়ে আসি কোনো জায়গা। যাবে?

যাবে।

কোনথায় যেতে চাও?

আমি জানি না, তুমি ঠিক করো।

নেপালে যাবে? হিমালয় কন্যা নেপাল।

যাবে।

বেশ আমি ব্যবস্থা করছি।

শারমিনরা পরের সোমবারেই সাতদিনের জন্যে নেপাল চলে গেল। বেড়াতে যাবার জন্যে সময়টা ভালো নয়। প্রচণ্ড শীত, কিন্তু তবু ঢাকা ছেড়ে বেরুতে পেরে শারমিনের ভালোই লাগল। কেমন যেন হাঁপ ধরে গিয়েছিল। নেপাল থেকে সে সুন্দর একটি চিঠি লিখল সাক্ষরকে।

শ্রদ্ধানন্দেয়,

আমরা বেশ কদিন হলো নেপালে এসেছি। চমৎকার জায়গা। আপনিও চলে আসুন। আপনি এলে আমার আরো ভালো লাগবে। কিছুদিন ধরেই আমার কেন জানি বুঝ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আপনি এলে ব্যতীত আপনার সঙ্গে গল্প করব। আপনার যত কাজই থাকুক সব ফেলে রেখে আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে। গোমড়াবুকের একফেরা আমার এডটুকুও পছন্দ নয়।

বিনীতা

শারমিন



টুনীর বয়স এখন ন'মাস।

ন'মাস বয়েছি বাচ্চারা বাবা, মা, দুদু এই জাতীয় কথা বলতে শেখে, কিন্তু টুনীর ব্যাপারটা হয়েছে এই রকম সে শুধু শিখেছে একটি শব্দ- জেজে। যাই নেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং হাড নেড়ে বলে ওঠে, জেজে।

তাকে কথা শোনানোর দায়িত্ব নিয়েছে শাহানা। শাহানার পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাজেই প্রচুর অবসর। শাহানা ঘোষণা করেছে, এক মাসের মধ্যে টুনীকে সব কথা শিখিয়ে ফেলবে।

শাহানা টুনীকে সোফার গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়েছে। টুনী তাকে লক্ষ করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শাহানা তন্ন মনোযোগ আরো ভালোভাবে আকর্ষণ করবার জন্যে কিছুক্ষণ হাত নাড়ল, তারপর বলল, বলো তো টুনী- মামা। টুনী তার দু'টি দাঁত বের করে ফিক করে হেসে ফেলল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল-জেজে।

উঁহ, জেজে নয়। বলো মামা।

জেজে, জেজে

হলো না। বোকা মেয়ে, বলো মা মা।

জে জে। জে...

মোটোও হচ্ছে না। ইচ্ছা করলেই তুমি পারবে। তোমার কত বুদ্ধি।

জে জে। জে...

হচ্ছে না।

জেজে, জেজে, জেজে।

শাহানা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। টুনী হাত বাড়িয়ে দিল। সে কোলে উঠতে চায়। দু'টি জিনিস সে খুব ভালো শিখেছে- কোল এবং ছাদ। কোলে উঠেই সে দরজার দিকে দেখাবে। দরজা খোলা মাত্র ছাদের দিকে হাত বাড়াবে।

ছাদে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে নিজের মনে হামাগুড়ি দেবে। মাঝে মাঝে একটা একা দাঁড়তে গিয়ে ধপ করে পড়ে যাবে। ব্যথা পেলোও কান্দবে না। অরাক হয়ে বলবে- জেজে, জেজে।

শাহানা, টুনীকে কোলে নিয়ে উঁচু গলায় বলল- ভাবী জন্মি শুকে একটু ছাদে নিয়ে যাবি। কেউ তার কথার কোনো জবাব দিল না। নীচু জাল্লাঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। মনোয়ারা গেছেন ডেনটিস্টের কাছে কাল রাত থেকে ছিন্নদাঁতে ব্যথা। আজ গেছেন দাঁত ফেলে আসতে।

শাহানা ছাদে উঠে গেল, রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। ছাদ ভেজা। টুনীকে নামানোর

৩৪৫ না, কিন্তু সে নেমে পড়ার জন্যে ছটফট করছে। শাহানা, আনিসের ঘরে উঁকি দিল।

আনিস তিনকোনা একটা কাঠের বাজ্রে হাতুড়ী দিয়ে পেরেক মারছিল। শাহানাকে দেখেই ছট করে বিছানার চাদর টেনে বাজ্র ঢেকে ফেলল। শাহানা অবাক হয়ে বলল—
৩৪৬ আনার কি?

আনিস বলল, আমার ম্যাজিকের বাজ্র। পাবলিককে দেখানো নিষেধ আছে।

ম্যাজিকের ব্যাপারটি অল্প কিছুদিন হলো শুরু হয়েছে। আনিস মনস্থির করেছে সে ব্যাখ্যাশিষ্ট হবে। পড়াশোনায় তার মাথা নেই। এই লাইনে কিছু করতে পারবে না।
৩৪৭ মাঝে মাঝে ম্যাজিকের লাইনে সে উন্নতি করবে।

শাদ সাহেব মহা বিরক্ত হয়েছেন। কোনো ভদ্রলোকের ছেলে ম্যাজিশিয়ান হতে পারে, এটা ভাবলেই তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। সার্কাস, ম্যাজিক এইসব হচ্ছে ফালতু লোকের কাজ। ভদ্রলোকের কাজ না। আনিসকে তিনি ঘাড় ধরেই বের করে দিতেন, কিন্তু মেয়ের জন্যে পারেননি। বীণা, আনিসকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে শুনেই বাম্পা-দাওয়া বন্ধ করে এমন একটা কাণ্ড করেছে যে তিনি রীতিমত হকচকিয়ে গেছেন।
৩৪৮ একে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছেন— প্রেম ফ্রেম নাতো? লতিফা রেগে গিয়ে বলেছেন, কি পাগলের মতো কথা বল? বুদ্ধি-তুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি তোমার? চাকর শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তোমার মেয়ে প্রেম করবে? এসব নিয়ে আর কোনোদিন কথা বলবে না।

আনিসকে কি চলে যেতে বলব?

থাক চলে যেতে বলার দরকার নেই, ওর এ বাড়িতে ঢুকা আমি বন্ধ করছি।

কিভাবে?

আমি ব্যবস্থা করব ভূমি দেখো না।

ব্যবস্থা তিনি কি করলেন ঠিক জানা গেল না। শুধু দেখা গেল আনিস একটা চেয়ারসিন কুকার কিনেছে। নিজেই রান্না এখন নিজেই রাধছে।

আনিসের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে লতিফা বেশ কিছুদিন স্থল ছুটি হবার সময়টায় স্থল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। যদি আনিসকে দেখা যায়। না, দেখা গেল না।

বীণার একটা ভালাবন্ধ স্যুটকেস আছে। চাবি জোগাড় করে গোপনে একদিন সেই স্যুটকেস খুললেন যদি চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায়। আনিসের কোনো চিঠি পাওয়া গেল না, তবে পাশা নামের একটি ছেলের কুশ্মিত ধরনের একটা চিঠি পাওয়া গেল। সেই চিঠি পাড়ে তাঁর রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড়। কি সর্বনাশ!

লতিফা চিঠির কথা কাউকে বলতে পারলেন না। এটি শুধুই এক চিঠি যা কাউকে দেখানো যায় না, কারো সঙ্গে এ নিয়ে গল্পও করা যায় না। বীণা সেই চিঠি স্যুটকেসের পকেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছে কেন কে জানে।

তুনীকে কোলে নিয়ে শাহানা কৌতূহলী হয়ে আনিসের ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা

জিনিসপত্র দেখছে। সে বলল, সবই কি আপনার ম্যাজিকের জিনিস নাকি আনিস ভাই?

হঁ।

ঐ আংটাগুলি কি?

লিংকিং রিঙ। একটা চাইনিজ ট্রিক। একটার ভেতর দিয়ে একটা ঢুকে যায়, আবার বের হয়ে আসে।

ভাই নাকি? দেখান না।

এখন দেখানো যাবে না, শ্রাকটিস নেই। পুরোপুরি ওস্তাদ না হয়ে আমি কোনো ম্যাজিক দেখাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে আসো।

না।

না, কেন?

ইচ্ছা করছে না।

প্রিজ আস। চা বানিয়ে খাওয়াব, আমার ঘরে এখন চা বানানোর সব সরঞ্জাম আছে।

চা আমি খাই না।

টুনীকে কোলে নিয়ে শাহানা নিচে নেমে গেল।

নীলু রান্না চড়াতে গিয়ে দেখল, লবণ নেই। কাজের কোনো লোক নেই। এমন মুশকিল হয় একেবারে। এখন লবণের জন্যে পাঠাতে হবে রফিককে, সে বোধহয় এখনো ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙলে সে রাগ করবে। দশটা বেজে যাচ্ছে, রফিকের যাবার সময় হয়ে এলো। আজ না খেয়েই অফিসে যেতে হবে।

নীলু উঠে এলো। রফিককে অনুরোধ-টনুরোধ করে পাঠাতে হবে, এছাড়া উপায় নেই।

রফিকের ঘরের সামনে এসে নীলু থমকে দাঁড়ায়। দরজায় নোটিশ ঝুলছে- রাত তিনটা দশ মিনিটে ঘুমাতে যাচ্ছি। কেউ যেন সকাল এগারোটার আগে না ডাকে। ডাকলে বুনাখুনি হয়ে যাবে।

উপায় নেই। নীলু দরজায় ধাক্কা দিল। রফিক চৈঁচিয়ে উঠল, কে?

আমি।

ভাবী তুমি অন্ধ নাকি? নোটিশ দেখছ না?

দেখছি। উপায় নেই আমার, প্রিজ উঠে আসো।

কি করতে হবে?

লবণ এনে দিতে হবে। রান্না চড়াতে পারছি না।

রফিক অত্যন্ত বিরক্ত মুখে দরজা খুলল। বিড়বিড় করে বলল- ভোর রাতে তোমাকে রান্না চড়াতে হয় কেন বলো তো? তোমাদের যন্ত্রণার শাস্তিতে একটু ঘুমাবার উপায় নেই।

রফিকের দাড়ি অনেকখানি বড় হয়েছে। তাকে বিড়িতে এখন ভালোই লাগছে। স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে একটু ভালো হয়েছে। পদ্মশোভার আমেলা চুকেছে এই শান্তিতেই বোধ হয়।

এম.এ. পরীক্ষায় রফিকের রেজাল্ট বেশ ভালো হয়েছে। সেকেন্ড ক্লাস থার্ড। সে

... গ্রাম আশা করেছিল, তবে নিচের দিকে। রেজাল্ট বের হবার পর অন্যদের ... নিজে বেশি অবাক হয়েছে। নীলুকে বলেছে, আরেকটু খাটাখাটনি করলে ... দিতে পারতাম ভাবী। কি পারতাম না?

হ্যাঁ, তা তো পারতেই।

যদি যে একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র তা আগে বুঝতে পারিনি। আগে বুঝতে পারলে ... পড়তাম। আর তো পড়ার স্কোপ নাই। শেষ পরীক্ষাটাও দিয়ে দিলাম।

বিএসএস-এর জন্য পড়ো। বিসিএস দাও।

বিএসএস আমার হবে না ভাবী। ভাইভাতে আউট করে দেবে।

কেন?

বিএসএস-এ চেহারা-টেহারা দেখে। আমার তো সেই দিক দিয়ে জিরো। শর্ট। ... চাহিনি। তাও দাড়িটা থাকায় রক্ষা।

তোমার কি ধারণা দাড়ি রাখায় তোমাকে খুব হ্যান্ডসাম লাগছে?

হ্যান্ডসাম না লাগলেও ইন্টেলিজেন্ট লাগছে। চেহারায় এটা শার্পনেস চলে এসেছে।

কি আসে নাই? একটা অনেস্ট অপিনিয়ন দাও তো ভাবী।

... করির চেষ্টা সে বেশ করেছে। তিনটি ইন্টারভিউ দিয়েছে এ পর্যন্ত। একটা সিলেট ... বাগানে, বাকি দুটি ব্যাক্তে। চা বাগানে ইন্টারভিউ খুব ভালো হয়েছিল। রফিকের ধারণা ... সেখানেই হবে। হয়নি। ব্যাক্তের ইন্টারভিউ ভালো হয়নি। তাকে জিজ্ঞেস করেছে, ... দেশের আয়তন কত? সে বলতে পারেনি। ইন্টারভিউ বোর্ডের এক ভদ্রলোক ... এম.এ. পাস করেছেন আর বাংলাদেশের আয়তন কত এটা জ্ঞানেন না? ... লীগের ছয় দফা কি কি বলতে পারবেন। এটাতেও সে গুগগোল করে ফেলল। ... বিরক্ত হয়ে বললেন, ইন্টারভিউ বোর্ড একটু প্রিপার্ড হয়ে ফেস করবেন। ... শোনা করে তারপর আসবেন।

রফিক এরপর অবশিষ্ট আটঘাট বেঁধে নেমেছে। জেনারেল নলেজের বই কিনে ... তিনটি। নোট করছে, পড়ছে। উৎসাহের সীমা নেই।

সফিক অফিসের কাপড় পরে খাবার ঘরে আসতেই নীলু লজ্জিত মুখে বলল, আজ ... শেষ হয়নি এখনো। সফিক কিছু বলল না। কিন্তু তার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে সে ... বিরক্ত।

লবণ ছিল না। রফিক লবণ আনতে গিয়ে অনেকখানি দেরি করল। ঘুমি আজ ... নিতে খেয়ে নিও।

ঠিক আছে।

নীলু ইতস্তত করে বলল, আর ঐ চায়ের দাওয়াতের কথাটা মনে আছে?

কোন দাওয়াত?

ঐ যে আমার বন্ধু বন্যা চায়ের দাওয়াত দিয়েছে আমাদের দুজনকে। ওদের ম্যারেজ ... নিভারি। রাতে তোমাকে বলেছিলাম।

কটার সময় যাবার কথা?

চারটায়।

ঐ সময় তো আমি থাকব টব্বী। হুটা পর্যন্ত ফিল্ডে কাজ।

একদিন না গেলে হয় না?

আরে না। না গেলে হবে কেন?

আমি একাই যাব?

যদি যেতেই হয় একা যাও। কিংবা রফিককে বলো পৌছে দেবে।

নীলু কিছু বলল না। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল সফিক হয়তো যেতে রাজি হবে। অনেকদিন তারা একসঙ্গে কোথাও যায় না। রাতে দাওয়াতের কথা শুনে হাই তুলে বলেছিল, আচ্ছা দেখি। তার মানে যাওয়া যেতে পারে। এখন মনে হচ্ছে দেবির মানে-সস্তব না। নীলু ঘরের কাজ শেষ করতে লাগল। একাই যাবে সে। এবং ফিরবে সন্ধ্যা পার করে। এমন দেরি করবে যাতে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়।

মনোয়ারা দাঁত দেখাতে সেই সকালে গিয়েছেন এখনো ফেরেননি। এটাও একটা চিন্তার ব্যাপার। কোনো ঝামেলা হয়েছে কিনা কে জানে। এত দেরি হবারতো কথা নয়।

নীলু রান্না শেষ করে ময়লা কাপড় ধুতে ঢুকল বাথরুমে। যেদিনই সে কাপড় ডেজায় সেদিনই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। শাওড়ি চোঁচামেচি করতে থাকেন, দিনরুণ দেখে কাপড় ভিজাতে পার না। একি বিশ্রী অভ্যাস তোমার বৌমা, বৃষ্টি বাদলা ছাড়া তুমি কাপড় ধুতে পারো না। এক কথা কত বার করে বলব তোমাকে?

আজ অবশ্যি বৃষ্টি হবে না, কড়া রোদ উঠেছে। ঘণ্টা দু'এক এরকম থাকলে সব কাপড় শুকিয়ে ঝটখট হয়ে যাবে।

বালতিতে ভেজা কাপড় নিয়ে নীলু ছাদে গেল। আনিস ছাদে হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট টানছিল। নীলুকে আসতে দেখেই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল। নীলু বলল, জাদুকরের খবর কি?

কোনো খবর নেই ভাবী। রান্না চড়িয়েছি।

কি রান্না আজ?

ভাত আর ডিম ভাজা।

রোজ রোজ ডিম ভাজা খেতে অরুচি লাগে না?

না। কাপড় আমার কাছে দিন ভাবী, আমি মেলে দিচ্ছি।

তোমার মেলতে হবে না। এটা মেয়েদের কাজ।

মেয়েদের কাজ বলে আলাদা কিছু আছে?

আছে। এখনো আছে। তোমার ম্যাজিক কেমন চলছে?

ভালোই চলছে ভাবী। এখন পামিং শিখছি।

কি শিখছ?

পামিং। অর্থাৎ হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখার কৌশল।

এইসব কৌশল আমরা কবে দেখতে পাব?

খুব শিগগিরই পাবেন।

পিসি সরকার হচ্ছ তাহলে?

হ্যাঁ ভাবী। আপনি হাসছেন- আমি কিন্তু সত্যি সত্যি হব।

নিশ্চয়ই হবে। হবে না কেন? সেদিন আমরা সবাইকে বলব জাদুকর আনিস
আমরা ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। তিনি আমাদের দোতলার চিলেকোঠায়
থাকতেন।

আপনি মনে মনে হাসছেন।

তাই হাসছি না?

অফিসের অফিস মতিঝিলে-বিটা ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড ইনসেকটিসাইড।
আমাদের একটা অশুভ তৈরির কারখানা। মূল কারখানাটি তেজগাঁয় এখন সেটি
খালি বাড়ানো হচ্ছে। টঙ্গীতে নতুন একটি কারখানা হচ্ছে।

বিদেশি কোম্পানিগুলোতে যেমন সাহেবী কায়দা কানুন থাকে, এখানে সে রকম
নয়। দেশীয় অফিসগুলির মতোই টিলাঢালা ভাব, স্যুরেনসেন হচ্ছে একমাত্র বিদেশি।
বাংলাদেশে কোম্পানির বড় কর্তা। স্যুরেনসেনের বাড়ি নরওয়েতে, পড়াশোনা করেছে
ফ্রান্সে। ইংরেজি ভালো বলতে পারে না।

বিদেশিদের সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে এরা অত্যন্ত কর্মঠ। সময়
সম্পর্কে সচেতন। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না- ইত্যাদি। স্যুরেনসেনের সঙ্গে তার
কোনোটাই মিলে না। লোকটি মহাফাঁকিবাজ। কাজ কিছুই বোঝে না। অকারণে চোঁচায়।

সফিক অফিসে ঢুকেই শুনে সাহেব খুব রেগে আছে। সবাইকে বকাবকি করেছে।
গাফিলত অবাক হয়ে বলল- কেন?

কে জানে কেন? কয়েকবার আপনার খোঁজ করেছে। যান স্যার, দেখা করে
খাসেন।

সফিক ঘরে ঢুকতেই সাহেব চোঁচিয়ে উঠল, কি ব্যাপার সফিক এত দেরি কেন?
দেরি না, তুমিই চলে এসেছ সকাল সকাল। মনে হচ্ছে তুমি কোনো কারণে
আপসেট।

আপসেট হব না। তুমি পড়ে দেখো হল্যান্ডের হোম অফিস থেকে কি লিখেছে।
কি লিখেছে?

আহ পড়তে বলছি পড়ো। জিজ্ঞেস করছ কেন?

এমন মেজাজ খারাপ করার মতো কোনো চিঠি নয়। হেড অফিস জানতে চেয়েছে
লট নং ৩৭২-এর স্যাম্পল কেন এখনো পাঠানো হয়নি। র‍্যানডম স্যাম্পলিং করা হচ্ছে
না এবং আনুষঙ্গিক অন্য কাজও আটকে আছে কাজেই...।

সফিক বলল, স্যাম্পল যথাসময়ে পাঠানো হয়েছে। শিপমেন্টের ব্যয়সাধ্য হয়তো
পৌছেনি। এই নিয়ে আপসেট হওয়ার কিছুই নেই।

পাঠানো হয়েছে?

নিশ্চয়ই পাঠানো হয়েছে। কাগজপত্র এনে দেখাচ্ছি তোমাকে।

দেখানোর দরকার নেই। তুমি একটা চিঠি পাঠাবতে ব্যবস্থা করো। চিঠিতে লেখা
থাকবে এত তারিখে স্যাম্পল শিপমেন্ট করা হয়েছে। তোমরা যদি না পাও আমাদের
প্রবিলম্বে জানাও।

ঠিক আছে।

চিঠি না। একটা টেলিগ্র করে দাও।

টেলিগ্রই করব।

স্যুরেনসেন মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অমায়িক গলায় বলল- কফি খাবে নাকি?

না, কফি খাব না।

টঙ্গীর কাজ কেমন এগুচ্ছে?

ভালোই এগুচ্ছে।

খুব লক্ষ রাখবে তোমাদের দেশের লোক কিছু সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে।

সফিক কিছু বলল না। সাহেব গম্ভীর গলায় বলল, আমার কমেট শুনে আবার মন খারাপ করেনি তো?

না।

ওড। শোনো সফিক আজ আমি একটু সকাল সকাল ঘরে ফিরব। কাজেই আমাকে দিয়ে কোনো সইটই করাবার থাকলে করিয়ে নিও।

ঠিক আছে। আমি তাহলে যাই এখন।

যাও।

সফিক তার নিজের ঘরে ঢুকল। তার পদ হচ্ছে ম্যানেজারের। ম্যানেজার, এডমিনিস্ট্রেশন। তবে সে গত ছ'মাস ধরে জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছে। আগের জেনারেল ম্যানেজার ইংল্যান্ডের মি. রেভার্স টনির সঙ্গে বড়কর্তার খিটিমিটি চলছিল বহুদিন থেকে। গত ত্রিসমাসে সেই খিটিমিটি চরমে উঠেছে এবং রেভার্স সাহেব একদিন অফিসে এসে বড় সাহেবকে যে কথাগুলি বলল তার বাংলা অর্থ হচ্ছে, তোমার অফিস এবং কারখানা তুমি তোমার পশ্চাৎদেশে প্রবেশ করিয়ে বসে থাক আমি চললাম। সাহেবরাও নোংরা কথা আমাদের মতোই শুছিয়ে বলতে পারে।

বড় সাহেব এক সপ্তাহ গম্ভীর হয়ে রইল। প্রতি সন্ধ্যায় সাত-আট পেগ হুইকি খেয়ে পুরোপুরি আউট হবার চেষ্টা করতে লাগল। সেটা সম্ভব হলো না। গ্যালকোহল তাঁকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। এক সপ্তাহ পর জেনারেল ম্যানেজার হারানোর দুঃখ তার অনেকটা কমে এলো। সে সফিককে ডেকে বলল, তুমি জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে নাও। আমি দশদিনের মধ্যে হেড অফিস থেকে অর্ডার আনিয়ে দিচ্ছি। ব্রিটিশগুলি হচ্ছে মহা হারামজানা। টনি, কোম্পানিটার বারোটি বাজিয়ে দিয়ে গেছে। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সব ঠিকঠাক করা।

দশদিনের মধ্যে অর্ডার আসার কথা। ছ'মাস হয়ে গেছে অর্ডারের কোনো খোঁজ নেই। যখনই কোনোরকম ঝামেলা উপস্থিত হয় বড় সাহেব সফিককে ডেকে বলে, ব্যাপারটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ট্যাকল করো সফিক, আমি হেড অফিসে টেলিগ্র করছি। কেন তারা তোমাকে এখনো কনফার্ম করছে না? এরা পেয়েছেটা কি? এভাবে কোনো আন্তর্জাতিক কোম্পানি চলে, না চলা উচিত?

খাম্বাসে সফিকের অবস্থা একটু অস্বস্তিকর। সিদ্দিক সাহেব হচ্ছেন তার দু'বছরের বিনিময়। আগে ছিলেন প্রডাকশন ম্যানেজার বছরখানেক আগে তাঁকে ঢাকা হেড অফিসে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাঁকে ডিঙিয়ে জেনারেল ম্যানেজার হওয়াটা তিনি কখনো দেখছেন না। সফিকের বিরুদ্ধে বেশ জোরালো একটি দলও তাঁর আছে। তাঁর জাতিগত আচরণে সেটা কখনো বোঝা যায় না। সিদ্দিক সাহেব অত্যন্ত মিষ্টিভাষী জ্ঞানোক্ত। সবার সঙ্গেই প্রচুর রসিকতা করেন।

খাম্বাক তার ঘরে বসামাত্রই সিদ্দিক সাহেব ঢুকলেন। এবং তাঁর স্বভাব মত বললেন, জাফর! জি এম সাহেব, হোয়াট ইজ নিউ? সাহেবকে ঠাণ্ডা করেছেন?

ঠ। এখন ঠাণ্ডা।

আসলে এই কোম্পানিতে একটা পোস্ট ব্রিন্কেট করা দরকার, যে পোস্টের কাজই আগে সাহেবকে ঠাণ্ডা রাখা।

সফিক কিছু বলল না। সিদ্দিক সাহেব বললেন, আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে।

দুঃসংবাদটা দিতে এলাম।

কি দুঃসংবাদ?

হিস্টোরিলিনের একটা নতুন ব্যাচের কাজ শুরু হয়েছে। প্রডাকশন ম্যানেজার জানিয়েছেন এই ব্যাচটা নষ্ট হয়েছে। প্রায় এক লাখ টাকা নর্দমায় ফেলা হলো।

সিদ্দিক সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। যেন তাঁর কিছুই যায়-আসে না। সফিক উদ্ভিগ্ন স্বরে বলল, ব্যাচ বাতিল করা হয়ে গেছে?

না, এখনো হয়নি। তবে বাতিল করা ছাড়া উপায় নেই। ইমালসিফায়ার নেই। কাজ এখন শুরু করা হলো তখন জানা গেল ইমালসিফায়ার নেই।

সেকি? আগে জানা যায়নি?

স্টোর বলেছিল আছে। সেই ভরসাতেই শুরু করা হয়েছিল। মাঝপথে বলা হলো নেই। সফিক উঠে দাঁড়াল। সিদ্দিক সাহেব বললেন, যাচ্ছেন কোথায়?

ভেজগাঁয়ে যাই।

সেখানে গিয়ে করবেন কি?

খোঁজ নেই কি হচ্ছে। অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা দেখি।

কোথায় পাবেন? আর পেলেও সেটা ব্যবহার করা যাবে না। কোম্পানির দেয়া মিশ্র জিনিস ব্যবহার করতে হবে। রেগুলেশন নাথার সিক্সটিন। কাজেই শান্ত হয়ে এখন। চায়ের অর্ডার দিন। প্রডাকশন ম্যানেজার, স্টোর ইনচার্জ এবং চিফ কেমিস্টকে ডেকে পাঠান। লিখিত রিপোর্ট দিতে বলুন। হেড অফিসে ফোন পঠান।

সফিক কপালের ঘাম মুছল। হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে। সিদ্দিক সাহেব বললেন, আপনার টেলিফোন করবার দরকার নেই, আমি ইতিমধ্যেই টেলিফোন করেছি। এবং ওরা খুব সম্ভব রওনাও হয়ে গেছে।

বড় সাহেবকে খবর দেয়া দরকার।

সিদ্দিক সাহেব অলস ভঙ্গিতে বললেন- তা দরকার। তবে এখন খবর না দেয়াই ভালো। বড় সাহেব ব্যস্ত আছেন। ডিকটেশন দেবার জন্যে মিস রীতাকে ডেকেছেন।

সিদ্দিক সাহেব মুচকি হাসলেন। বড় সাহেব মাঝেমধ্যেই ডিকটেশন দেবার জন্যে মিস রীতাকে ডেকে নেন নিজের কামরায়। তখন দরজা বন্ধ থাকে। এবং কিছুক্ষণ পর মিস রীতার খিলখিল হাসি শোনা যায়।

মিস রীতা গোমেজ এখনকার রিসিপশনিষ্ট। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হলেও এখনো চমৎকার শরীরের বাঁধনী। চেহারায় শ্রদ্ধ ভাব আছে। খুবই আমুদী মেয়ে। বড় সাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে এরকম একটা গুজব অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে।

সফিকের দিন শুরু হল খুবই খারাপভাবে। বড় সাহেবের সঙ্গে কোন কথা হল না। তিনি জানিয়ে দিলেন আজ অত্যন্ত ব্যস্ত অফিসের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে চান না। দুপুরবেলা সফিক রাজশাহী থেকে শাওড়ির একটি চিঠি পেল। তাকেই লেখা।

“বিলুর একটি ছেলে হইয়াছে গত বুধবারে রাত আটটায়। ছেলে ভালো আছে। কিন্তু বিলুর অবস্থা খুবই খারাপ। তাহাকে রাজশাহী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। বেশ কয়েকবার রক্ত দেওয়া হইয়াছে। আমি কি করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জামাই ফরিদপুরে। তাহারও কোনো খোজ নাই। বাবা, তুমি কি নীলুকে সঙ্গে নিয়া একবার আসিবে? আমার মন বলিতেছে বিলুর দিন ফুরাইয়াছে...”

বিরাট চিঠি। সফিক চিঠি হাতে দীর্ঘ সময় চেয়ারে বসে রইল। নীলুকে আজ রাতের কোচেই পাঠানো দরকার। সঙ্গে কিছু টাকা-পয়সাও দিয়ে দেয়া দরকার। টাকার জোগাড় করা যায় কিভাবে?

বন্যার বাসা খুঁজে বের করতে বেশি ঝামেলা হয় না। সুন্দর ছিয়ছাম ওয়ান বেডরুম এ্যাপার্টমেন্ট। বসার ঘরে বেতের সোফা। দেয়ালে জলরঙ ছবি। মুগ্ধ হবার মতো সাজসজ্জা। নীলু মুগ্ধ হয়ে গেল।

সুন্দর সাজিয়েছিস বন্যা।

আমি সাজাইনি। ও সাজিয়েছে। এসব দিকে আমার ঝাঁক নেই।

আর সব গেট কোথায়?

তোকে এবং তোর বরকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি। তাও তুই এলি একলা। এটা ভালোই হলো। আমার বরের সঙ্গেও আমার ঝগড়া হয়েছে। ও সকালবেলা ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমরা দুজনে মিলে গল্প করব। রাতে ভাত খেয়ে তারপর ঘাবি।

ঝগড়াটা হয়েছে কি নিয়ে?

রেগুলার ফিচার। পার্সোনিলাটি ক্ল্যাস। ও চায় আমার বাক্সাক্ষা হোক। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি ঘর সংসার করি।

তুই বাক্সাক্ষা চাস না?

এখন চাই না। ও চাইলেই আমাকে বাক্সা পেতে শুরুতে হবে নাকি? পুরুষদের কথামত সারা জীবন চলব আমরা? আমাদের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি।

তুই এত রোগে ঘাবুঁস কেন?

নাগনা না কেন? নিশ্চয়ই রাগব। মেয়ে হয়েছি বলে কি আমরা মানুষ না? বাদ দে
কথা বল। বরকে নিয়ে এলি না কেন?

না না যেন কাজ পড়েছে। টঙ্গী যেতে হবে।

না তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস? তোকে বুঝ দেয়াব জন্যে বলা। কাজটাজ
না। স্বাধীনতার কারণে কিছু করবে না, এটা হচ্ছে পুরুষদের মতো। গুদের আমি হাড়ে
না।

না পুরুষ জাতিটার উপর তুই রেগে আছিস।

তা আছি। তুই বোস, চা বানিয়ে আনি। রাতে কি খাবি বল?

রাতে কিছু খাব না। একা একা এত দূর যেতে পারব না।

না যেতে হবে না, আমি পৌছে দিয়ে আসব।

করবে না তোর?

আমার এত ভয়টয় নেই।

পূর্ণ সাহস তোর?

হ্যাঁ, খুব। একজন পুরুষ যদি রাত দশটার হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারে তাহলে
কোন মেয়েও পারে।

আজ এত সাহস দেখানোর দরকার নেই।

বাসায় ফিরতে ফিরতে নীলুর সন্ধ্যা হয়ে গেল। বন্যা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল নীলু
হয়নি। বন্যার স্বামী জ্বর সাহেব চলে এসেছেন ততক্ষণে। বন্যা তাকেই
বলল—তুমি নীলুকে পৌছে দাও না। বেচারি একা একা যেতে ভয় পায়। একটা
গোটাগি নিয়ে চলে যাও। কি সর্বনাশের কথা! অচেনা পুরুষ মানুষের সঙ্গে সে বাসায়
ফিরবে? নীলু আঁককে উঠে বলেছে, কিছু লাগবে না, আমি চলে যেতে পারব।

ঠিক তো?

ই, ঠিক।

ভয় পাবিনে তো?

না।

নীলু ভয় পায়নি। তার মতো একা একা অনেক মেয়েই যাচ্ছে। তাছাড়া মাত্র সন্ধ্যা
হয়েছে। বাসার কাছাকাছি এসে মনে হলো সফিক খুব রাগ করবে। শুধু সফিক না, তার
শাওড়ও রাগ করবেন। আর শাওড়ের রাগ মানেই হচ্ছে—ভূমিকম্প। কি যে অসহ্য হবে
কেন?

কিছু আশ্চর্য কেউ কিছু বলল না। সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরা যেন তেমন কোনো
অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সফিক বলল, তাড়াতাড়ি একটু গোসল করে নাও নীলু, নাইট
কোচে রাজশাহী যাবে। তোমার বোনের শরীর ভালো লাগে? নীলু আতঙ্কিত হয়ে বলল,
মারা গেছে?

না, না। চিঠি পড়ে দেখো। অবস্থা ভালো না, তবে বেঁচে আছেন। তুমি তাড়াতাড়ি
গেডি হয়ে নাও, রফিক তোমার সঙ্গে যাবে।

টুনী, টুনী?

টুনী থাকবে এখানেই। অসুবিধা হবে না। তুমি যাও।

বিলু আপা বেঁচে আছে তো?

বললাম না ভালোই আছেন। চিঠিটা পড়ে দেখো, চিঠিতেই সব লেখা আছে।
তেন খারাপ হলে টেলিগ্রামই আসত। আসত না?

সফিকের কথা সত্যি না। বিকাল পাঁচটায় বিলুর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এনেছে। নীলুকে মৃত্যু সংবাদ দেয়া হবে কি হবে না, এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সফিক খবরটা দিতেই চেয়েছিল। তার মতে খবর না দিলে সে বোনের সঙ্গে দেখা হবার আশা নিয়ে যাবে এবং যখন দেখবে বোন বেঁচে নেই তখন অনেক বড় শক পাবে। সফিকের যুক্তি অন্যদের ভালো লাগেনি।

নীলু চলে যাবার পর সফিকের মনে হলো কাজটা ঠিক হলো না। তার সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। সে চলে গেলে বিটা ফার্মোসিটিক্যালস-এর সব কাজ আটকে থাকবে এই ধারণাটা ঠিক না। কারো জনোই কিছু আটকে থাকে না। স্ত্রীর দুঃসময়ে স্বামী পাশে এসে না দাঁড়ানোটা দুঃখজনক। যে কোনো স্ত্রী এইটুকু তার স্বামীর কাছ থেকে আশা করতে পারে। এবং আশা করা উচিত।

মনোয়ারা রাতে খাবার সময় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, বউটা না থাকায় বাড়ি খালি খালি লাগছে। বড় খারাপ লাগছে বউমার জন্যে। এটা তাঁর কথার কথা নয়, তিনি ঠিকমত খেতে পারলেন না। আধ খাওয়া প্রেট ঠেলে সরিয়ে উঠে পড়লেন। রাতে শেবার সময় হোসেন সাহেবকে বললেন, তোমার ছেলের এমনই রাজকার্য পড়ে গেছে বউটার সঙ্গে যেতে পারল না। যত অপদার্থ আমি পেটে ধরেছি। এই অপদার্থগুলির কপালে দুঃখ আছে।

হোসেন সাহেব স্তব্ধ কণ্ঠে বললেন, তুমি সফিককে বললে না কেন সঙ্গে যেতে?

কেন আমি বলব? এটা সে নিজে কেন বুঝে না। দুটা পয়সা রোজগার করে সে কি

ভেবেছে? সবার মাথা কিনে নিয়েছে? লাট সাহেব হয়ে গেছে?



এয়ারপোর্টে সাক্ষিরকে রিসিভ করবার জন্যে শারমিন এসেছে। রহমান সাহেবের সঙ্গে আসার কথা, শেষ মুহূর্তে তিনি মত বদলানলেন, তুমি একাই যাও মা। ড্রাইভারকে বলে দাও একটা ফুলের তোড়া নিয়ে আসতে। সাক্ষির পছন্দ করবে।

ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করতে শারমিনের লজ্জা করছিল। ফুলটুল নিয়ে আর কেউ আসেনি। সে একাই এসেছে। অনেকেই ষড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। কি ডাবছে, তারা মনে মনে কে জানে।

একদিন সময়ে পুনে আসার কথা, সেটা এলো এগারোটায়। কস্টমস সেরে বেরুতে
কেন্দ্র সাফারের দুটোর মতো বেজে গেল। সাক্ষিরের স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে।
সাক্ষিরের দেশ থেকে আসছে বলেই বোধহয় লালচে ভাব গালে। মাথা ভর্তি চুল
সাক্ষিরের হয়ে আছে। তার আচার-আচরণে একটা ছটকটে ভাব আছে। শারমিনকে
সাক্ষিরের কাছেই হলো সাক্ষির অত্যন্ত সুপুরুষ। এরকম সুপুরুষদের পাশে দাঁড়াতে
সাক্ষিরের ভালো লাগে।

শারমিন হাসি মুখে বলল, এই নিন আপনার ফুল।

সাক্ষির, ফুল কি জন্যে?

শারমিন পর দেশে ফিরছেন তাই।

শারমিন ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল, আমার দেশের বাড়ি থেকে
কি আসেনি? কাউকে তো দেখছি না। চিঠি দিয়েছি, টেলিগ্রাম করেছি, হোয়াট ইজ
নাম?

শারমিন কিছু বলল না। সাক্ষিরের দেশের বাড়ির কারোর সঙ্গে তার পরিচয় নেই।
শারমিন বাড়িতে সাক্ষিরের তেমন কেউ নেইও। এক চাচা আছেন যিনি তাকে পড়াশোনা
শারমিনের। বড় এক বোন আছেন, জামালপুরে তার সঙ্গে শারমিনের কয়েকবার দেখা
হয়। সে এয়ারপোর্টে আসেনি। এলে দেখা হতো।

সাক্ষির বলল— মা আসেননি?

না। উনি ঢাকায় নেই।

কোথায়?

জামালপুরে মেয়ের কাছে আছেন।

জামালপুরে কবে গেলেন আমি তো কিছু জানি না।

গত মাসে গিয়েছেন।

সাক্ষির অত্যন্ত বিরক্ত হলো। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তুমি দাঁড়াওতো এখানে। আমি
কি দেখি। আছে হয়ত কেউ। এতদিন পর আসছি, কেউ আসবে না?

সাক্ষির ঝুঁজতে গিয়ে আধ ঘণ্টার মতো দেরি করল। ফিরে এলো মুখ কালো করে।
কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না। শারমিন বলল, চলুন যাওয়া যাক।

কোথায় যাব?

আমাদের বাসায়, আর কোথায়?

না, প্রথম যাব ঝিকাতলা। মা কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে আসি।

সাক্ষিরের মাকে পাওয়া গেল না। তার ছোট মামার কাছে গেলো তিনি
জামালপুরে। ছোট মামা সাক্ষিরের প্রসঙ্গে কোনো রকম উদ্ধাস্ত প্রকাশ করলেন না।

সাক্ষির বলল, আমি আসব আপনি জানতেন না?

জানতাম।

আমিতো আশা করেছিলাম এয়ারপোর্টে আপনাকে দেখব।

ছোট মামা মুখ কালো করে বললেন, সাক্ষিরের যত্নগায় অস্থির। ছোট মেয়ের
ভায়রিয়। মহাখালি নিয়ে গিয়েছিলাম। তুই হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খা।

সাক্ষির সেসব কিছুই করল না। বিরক্ত মুখে বের হয়ে এলো। শারমিন বলল, এবার কি যাবেন আমার সঙ্গে?

হঁ, যাব। তোমাদের ওখানে চা খেয়ে রওনা হব জামালপুর। জামালপুর যাবার ভালো বুঝি কি?

ট্রেনে করে যেতে পারেন। বাই রোডে যেতে চাইলে আমাদের একটা গাড়ি নিয়ে রওনা হতে পারেন। আজই যেতে হবে?

হঁ, আজই।

আপনি এমন ছটফট করছেন কেন?

কিছু ভালো লাগছে না।

কেন?

জানি না, কেন।

শারমিন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, বাংলাদেশ কেমন লাগছে?

বাংলাদেশ দেখলাম কোথায়?

রাস্তাঘাট তো দেখছেন। কত বড় বড় রাস্তা হয়েছে দেখেছেন?

সাক্ষির তার জবাব না দিয়ে মুখ গোমড়া করে বসে রইল। শারমিন বলল, আপনার শরীর ভালো তো?

হ্যাঁ, ভালোই।

কতদিন থাকবেন?

বেশি দিন না। এক সপ্তাহ।

হঠাৎ এমন ছুট করে চলে এলেন যে? আপনার তো কথা ছিল আগস্ট মাসে আসার।

এখানে কি যেন একটা ঝামেলা হচ্ছে, সেটা জানার জন্যে এসেছি।

কি ঝামেলা?

সাক্ষির বিরক্ত স্বরে বলল, দু'শ ডলার করে মাকে প্রতি মাসে পাঠাই। তাঁর একার জন্যে যথেষ্ট টাকা কিন্তু তারপরেও গত মাসে একটা চিঠি পেলাম যার থেকে ধারণা হয় যে, তাঁর টাকা-পয়সার খুব টানাটানি। এর মানে কি? টাকাগুলি যাচ্ছে কোথায়?

এটা জানার জন্যে একেবারে আমেরিকা থেকে চলে এলেন?

তথু এটা না। মা'র শরীর খারাপ। মনে হয় ঠিকমত চিকিৎসাও হচ্ছে না। সেটাও দেখব।

রহমান সাহেব সাক্ষিরকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। প্রথম যেদিন দেখেছিলেন সেদিনই তাঁর তাকে ভালো লেগেছিল। সেই ভালো লাগা পরবর্তী সাত বছরে ক্রমেই বেড়েছে। তাদের প্রথম পরিচয় পর্বটি বেশ নাটকীয়।

রহমান সাহেব সবে অফিসে এসে বসেছেন। তাঁর সেক্রেটারি বলল, একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘণ্টাখানিক ধরে বসে আছে।

কি চায়?

আমাকে বলছে না।

রহমান সাহেব ছেলেটিকে আসতে বললেন। নিশ্চয়ই চাকরি প্রার্থী। প্রতিদিনই বেশ কিছু এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।

বাহার খুদর্শন একটি ছেলে ঢুকল। এবং সে কোনো রকম ভণিতা না করে বলল,
আমি সাক্ষির আহমেদ। আমি এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্টেটিসটিক্স-এ
ডিগ্রি পাশ করেছি। আপনি কি দয়া করে আমার মার্কশিটটা দেখবেন।

কোনো চাকরির ব্যাপার?

জি না, কোনো চাকরির ব্যাপার নয়।

ব্যাপারটা কি?

আপনি আগে দেখুন। তারপর বলব।

রহমান সাহেব দেখলেন। অনার্স এবং এম. এ. দু'টিতেই প্রথম শ্রেণী।

আপনার তো চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

না, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি অন্য ব্যাপারে এসেছি।

কণুন, তনি।

আমি আমেরিকান একটি ইউনিভার্সিটি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব আই-ওয়াতে টিচিং
অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পেয়েছি। সেখানে আভার হাজুয়েট ক্লাসে পড়াব সেই টাকায় পি.এইচ.

ডিগ্রি পাব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমি অত্যন্ত দরিদ্র। আমার আত্মীয়স্বজনরাও দরিদ্র।

আমাদের কায় যাবার জন্যে আমার ত্রিশ হাজার টাকার মতো দরকার।

আপনি চান্নেন এই টাকাটা আমি আপনাকে দিয়ে সাহায্য করি।

দার হিসেবে চান্নি।

এত লোক থাকতে আমার কাছে এসেছেন কেন?

তথু আপনার কাছে নয়, আরো অনেকের কাছেই গিয়েছি। আমি একুশজন
ইন্সটিটিউশনের একটি লিষ্ট করেছি। ঠিক করেছি এদের সবার কাছেই যাব।

লিষ্টটা দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই পারেন।

সাক্ষির লিষ্ট বের করে দিল।

আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির চিঠিটি সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ আছে। রেজিস্ট্রারের চিঠি।

রহমান সাহেব চিঠিটা মন দিয়ে পড়লেন। শান্ত স্বরে বললেন, ওরা আই টুয়েন্টি
পাঠিয়েছে?

জি, পাঠিয়েছে।

ভিসা হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

পাসপোর্টটা দেখাতে পারেন?

পারি।

সাক্ষির পাসপোর্ট বের করল। মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা। রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে
বললেন, টিকেটের টাকা জোগাড় না করেই ভিসা করেছেন?

হ্যাঁ করেছি। কারণ টাকার ব্যবস্থা হবেই।

রহমান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, কাশ খেব না চেক কেটে দেব?

কাশ হলে ভালো হয়।

তিনি ক্যাশিয়ারকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে বললেন। সাক্ষিঃ
বিন্দুমাত্র উচ্চাস দেখান না। যেন এটা তার প্রাপ্য। রহমান সাহেব তাকে বাড়তি কোনো
ফেভার করছেন না।

আমেরিকা যাবার আগে সে দেখা করতে পর্যন্ত এলো না। ছ'মাস পর ইউ এস
ডলারে সাক্ষির টাকাটা শোধ করল। সেই সঙ্গে চমৎকার একটি চিঠিও লিখল।

শ্রদ্ধাশ্রবণে,

বড়লোকদের প্রতি আমার এক ধরনের ঘৃণা আছে। সারাজীবন
অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম বলেই হয়তো। এখন বুঝতে পারছি ধনী সম্প্রদায়ের
মধ্যেও তালো মানুষ আছেন। আপনার অনুগ্রহের কথা আমি মনে রাখব।
টাকটা পাঠানোর আগে আমি আপনাকে লিখিনি কারণ আমি এক ধরনের
হীনমন্যতার ভুগছিলাম। আশা করি, আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে
পারছেন।

বিনীত

সাক্ষির

দু'বছরের মাথায় সাক্ষির দেশে এলো। রহমান সাহেবের জন্যে প্রচুর উপহার নিয়ে
এলো। সাক্ষিরের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো তখন। পি.এইচ.ডি. শেষ
করে আবার সে দেশে এলো। শারমিনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হলো সেই সময়।
শারমিন তখন মাত্র কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে।

দুপুরের ঝাওয়া সারতে সারতে দুটা বেজে গেল। ঝাঁবার টেবিলে সাক্ষির খুব গম্ভীর
হয়ে রইল। রহমান সাহেব বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

কোন পরিকল্পনার কথা বলছেন?

আমেরিকাতেই থাকবে না দেশে আসবে?

দেশে আসব। আমেরিকায় থাকব কেন? পোস্ট ডক শেষ করে ফিরব। এখানকার
ইউনিভার্সিটিতে সহজেই আমার চাকরি হবার কথা।

অনেকেই তো ফিরতে চায় না।

আমি চাই। বিদেশের জন্যে আমার কোনো মোহ নেই।

শারমিন বলল, আপনি এত তাড়াহড়া করছেন কেন, আস্তে আস্তে খান।

দেখি হয়ে যাস্বে। জামালপুর যেতে হবে তো।

আজ না গেলে হয় না?

আমার হাতে সময় বেশি নেই। আজই যাব। বাসে করে গিয়ে যাব।

রহমান সাহেব বললেন, বাসে যেতে হবে না। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি ও তোমাকে
নিয়ে যাবে। তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে রওনা হলেই হবে, তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।

সাক্ষিরকে বিশ্রামের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হলো না। যেন এই
মুহুর্তে তার রওনা হওয়া দরকার। শারমিন বলল, আপনি কি সব সময়ই এমন হটফট
করেন?

কি।

করছেন যেন দু'মিনিটের মধ্যে আপনার গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। আপনি
করছেন তো আমি চা এনে দিচ্ছি। শান্ত হয়ে চা খান।

আমি বসছি শান্ত হয়ে।

হাবা পানো সাক্ষির ভাই, আপনি তো গাড়ি চালাতে জানেন?

কিভাবে জানা?

আপনার বাহাদুরি করে গাড়ি চালাতে যাবেন না। যা ছটফট স্বভাব আপনার,
কিছুটা করবেন।

না-না হেসে ফেলল এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল- শারমিন তুমিও চলো না

কিছুটা, না খুব খুশি হবে।

শারমিন হকচকিয়ে গেল।

না, যখন যাচ্ছে তখন অসুবিধা হবার কথা নয়।

না না, আমি এখন যাব না।

কেন, অসুবিধাটা কি?

শারমিন কি বলবে ডেবে পেল না। সাক্ষির বলল- গল্প করতে করতে যাব, তোমার
কিছুটা পাপবে।

না-না রেডি হওয়া যাবে না। তৈরি হতেও সময় লাগবে।

কিন্তু না হয় কাল সকালে যাই। তৈরি হবার সময় পাবে। পাবে না?

শারমিন বিব্রত স্বরে বলল- আমি এখন যাব না সাক্ষির ভাই।

কেন?

আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

সাক্ষিরকে দেখে মনে হলো তার আশাত্ত্ব হয়েছে। যেন সে ধরেই নিয়েছিল
শারমিন যাবে।

নিকোলে শারমিনের নিজেরও কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগতে লাগল। মনে
লগল গেলেনি হতো। যার সঙ্গে সারাজীবন কাটানো হবে তার সঙ্গে বিয়ের আগে কিছু
কিছু কাটানোর এমন কোনো মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হতো না। নাকি হতো?

শারমিন বাগানে বেড়াতে গেল।

মার্টি বড়ই গাছের নিচে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। সারা গা কাদায় মাখামাখি।

এই মার্টি তোর একি অবস্থা?

মার্টি শুয়ে রইল ছুটে এলো না। ওর শরীর ভালো নেই। শরীর ভালো থাকলে
এভাবে শুয়ে থাকতে পারত না। ডাকামাত্র ছুটে আসত। শারমিন তাঁক কণ্ঠে ডাকল-
মার্টি, জয়নাল।

জয়নাল অল্প কিছুদিন হলো চাকরিতে যোগ দিয়েছে। তার আসল কাজ হচ্ছে মার্টির
দেখাশোনা। একটি কুকুরকে দেখাশোনার কাজ তার কাছে খুব অপমানজনক মনে
হয়েছে বলেই বোধহয় সে কখনো মার্টির ধান্নে কাজে থাকে না। আজও ছিল না।
শারমিনের গলা শুনে ছুটে এলো।

মার্টিকে গোসল করিয়েছিলো?

জি আফা।

ওর গা এত ময়লা কেন?

কাদার মইধো খালি গড়াগড়ি করে। কি করমু আফা।

যাও, আবার ওকে পরিষ্কার করো। মাটি উঠে আয়।

মাটি উঠে এলো না। ঝিমুতে লাগল। জয়নাল বলল-এ আর বাঁচত না আফা।

বুঝলে কি করে?

লেজ নাইম্যা গেছে দেখেন না? লেজ নামলে কুস্তা বাঁচে না।

জয়নালকে খুব উল্লসিত মনে হলো। যেন সে একটা সুসংবাদ দিচ্ছে।

জয়নাল।

জি আফা।

কাল জোরেই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

জি, আইচ্ছা।

খাওয়া দাওয়া করছে ঠিকমত?

জি করতাকে।

রাতের খাবার কখন দেয়া হবে?

সাইক্যাবেলা।

আমাকে খবর দেবে তখন। আমি দেখব ঠিকমত খায় কি-না?

শারমিনের অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল। মাটি কি সত্যি সত্যি মারা যাবে? মৃত্যুর পর পত্তরা কোথায় যায়? ওদেরও কি কোনো স্বর্গ-নরক আছে?

শারমিন দোতলায় উঠে গেল। বাড়ি এখন একবারে খালি। বাবা গিয়েছেন মতিঝিল। কখন আসবেন কোনো ঠিক নেই। কি একটা মিটিং নাকি আছে। এসব মিটিং শেষ হতে অনেক দেরি হয়। কোনো কোনো দিন ফিরতে রাত একটা দেড়টা বেজে যায়। আজও হয়ত হবে। শারমিন কিছুক্ষণ একা একা বারান্দায় বসে রইল। কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। সবচে বড় কথা কিছুই করার নেই।

লাইব্রেরি থেকে একগাদা বই আনা হয়েছে। কোনোটাই পড়া হয়নি। মাঝে মাঝে এমন খারাপ সময় আসে কোনো কিছুতেই মন বসে না। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মাটিকে খাওয়াবার সময় হয়েছে বোধহয়। শারমিন নিচে নেমে এলো। এবং অবাক হয়ে দেখল রফিক বসে আছে।

আরে, তুমি কখন এসেছ?

প্রায় মিনিট পাঁচেক। দেখলাম দরজা খোলা আশে পাশে কেউ নেই। পচাপ বসে আছি।

ভালো করেছ। এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

মাটি সাহেবকে ডিনার দেয়া হবে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।

কুকুর খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? এত শখ আমার নেই। তুমি খাইয়ে আসো। আমি বসছি এখানে।

অসময়ে হঠাৎ কোথেকে এলো?

গাঃ-১ গভীর হয়ে বলল- এখানে এক বন্ধুর বাসায় এসেছিলাম, তারপর ভাবলাম
গাঃ-২ তখন দেখা করে যাই।

গাঃ-৩ কথা বলবে না। এখানে তোমার কোনো বন্ধু নেই। তুমি আমার কাছেই
গাঃ-৪ ঠিক কিনা বলো?

গাঃ-৫ কিছু বলল না। শারমিন বলল- চা খাবে?

গাঃ-৬

গাঃ-৭ সঙ্গে আর কিছু?

গাঃ-৮ তবে মিষ্টি না। আমি মিষ্টি খাই না। ঘরে তৈরি সন্দেশও না।

গাঃ-৯ তোমাকে রোগা লাগছে কেন রফিক?

গাঃ-১০ আমাকে নিয়ে রাজশাহী গিয়েছিলাম। এক সন্ধ্যা খুব ছুটাছুটি করেছি। ডাবীর এক
গাঃ-১১ গাঃ-১২ গেছে। একটা ছোট্ট ছেলে আছে তার। ছেলেটিকে নিয়ে এমন মুশকিলে
গাঃ-১৩ সবাই।

গাঃ-১৪ মুশকিল কেন?

গাঃ-১৫ কোথায় রাখবে। কার কাছে রাখবে। এত ছোট বাচ্চার দায়িত্ব কেউ নিতে চাচ্ছে

গাঃ-১৬ এলো কি?

গাঃ-১৭ দাঃ-১৮ ফ্যাট। তোমার মার্টির জন্যে নিশ্চয়ই তিন-চারজন লোক আছে। কিন্তু এই
গাঃ-১৯ মার্টির জন্যে কেউ নেই।

গাঃ-২০ শারমিন কিছু বলল না। রফিক বলল- রাগ করলে নাকি?

গাঃ-২১ না, রাগ করিনি। তুমি বস চা নিয়ে আসছি। দুধ চা না লেবু চা?

গাঃ-২২ জানা চা। গলা খুসখুস করছে।

গাঃ-২৩ রফিক ভেবেছিল মিনিট দশেক গল্পসল্প করে চলে যাবে কিন্তু সে রাত আটটা পর্যন্ত
গাঃ-২৪ থাকল। এর মধ্যে যে ক'বারই সে উঠতে চেয়েছে শারমিন বলেছে- আহ বসো না। এত
গাঃ-২৫ কেন?

গাঃ-২৬ রাত হয়ে যাচ্ছে, অনেক দূর যাব।

গাঃ-২৭ যাবার ব্যবস্থা আমি করব। আজ আমার সঙ্গে ভাত খাবে।

গাঃ-২৮ সে কি, কেন?

গাঃ-২৯ কেন আবার কি? খেতে বলেছি তাই খাবে।

গাঃ-৩০ তোমাদের রান্না কি?

গাঃ-৩১ জানি না কি।

গাঃ-৩২ তোমাদের কখন কি রান্না হয় তা তোমরা জানো না?

গাঃ-৩৩ শারমিন কিছু বলল না।

গাঃ-৩৪ খাও কিসে? রুপোর থালাবাটিতে?

গাঃ-৩৫ বকবক করবে না। খেতে বসলেই টের পাবে কিসে খাই।

গাঃ-৩৬ খাওয়াটা হবে কখন?

গাঃ-৩৭ একটু দেরি হবে। বাবুর্চিকে নতুন একটা আইটেম রান্না করতে বলেছি।

গাঃ-৩৮ আইটেমটা কি?

ঝেতে বসলেই টের পাবে। এখন আমার সঙ্গে এসো, মার্টিকে খাওয়ানো হবে।
আসতেই হবে?
হ্যাঁ, আসতেই হবে।

রহমান সাহেব ফিরলেন রাত দশটায়। শারমিন একটি ছেলের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে।
এবং কিছুক্ষণ পর পর শব্দ করে হেসে উঠছে। এই দৃশ্যটি তিনি অবাক হয়ে দেখলেন।
শারমিন বাবাকে দেখতে পায়নি।

রহমান সাহেব নিঃশব্দে সোতলায় উঠে গেলেন। তার কপালে সূঁচ কিছু ভাঁজ
পড়ল।



মনোয়ারার গাল ফুলে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়েছে।
সারাদিন কিছুই মুখে দেননি। ব্যথায় ছটফট করেছেন। ব্যথা কমানোর কোনো
অমুখ কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না।

সবচে' মুশকিল হয়েছে হোসেন সাহেবের। তাঁকে দেখামাত্র মনোয়ারার রাগ চড়ে
যাচ্ছে। যা মনে আসছে তাই বলছেন। হোসেন সাহেব অনেকক্ষণ সহ্য করলেন। কিন্তু
এক সময় স্বাভাবিক নিয়মেই তার ধৈর্যচ্যুতি হলো। তিনি প্রথমতঃ মুখে বললেন-আমার
উপর রাগ করছ কেন? তোমার দাঁত ব্যথা তো আমি তৈরি করিনি? সে রকম কোনো
ইচ্ছা আমার নেই।

মনোয়ারা চোখ মুখ কুঁচকে বললেন- আমার সামনে থেকে যাও তো। শুধু শুধু
ভাজ ভাজ করবে না।

যাবটা কোণায়?

যেখানে ইচ্ছা যাও। শুধু চোখের সামনে থাকবে না।

আই সি।

কি, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

যাচ্ছি, শেষে আফসোস করবে কিন্তু।

হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। নীলু কাপড় ইতি করছিল তাকে গিয়ে
বললেন-চললাম মা। নীলু আশ্চর্য হয়ে বলল- কোথায় চললেন? তিনি তার জবাব
দিলেন না। অনেক সময় নিয়ে হ্যান্ড ব্যাগ গুছালেন এবং এক সময় সত্যি সত্যি বেরিয়ে
গেলেন।

নীলু খুব একটা বিচলিত হলো না। হোসেন সাহেব প্রায়ই এরকম গৃহত্যাগ করেন,
ঘণ্টা দু'এক রান্নায় ঘুরাঘুরি করেন এবং এক সময় বাড়ি ফিরে আসেন। এবারও তার
ব্যতিক্রম হবে না।

কথাটা খাটখের ব্যাপার হচ্ছে হোসেন সাহেবের গৃহত্যাগের কিছুক্ষণের ভেতরই
কথাটার ব্যাপার আসাম হলো। তিনি এক কাপ লেবু চা এবং দু'দ্রাইস কুটি
কেন। খাটখের বেলা কি রান্না হচ্ছে খোঁজ নিলেন তারপর শাহানার সঙ্গে ছোটখাট
কথাটা বাদিয়ে বসলেন। বগড়া বাধানোর ইচ্ছা তার ছিল না। তিনি বেশ
কিছুক্ষণ জিজ্ঞেস করেছিলেন তোদের রেজাল্ট বেরুতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

শাহানা গভীর গলায় বলল- আমি কি করে বলব এত দেরি হচ্ছে কেন। আমি কি
কিছুক্ষণ চিন্তাচ্যুত?

শাহানা অবাক হয়ে বসলেন- তুই এমন ক্যাট ক্যাট করে কথা বলছিস কেন?
কথাটা জিজ্ঞেস করলাম, ছাৎ করে উঠলি? তোর সঙ্গে কি কথাও বলা যাবে না?

শাহানা ধমধমে মুখে ডাকাল। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন- তোর তেল বেশি
কিছুক্ষণ। কাজকর্ম নাই তো শুধু বসে বসে খাওয়া। বসে বসে খেলে এমন তেল হয়ে
যে।

এখন বাজে করে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না মা।

খাটখ করে কথা বলব না?

না।

কেন? তুই কি রানী ভিক্টোরিয়া?

হ্যাঁ, আমি রানী ভিক্টোরিয়া।

কি দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। মুখে মুখে কথা।

শাহানা নিশ্চয়ে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। এবং দরজা বন্ধ করে দিল।

কথাটার দরজা বন্ধ করা একটা ভয়াবহ ব্যাপার, সহজে এ দরজা সে খুলবে না।

কথাটা দু'দিন দু'রাত দরজা বন্ধ রাখার রেকর্ড তার আছে। এ দরজা কবে খুলবে কে
জানেন।

মনোয়ারা কিছুক্ষণ কাঁদলেন, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন।

নীলু বড় অসুস্থির মধ্যে পড়ল। এ বাড়ির সবার এখন মেজাজ খারাপ যাচ্ছে। তুচ্ছ
কথাটার নিয়ে রাগারাগি। নীলুর নিজের মন-মেজাজও ভালো না। এসব নিয়ে মাথা
কাঁটতে তার ভালো লাগে না। কিন্তু মাথা ঘামাতে হয়, এক এক করে সবার রাগ
জ্বলতে হয়। ভালো লাগে না।

সংসারে অভাব-অনটন বাড়ছে। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করা যাচ্ছে না। প্রভিডেন্ট
ক্লাবের লোনের টাকা কাটতে শুরু করেছে। বাড়ি ভাড়া বেড়েছে একশ টাকা। নীলুর
দারপা ছিল খুব সহজেই রফিকের চাকরি হয়ে যাবে। দারপা ঠিক হয়নি। রফিকের কিছুই
হচ্ছে না। সপ্তাহে দু'তিনটা করে ইন্টারভিউ দিয়ে হাসি মুখে ঘরে ফিরছে- ভাবী একেবারে
মেবে কেটে দিয়েছি।

তাই নাকি?

ইয়েস। স্মার্টলি সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। যেখানে হাসার দরকার সেখানে মৃদু
হাসলাম। যেখানে গভীর হওয়ার দরকার সেখানে গভীর হলাম।

পেরেছ সবকিছু?

এইটি পারসেন্ট পেরেছি। যেগুলি পারিনি সেগুলি পারার কথা নয়।

চাকরি হবে বলছ?

একজনের হলেও আমার হবে।

বল কি?

দ্যাটস রাইট। এখন চট করে চা সিমেট বাওয়াও। আমাকে খুশি রাখার
করো। ভবিষ্যতে লাভ হবে। বেতনের দিন ভালো মন্দ কিছু পেয়েও যেতে পার।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুই হয় না। রফিক নতুন কোনো ইন্টারভিউর জন্যে তৈরি।
নীলুর বড় মায়া লাগে। মনোয়ারা রাগারাগি করেন- দুনিয়াতুঙ্গ লোকের চাকরি
তোয় হয় না কেন?

হবে। আমারো হবে।

কবে সেটা?

ভেরি সুন। কোনো এক সুপ্রভাতে দেখবে রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি এসে হাজির।

আমি আর দেখে যেতে পারব না।

এখনো তো পাঁচ মাস হয়নি পাস করেছি, এর মধ্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কো
য়ার হয় পাঁচ মাসেই হয় যার হয় না তার পাঁচ বছরেও হয় না।

চিঠি অবশ্য একটা আসে রফিকের। রেজিস্ট্রি ডাকে নয়। সাধারণ ডাকে। 'মনা
আলী কলেজের প্রিন্সিপালের চিঠি। ইতিহাসের প্রভাষক পদে নিয়োগপত্র। যেতে হ
বরিশালের কোন এক গ্রামে।

নীলু জিজ্ঞেস করল- যাবে নাকি?

যাব না মানে? অফকোর্স যাব।

থাকতে পারবে গ্রামে?

খুব পারব। গ্রামের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিসিএস-এর জন্য সিরিয়াস একটা
প্রিপারেশন নিয়ে নেব। দেখবে ফার্স্ট-সেকেন্ড কিছু একটা হয়ে বসে আছি।

রফিক মহাউৎসাহে বরিশাল চলে গেল। এবং এক সপ্তাহের মধ্যে মুখ অঙ্ককার করা
ফিরে এলো। সফিক অবাক হয়ে বলল, চলে এলি কেন? রফিক বিরক্ত হয়ে বলল- আর
দূর, যত ফালতু ব্যাপার। অলরেডি সেখানে একটা ভালো কলেজ আছে। রেশারেটি
করে আরেকটা কলেজ দিয়েছে। না আছে মাস্টার, না আছে ছাত্র। এগারোজন টিচার
আছে, এরা গত পাঁচ মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না।

বলিস কি?

আমি যাওয়া মাত্র প্রিন্সিপাল আমার জন্যে একটা জায়গিরের ব্যবস্থা করে ফেলল।
নাইনে পড়ে এক মেয়ে তাকে পড়াতে হবে। তার বিনিময়ে থাকা ধাওয়া। চিন্তা করা
অবস্থা।

সফিক কিছু বলল না। রফিক শুকনো মুখে বলল- বুকে থাকতাম সেখানেই কিছু
মেয়ের বাবার কথাবার্তা যেন কেমন কেমন।

কেমন কেমন মানে?

ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় মেয়ে বিয়ে দিতে চায় আমার কাছে।

বলিস কি?

১১। খেলোক প্রথম প্রথম আমাকে ভাই বলত, তারপর বলা শুরু করল- আপনি
কত বড়ো মতো।

১২। নীল- মেয়েটি দেখতে কেমন?

১৩। ভালোই। বরিশালের মেয়েরা খুব সুন্দর হয়। হাসছ কেন তুমি ভাবী? এর

১৪। কিছ নেই। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।

১৫। ভয়েই পালিয়ে এসেছ?

১৬। নিজে ঠাট্টা ভালো লাগে না।

১৭। ওদের বলে এসেছো তো, নাকি না বলে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছ?

১৮। কোনো উত্তর দিল না। পরবর্তী বেশ কিছুদিন কাটাল গভীর হয়ে। নীল

১৯। একবার চেষ্টা করল- কি রফিক, বরিশাল কন্যার জন্যে মন খারাপ নাকি?

২০। বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কি সব ঠাট্টা করো, ভালো লাগে না।

২১। মেয়েটির দিকে দরদ একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে।

২২। ইট ভাবী। প্রিজ।

২৩। এসিএস পরীক্ষাও রফিকের ভালো হলো না। ইংরেজি এবং ইতিহাস দুটোর

২৪। গোটাই নাকি পাশ মার্ক থাকবে না। রফিকের ধারণা এগজামিনাররা খাতা দেখে

২৫। হাসি করবে। হোসেন সাহেব বললেন- এতটা খারাপ হলো কেন?

২৬। বোগাস সব কোচেন করেছে, খারাপ হবে না?

২৭। এসিএস-এ বোগাস প্রশ্ন করবে কেন?

২৮। বলে তুমি কি করবে বলো? সব মাথা খারাপের দল। ইতিহাসের প্রশ্ন পড়লে মনে

২৯। গিওগ্রাফির কোচেন।

৩০। বলিস কি?

৩১। বিশ্বাস না হলে তুমি পড়ে দেখো।

৩২। পরীক্ষা খারাপ দিয়ে রফিক খুবই মুষড়ে পড়ল। সে ধরেই নিয়েছিল ভালো করবে।

৩৩। সঙ্গে সম্পর্কও কমে গেল। নাশতা খেয়ে বেরিয়ে যায় রাত দশটা-এগারোটায়

৩৪। কিং। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই রেগে যায়। কথাবার্তা যা হয় নীলুর সঙ্গেই। তাও

৩৫। মন দেন নয়, যেদিন মেজাজ ভালো থাকে সেদিন।

৩৬। নীল বুঝতে পারে, রফিক হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছে। এটা কাটিয়ে তোলার

৩৭। জন্যে তার কিছু করা উচিত, কিন্তু সে কি করবে বুঝতে পারে না। আগে মাসের মধ্যে

৩৮। বেশ কয়েকবার রফিক টাকা চাইত। এখন আর চাচ্ছে না। চাইতে লজ্জা পাচ্ছে

৩৯। মাপ হয়। দিন দশেক আগে হঠাৎ করে চাইল-ভাবী তোমার সম্বন্ধ থেকে কিছু দিতে

৪০। পারবে?

৪১। কত?

৪২। সামান্য কিছু, ধর পঞ্চাশ।

৪৩। নীল একশ টাকা এনে দিল।

৪৪। গোটটা দিলে নাকি ভাবী?

৪৫। হুঁ, দিলাম।

৪৬। থ্যাংকস। মেনি থ্যাংকস।

আমাকে থ্যাংকস কেন? তোমার ভাইকে দাও। আমি তো তার ধনেই পো করছি।

ভাইয়াকেও থ্যাংকস্ আমি ভাবী সব লিখে রাখছি। ভেরি সুন তোমাদের সব * ফেরত দেব, উইথ ইন্টারেস্ট।

ঠিক আছে, দিও।

মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই একটা কিছু হবে।

তাই নাকি?

সেভেন্টি পারসেন্ট পসিবিলিটি। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বলেছে-আপনার মতো ইয়াং একটিভ ম্যানদেরই এখন দরকার। নিউ ব্লাড। আইডিয়া।

বেতন কেমন?

ফ্যাক্টাস্টিক বেতন। বিদেশি কোম্পানি।

তোমার ভাইয়েরাটাও তো বিদেশি কোম্পানি। বেতন তো এমন কিছু না।

কোম্পানিতে কোম্পানিতে বেশকম আছে ভাবী।

তোমাদেরটা খুব রমরমা কোম্পানি বুঝি?

খুবই রমরমা। গাড়ি এসে দিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে।

বল কি?

কোম্পানির নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। প্রি বেড রুম। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।

ফ্ল্যাট দেখে এসেছ?

না, আমি দেখিনি। ঐ অফিসের অন্য অফিসারদের সঙ্গে আলাপ হলো। সবাই কে মাইডিয়ার।

তাই নাকি?

হুঁ। বেশ কয়েকজন মহিলা আছেন। বড় বড় পোটে। বুঝলে ভাবী, মেয়েদের জন্মে আজকাল চাকরির সুবিধা। তুমি যদি চেষ্টা কর, উইদিন টু মাস্ একটা কিছু জুটিয়ে ফেলতে পারবে।

সত্যি?

ইউ বেট। বি.এ.পাস আছে। দেশতে শুনেও মোটামুটি খারাপ না। চলে যায়।

চলে যায় মানে?

ডানাকাটা পরী তুমি নও ভাবী। এরকম কোনো মিসকনসেপশন থাকে উচিত না। তবে দেশতে খারাপও না।

নীলু হেসে ফেলল। রফিক সিগারেট ধরিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলল-আমার কথা শোনো ভাবী, চাকরির চেষ্টা করো। এই যুগে একার রোজগারে কিছু হয় না। দু'জনে মিলে হাল খরো।

তোমার ভাই পছন্দ করবে না।

এর মধ্যে পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই। কেঁচেন অব সারভাইভেল।

চাকরির ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন থেকেই নীলু ভাবছে। বন্যা গতমাসে এসেছিল।

১০। এক সময় বলেই ফেলেছে—তুই বলেছিলি আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিবি।

১১। ক'রিয়ে দিবি। মনে আছে?

১২। থাকবে না কেন? করতে চাস?

১৩। একম চাকরি?

১৪। দুটি ধরনের একটা কিছু, তোকে তো আর ফস করে ক্লাস ওয়ান অফিসার
করা যায় না।

১৫। ক'রির চাকরি?

১৬। পা আছে? দেড় দু'হাজার টাকা পাবি সব মিলিয়ে। এই বাজারে এটাইবা মন্দ

১৭। ক'রির? তাহলে আগামী সোমবার আয় আমার অফিসে। আমি কথা বলে রাখব।

১৮। সঙ্গে কথা বলবি?

১৯। আছে। তুই আয় তো।

২০। সোমবার যেতে পারেনি। বুধবারে সত্যি সত্যি গিয়ে উপস্থিত। বন্যা অফিস
২১। ১০ টি নিয়ে নিল। হাসি মুখে বলল—তোর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে হাতে দেবার
২২। করতে না পারলে আমার নাম বন্যা নয়।

২৩। কেন কি তুই?

২৪। মামাকে তোর কথা বলে রেখেছি। সার্টিফিকেটগুলি এনেছিস?

২৫।

২৬। পাম না সার্টিফিকেটগুলি সব আনতে?

২৭। মন গিয়ে নিয়ে আসব?

২৮। আশা থাক, পরে হলেও চলবে।

২৯। তখিলের এমন একটি অফিসে তারা ঢুকল যে, নীলুর বুক কাঁপতে শুরু করল।

৩০। বিশপনে উগ্র ধরনের সাজ করা ভারি সুন্দরী একটি মেয়ে। ঝকঝক তকতক করছে
৩১। লক্সি-৫।

৩২। এটাই নাকি অফিস?

৩৩। কেন, পছন্দ হচ্ছে না?

৩৪। নীলু কিছু বলল না। বন্যা বলল—চল মামার সঙ্গে তোকে পরিচয় করিয়ে দেই। মুখ

৩৫। ওকনো করে রেখেছিস কেন? নীলু ফিসফিস করে বলল—এখানে আমার চাকরি
৩৬। হল না।

৩৭। ক'রলি কি করে হবে না?

৩৮। আমার মন বলছে হবে না। কিছু কিছু জিনিস আমি টের পাই। সিগ্রেট সেস।

৩৯। আশ তোর সিগ্রেট সেস।

৪০। বন্যার মামা তেমন কোন উৎসাহ দেখালেন না। দু'একটা ছোটখাট প্রশ্ন
৪১। করেন—কবে পাস করেছেন, এর আগে কোথাও চাকরি করেছেন? টাইপিং জানা আছে
৪২। কিংবা শর্টহ্যান্ড? বাসা কোথায়? এমন কিছু জটিল প্রশ্ন নয়, কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে নীলুর
৪৩। গা জড়িয়ে যেতে লাগল এবং একবার মনে হলো সে এলেই ভালো ছিল।

৪৪। ভদ্রলোক তাদের কফি খেতে বললেন। গ্রাইভেট ব্যবসার নানা সমস্যার কথা
৪৫। বলেন এবং এক সময় টেলিফোন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দু'টি মেয়ে বসে আছে

তার সামনে এটা তাঁর মনেই রইল না। নীলু ফিসফিস করে বন্যাকে বলল-আমরা কি চলে যাব? বন্যা ইশারায় তাকে বসতে বলল। সবচে' যে জিনিসটি নীলুর কাছে আশ্চর্যজনক মনে হলো তা হচ্ছে-বন্যার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। বন্যা নিজেও কেমন যেন মিইয়ে আছে। নীলু লক্ষ করল, তাদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় কিছুই হয়নি। এমন একজন অল্প পরিচিত মানুষের কাছে বন্যা তাকে এতটা ভরসা দিয়ে কেন নিয়ে এসেছে কে জানে। নীলুর বেশ মন খারাপ হলো।

টেলিফোনে ভদ্রলোক প্রায় এক ঘণ্টা কথা বললেন। খুব জরুরি টেলিকোম বোধহয়। কারণ কথা শেষ করেই তিনি বললেন- আমি আজ একটু ব্যস্ত। অর্থাৎ উঠতে বলা হচ্ছে। বন্যা শুকনো মুখে বলল-একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেন মামা। চাকরির খুব দরকার। রাগ হবার মতো কথা। নীলুর চাকরির এমন কিছু দরকার নেই। কিন্তু বন্যা এমনভাবে কথাটা বলল যেন নীলু ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে আছে।

ভদ্রলোক নিরাসক্ত গলায় বললেন-আমাদের এখানে কোনো অপেনিং নেই। ভবিষ্যতে হবে এরকম আশাও নেই। তবে আমার কাছে পার্টিকুলাস রেখে যান আমি দু'একজনকে বলে দেখব।

ও কিন্তু মামা অত্যন্ত ভালো মেয়ে।

ভালো মেয়েদের অফিসে দরকার নেই, অফিসে দরকার এফিসিয়েন্ট মেয়ে।

ও খুব এফিসিয়েন্ট।

বুঝলে কি করে? উনি তো এর আগে অফিসে কোনো কাজ করেননি।

মামা আপনি একটু দেখবেন।

নিশ্চয়ই দেখব। নাম-ঠিকানা এবং একটা বায়োডাটা আপনি আমার সেক্রেটারি কাছে দিয়ে যান।

নীলুর এসব করার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বন্যা এমন অগ্রহ নিয়ে এলে তাকে না বলতে খারাপ লাগল। সে এমন ভাব করছে যেন বায়োডাটা লিখে দিলেই তার চাকরি হয়ে যাবে। এমন ছেলেমানুষও থাকে এই যুগে?

নীলু বাড়ি ফিরল খুব মন খারাপ করে। এতটা মন খারাপ হবে সে নিজে বুঝতে পারেনি। সে বোধহয় ধরেই নিয়েছিল চাকরিটা হবে। নানা রকম পরিকল্পনাও তার ছিল। প্রতি মাসে মাকে কিছু টাকা পাঠাবে। বেতন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মানি অর্ডার করবে। যতদিন মা বেঁচে থাকবেন ততদিনই পাঠানো হবে। এ বাড়ির কারোর কিছু বলার থাকবে না। তার নিজের টাকা। দু'একটা শখের জিনিস কিনবে। একটা টিভি। একটা ফ্রিজ। একটা হারমোনিয়াম। গানের দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। তার বাবারও ছিল। বাবাই দু'মেয়েকে গান শিখিয়েছিলেন। বাবা মারা যাবার পর কোথায় সব ভেসে গেল।

কি চমৎকার গানের গলা ছিল বিলু আপার। বাবা সব সময় বলতেন-আমার এই মেয়ে গান গেয়ে পাগল করে দেবে সবাইকে। কোথায় গান গান, কোথায় কি?

নীলু তার বোনের কথা কখনো ভাবতে পারেনি না। ওটা যেন একটা দুঃসপ্ন। কোনোকালে তার যেন কোনো বোন ছিল না। বিলু নামের কাউকে সে চেনে না। কিন্তু তবু এক সময় এমন পরিস্থিতিতে বিলু আপার মুখ মনে আসে। আদুরে স্নিগ্ধ একটা মুখ।

কি করে বলবে—“কিরে নীলু রোদে ঘুরে তোর মুখটা বাঙ্গা হয়ে আছে। দেখি, বস তো
না।” নীলু প্রায়ই ভাবে এত মায়াবতী একটি মানুষ কি করে হয়? কি দুঃখী
না। তবু বিলু আপা, অথচ কী সুখী চেহারা! গভীর দুঃখের কিছুমাত্র ছাপ ছিল না
জানাল চোখে। আনন্দ উজ্জ্বল হাসি হাসি দুটি চোখ।

মধ্যাহ্ন সাধারণত রাত আটটার মধ্যে এসে পড়ে। সাড়ে আটটা বাজছে এখনো তার
গাম নেই। হোসেন সাহেবও ফেরেননি। কোথায় ঘুরছেন কে জানে। এত দীর্ঘ
সময় তার রাগ থাকে না। আজ আছে। রাগ পড়েনি শাহানারও। এখনো তার
মনোয়ারা বন্ধ। মনোয়ারা রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করেছেন, লাভ হয়নি।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দিন খারাপ করেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। বৃষ্টি
আগেই হবে। ওমোট হয়ে আছে। নীলু আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোট একটা
ফেল।

নীলু জেগে উঠেছে। তার হাসি শুনা যাচ্ছে। অদ্ভুত স্বভাব হয়েছে মেয়েটার, ঘুম
থাকতে শুরু করে। পৃথিবীর সব ব্যাকারাই জেগে ওঠে কান্দে। শুধু টুনীই বোধহয়
দুঃখ থেকে টুনীর হাসি শুনে এমন মজা লাগছে।

শোনা।

নীলু চমকে তাকাল। মনোয়ারা টুনীকে কোলে নিয়ে বারান্দায় চলে এসেছেন।

একটি হলেই তো সর্বনাশ হতো। কি যে কাণ্ড করা তুমি।

কি হয়েছে মা?

খাটব কিনারে শুয়ে রেখেছ। নিজে নিজে উঠে বসেছে, একটু হলেই পড়ত। এত

শোনা হলে চলে?

নীলু কিছু বলল না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?

দিন খারাপ করেছে মা।

দেখ আসো। দরজা জানালা বন্ধ করো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকারটা কি?

জানালা বন্ধ করবার আগেই হঠাৎ করে প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করল। রীতিমত
শেলকট্রিসিটি চলে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনোয়ারা টুনীকে কোলে
খসড়া করেই ছুটাছুটি করতে লাগলেন। মোমবাতি খুঁজে পাওয়া গেল না। হারিকেনে
শুরু নেই। প্রচণ্ড শব্দে বাতাসের জানালার একটা কাচ ভাঙল। মনোয়ারা আকাশ
দিকে চেঁচাতে লাগলেন—“বোমা, তোমার কি কোনো কালেও বুদ্ধি বন্ধ হবে না। ঝড়
কালো দিনে হাতের কাছে হারিকেন রাখবে ঠিকঠাক করে—এক ফোঁটা তেল নাই
গায়ে। এসব কি?”

টুনীও ভয় পেয়ে কান্দতে শুরু করেছে। নীলু বলল—“এক আমার কাছে দিন মা।
মনোয়ারা রেগে গেলেন—অন্ধকারে হাত থেকে ফেলবে এক পাকু আমর কাছে। তুমি
গামার কাজ কর।

কবার মতো কোনো কাজ নেই। নীলু তার ঘরে চলে গেল। ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি
পড়তে শুরু করেছে। গাড়ি অন্ধকার চারদিকে। এক একবার বিদ্যুৎ চমকচ্ছে আর আলো

হয়ে উঠছে চারদিক। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। মনে হয় এই কাছেই কোথায়
যেন পড়ল। চুপচাপ বসে থাকতে ভালোই লাগছে নীলুর।

ভাবী।

নীলু তাকান। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে শাহানা এগা
আসছে। নীলু হাসি মুখে বলল-রাগ কমেছে নাকি শাহানা? শাহানা জবাব দিল না। নী
হালকা গলায় বলল-ওদের কি অবস্থা কে জানে?

কাদের?

বাবা আর রফিক।

তোমার বরের কথা তো কিছু বলো নি। নাকি ভাইয়াকে নিয়ে তুমি ভাব না?

ভাবি।

শাহানা উঠে এলো খাটের উপর। মৃদুস্ববে বলল-হঠাৎ করে এমন দিন খারাপ হয়ে
কিভাবে? যা ভয় লাগছে।

ভয়ের কি আছে?

টুনী কান্দছে। মনোয়ারা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। কোনো লাভ হচ্ছে না
শাহানা বলল-ভাবী, তুমি টুনীকে নিয়ে এসো তো।

তুমি নিয়ে এসো, আমার কাছে দেবেন না।

আমি যাচ্ছি টাচ্ছি না।

নীলু হালকা গলায় বলল-এত ছোট ব্যাপার নিয়ে এরকম রাগ করে কেউ? জীবনে
বাগ করার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার ঘটবে।

শাহানা মৃদুস্ববে বলল-হঠাৎ করে আমার কেমন যেন রাগ ধরে যায়। আর এ রকম
করব না।

মোমবাতি কোথায় আছে জানো?

জানি। আমার টেবিলের ড্রয়ারে।

একটা মোমবাতি মার ঘরে দিয়ে আসো না। টুনী অন্ধকার দেখে কান্দছে।

আমি পারব না ভাবী। তুমি যাও।

নীলু মোমবাতি জ্বালিয়ে মনোয়ারার ঘরে রেখে এলো। টুনীর কান্না থেমে গেল সঙ্গে
সঙ্গে।

হাত-পা ছুড়ে খেলা জুড়ে দিল। নীলুর ইচ্ছা হলো বলে-ওকে আমার কাছে একটা
দিন না যা। কিছু সে কিছু বলল না। মনোয়ারা দেবেন না।

বৌমা, কটা বাজল?

নটা পঁচিশ।

এতো মহাচিন্তায় পড়লাম। কোথায় আটকা পড়ল ওরা কে জানে?

এসে পড়বে মা। আপনার দাঁত ব্যথা কমেছে।

কমেছে।

কিছু খাবেন আপনি? দুপুরে তো কিছু খাননি।

না কিছু খাব না। তুমি দেখো শাহানার রাগ ডাঙাতে পারো কিনা যত্নগা হয়েছে
একটা।

কণা গাণ তেঙেছে মা। আমার ঘরে বসে আছে। মনোয়ারা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস
লেন। দরজায় ধাক্কা পড়ছে। নীলু দরজা খুলে দেখল আনিস দাঁড়িয়ে আছে। কাক
। হুগে গেছে সে।

বাপার কি আনিস?

অনুগ্রহ করিলা ভাবী। চা খাওয়াতে পারবেন?

হ্যাঁ পারব। শুকনো কাপড় কিছু পরে আসি।

তখনো কাপড় আমার কিছু নাই ভাবী। ঘর ভেসে গেছে। একটা গামছাটামছা কিছু দিন।

আমি ভেতরে। শাহানাকে বলছি কাপড় দেবে তোমাকে। নীলু চা বানিয়ে বসার

। চা দেখল অন্ধকারে আনিস এবং শাহানা পাশাপাশি বসে আছে। ওদের বসার

। মধ্যেই কিছু একটা ছিল যা দেখে হঠাৎ নীলু একটু চমকাল। ভালোবাসাবাসির

। ব্যাপার নেই তো? শাহানার বয়স খুবই কম। এই সময়ে মন তরল থাকে।

। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। দরজায় আবার ধাক্কা পড়ছে। হোসেন সাহেবের গলা

। যাচ্ছে-বৌমা, বৌমা।

রাত দশটার মধ্যে ভিজতে ভিজতে সবাই এসে উপস্থিত হলো। তুমুল বর্ষণ হলো

। আনিস থেকে গেল এ বাড়িতে। সোফার উপর বিছানা হলো তার। অনেক

। পর্যন্ত জেগে রইল সে।

জেগে রইল শাহানাও। সমস্ত রাত তার মন কেমন করতে লাগল।

আজ প্রথমবারের মতো সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছে। আনিস ভাই যখন

। তার মাথায় ভেজা চুল মুছছে তখন হঠাৎ তার ইচ্ছে করছিল গামছাটা তাঁর

। নিয়ে নিতে। তার বলতে ইচ্ছে করছিল-আনিস ভাই, মাথাটা নিচু করুন, আমি

। দিয়ে দিচ্ছি। কেন এরকম মনে হলো? এ রকম মনে হওয়া নিশ্চয়ই খুব খারাপ। খুব

। মেয়েদের নিশ্চয়ই এরকম মনে হয়। কিন্তু সে খারাপ মেয়ে হতে চায় না। সে

। একটা ভালো মেয়ে হতে চায়।

শাহানা চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। সে অন্ধকারে একা ঘুমুতে ভয়

। বলেই মনোয়ারা আজ তার সঙ্গে ঘুমিয়েছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন-কি

। যাচ্ছে শাহানা, কাঁদছিস কেন? শাহানা ধরা গলায় বলল-জানি না কেন।

অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট হচ্ছে শাহানার। এ ধরনের কষ্ট পৃথিবীতে আছে তা তার

। ছিল না। মনোয়ারা শাহানার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে সান্তনা দিতে চেষ্টা করলেন।

তিনি কি কিছু বুঝতে পারছেন? মায়েরা অনেক কিছু বুঝে ফেলে।

শাহানা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল-আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে মা



কবির সাহেব সাধারণত অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে ওঠেন। হাত-মুখ ধুয়ে
খরিকেন জালিয়ে তাঁর পড়ার টেবিলে বসেন। জরুরি লেখালেখির কাজগুলি সূর্য ওঠার

আগেই সেয়ে ফেলা হয়। আজ তেমন কোনো জরুরি লেখালেখির ব্যাপার নেই। অজ্ঞান বসে লেখার টেবিলে বসেছেন। শুধু শুধু বসে থাকার কোনো মানে হয় না, তিনি একটি প্রবন্ধ লিখতে বসলেন। প্রবন্ধের নাম-স্বাধীনতা। প্রথমে ইচ্ছে ছিল “মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা” এই বিষয়ে কিছু লেখবেন। প্রতিটি লেখারই নিজস্ব প্রাণ আছে। সে লেখাকে ঘুরিয়ে দেয়। এই লেখাটিও সে রকম হলো। তিন পৃষ্ঠা লেখার পর কবির সাহেব লক্ষ্য করলেন দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে না লিখে তিনি লিখছেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রসঙ্গে। তিনি ভুরু কঁচকে লেখাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বয়স ষাট মাস্কে, যা ভাবছেন তা লিখতে পারছেন না। এটা বয়সের লক্ষণ। জরুর লক্ষণ। সমস্যা কি তাহলে শেষ হয়ে আসছে? তিনি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। মানুষের মতো এমন শক্তিশালী একটি শ্রাণী এত ক্ষীণ আবু নিয়ে আসে কেন? একটি কচ্ছপ বাঁচে আড়াইশ বছর। কচ্ছপের আড়াইশ বছর বাঁচার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের অপচয়।

শওকত উঠে পড়েছে। সে সাড়া শব্দ করে ডন বৈঠক করছে। বিরক্ত হয়ে তাকালেন শওকতের দিকে। গুনে গুনে সে পঞ্চাশটা ডন দিবে তারপর কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে চা বানাতে বসবে। বিরাট একটা জামবাটিতে শরবতের মতো মিষ্টি চা এনে টেবিলে রেখে গাল ভর্তি হাসি দিয়ে বলবে, স্যার চা। চা তিনি খান না। বহবার এই কথা শওকতকে বলা হয়ছে। কোনো লাভ হয়নি। সে কাজ করে তার নিজের ইচ্ছায়। অন্য কেউ কি বলছে না বলছে তার কোনো তোয়াক্কা করে না। তার ধারণা সকাল বেলা এক বাটি চা দিয়ে সে স্যারের সেবা করছে। এবং স্যারের আপত্তিটা মৌখিক আসলে তিনি মনে মনে খুশিই হন।

শওকত তার সঙ্গে এসে জুটেছে মাস তিনেক হয়। তবে কবির সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। নীলগঞ্জ কুলে ক্লাস সেভেনে পড়বার সময় সে উধাও হয়ে যায়। কোথায় আছে কি কেউ বলতে পারে না। মাস খানেক পর খবর পাওয়া গেল সে এক সার্কাস পার্টিতে ঢুক সোহাগী চলে গেছে। নিউ অপেরা সার্কাস। খুব বড় দল। কবির সাহেব খবর পেয়ে সোহাগী চলে যান এবং কানে ধরে তাকে নীলগঞ্জে নিয়ে আসেন। কানে ধরা কথাটা মুখের কথা নয়, সোহাগী থেকে নীলগঞ্জ আসার সারাটা পথ তিনি সত্যি সত্যি তার কান চেপে ধরে ছিলেন। পরবর্তী এক বৎসর কোনোরকম খামেলা হয় না। সে ক্লাস এইটে প্রমোশন পায়। ক্লাস এইটেই সে মহাশুভা হিসেবে নীলগঞ্জে মোটামুটি একটা ত্রাসের সৃষ্টি করে। নীলগঞ্জ চেয়ারম্যান সাহেবের ছোট মেয়ের জামাইয়ের সঙ্গে কি একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। এবং লাঞ্ছিত হয়ে তার পা ভেঙ্গে ফেলে। কবির সাহেব খবর পেয়ে বেত হাতে তাকে ধরতে ছান। তার কোনো ষোঁজ পাওয়া যায় না। তার বাবা গ্রামের দরবার ডেকে তাকে তাজী পুত্র করে দেন। পুত্রের প্রতি বিরাগবশত এটা অবশ্যি করা হয় না, করা হয় চেয়ারম্যান সাহেবের রোষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। চেয়ারম্যান হাজি খবির উকিল খুব সহজ লোক না।

যাই হোক পরবর্তী চার বছর শওকতের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। উড়ো খবর আসে সে চলে গেছে আসাম। এত জায়গা ঝকতে আসাম যাবার কারণটি কারোর কাছেই পরিষ্কার হয় না।

রাগ এতর পর এক সকালবেলা কবির সাহেব দেখলেন তার বাড়ির বারান্দায় একজন মৃগাচ্ছে। চেনার উপায় নেই। বিশাল জোয়ান।

কি! তুই কোথেকে?

মামাএর শরীরটা ভালো?

খানি ভালো তুই এসেছিস কখন?

দাঁড়তে।

দাঁড়তে যাস নাই?

দাঁড়িতে গিয়া কি হইব।

এখানেই থাকবি নাকি?

হঁ।

কবির সাহেবের ধারণা কিছুদিন থাকবে তারপর নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। কিন্তু রকম কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। থাকে দাচ্ছে আছে নিজের মতো। এরমধ্যে খবর পেয়েছেন সে খবির উদ্দিনকে শাসিয়ে এসেছে। বলে এসেছে, বেশি তেরিবেরি করলে খিলেব মইখো পুইতা পুইয়াম। ভয়াবহ ব্যাপার।

কবির সাহেব সববতের মতো মিষ্টি চায়ের খানিকটা খেলেন। সূর্য উঠি উঠি করছে। রোদে পড়বার সময় হয়েছে। সূর্য ওঠার আগেই তিনি সমস্ত গ্রামে একটা চক্কর দিয়ে আসেন।

একদিনের বৃষ্টিতে রাস্তা পাঁচপাঁচে কঁাদা হয়ে আছে। পা রাখা মাত্রই ডেবে পড়ে। কবির সাহেব চটি খুলে ফেললেন। পাজামা হাঁটু পর্যন্ত তুললেন। এক হাতে একটি ছাতি নিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগলেন। আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। বৃষ্টি শুরু হবার সম্ভাবনা। এ রকম দিনে না বের হলেও চলত। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে- বনালে না ঘুরলে মনে হয় দিনটা ঠিকমত শুরু হলো না। কিছু একটা যেন বাকি রয়ে গেল।

সূর্য এখনো ওঠেনি কিন্তু গ্রাম জেগে উঠেছে, শহরের সাথে গ্রামের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে শহরের মানুষেরা কখনো সূর্যোদয় দেখে না। কবির সাহেবের মনে হলো সূর্যোদয় দেখাটা অত্যন্ত জরুরি। এই দৃশ্যটি মানুষকে ভাবতে শেখায়। মন বড় করে। কবির সাহেবের পরক্ষণেই মনে হলো মন বড় করে ধারণাটা ঠিক না। গ্রামে অত্যন্ত ছোট মনের মানুষদের তিনি দেখেছেন। মন বড়-ছোট ব্যাপারটির সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক বোধহয় নেই।

মাষ্টার সাব মামালিকুম।

ওয়লাইকুম সালাম। কেমন আছ কুদুস।

জি মাষ্টার সাব আপনার দোয়া।

যাও কোথায় এত সকালে?

ইন্টিশনে যাই। টাকা যাওন দরকার।

ট্রেন তো সকাল দশটায়, এখনই কোথায় যাও?

কুদুস কিছু বলল না। কবির সাহেবকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে সে প্রায় রাস্তায় নেমে গেল। কবির সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, "ষ্টেশনে এতক্ষণ বসে

থেকে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে এটা ঠিক না।” অশিক্ষার জন্যে এটা হচ্ছে। দশটায় ট্রেন বসে থাকবে ছুটির সময়।

মাষ্টার সাহেবের শইলভা বানা?

হ্যাঁ ভালোই।

কুদ্দুস তার পেছন পেছন আসতে লাগল। দু'জনে হাঁটছে নিঃশব্দে। রাজারামের পুকুর ঘাট পর্যন্ত এসে কবির সাহেব বললেন—

তুমি তো উল্টোদিকে আসছ কুদ্দুস, ইন্টিশানে যাবে ইন্টিশানে যাও।

জি আচ্ছ।

কুদ্দুস উত্তরের সড়কের পথ ধরল। কবির সাহেব পুকুরে পা ধোয়ার জন্যে নামলেন। পা ধোয়া অর্থহীন। আবার কাদা লাগবে। কিন্তু রাজারামের এই পুকুরের কাছে এলেই পানিতে হাত-পা ডুবতে হচ্ছে করে। বিশাল দিঘি। আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি। এই ঘোর বর্ষায়ও এর জল কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ।

হাত-পা ধুতে ধুতেই কবির সাহেব লক্ষ করলেন ভিক্ষার বুলি নিয়ে দুজন ভিক্ষুরি যাচ্ছে। এই দৃশ্যটি নতুন। গ্রামের মানুষ জন সহজে ভিক্ষা করে না। এরা কি এই গ্রামেরই নাকি? তিনি হাত ইশারা করে ডাকলেন। না এরা এ গ্রামের না। কবির সাহেব কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন বাড়ি কোন গ্রামে? কতদিন ধরে ভিক্ষা করছ? বসন্ত বাড়ি আছে? ছেলেমেয়ে নাই? ভিক্ষা করতে কতদূর যাও। রাতে নিজ গ্রামে ফিরে যাও না থেকে যাও।

ওরা বেশ আগ্রহ নিয়েই প্রশ্নের জবাব দিল। গ্রামের ভিক্ষুকরা শহরের ভিক্ষুকদের মতো নয়, এরা বলতে পছন্দ করে। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ এখনো আছে। কবির সাহেব হাত-মুখ ধুয়ে দাঁড়াতে ওদের একজন চিকন সুরে বলল, চাচা মিয়া আট আনা পয়সা দেন। কবির সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, আমি ভিক্ষা দেই না।

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তিনি উত্তরের সড়ক ধরলেন। সূর্য উঠে গেছে এখন আর হাঁটতে ভালো লাগবে না। গ্রামে ভিক্ষুক বাড়ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এটা হতে দেয়া যায় না। গ্রাম হচ্ছে উৎপাদনের জায়গা এখানে ভিক্ষুক তৈরি হলে চলবে কিভাবে?

স্যার স্লামলিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। রকিব ভালো আছ?

জি স্যার। একটু বসবেন না?

না, আরেকদিন।

রকিব সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। সে গ্রামে থাকে না। রাজশাহীতে ফুট সাপ্লাইয়ের কাজ করে। অল্পদিনের মধ্যেই পয়সাকড়ি করে কেলেছে। বাড়ি এসেছে ঘর পাকা করবার জন্যে।

স্যার একটা দোনলা বন্দুক কিনলাম।

তাই নাকি? বন্দুক কেন?

একটা বন্দুক থাকলে স্যার ডাকাতি হয় না। জানেন তো আশেপাশে খুব ডাকাতি হচ্ছে।

তাই নাকি? জানি না তো?

এই গ্রামেও হবে। বন্দুকটা কিনলাম এই জন্যেই। আসেন না স্যার
দেখেন।

বন্দুকের ব্যাপারে আমার উৎসাহ নাই রকিব। বন্দুক দিয়ে কিছু হয় না।

এই তাঁর মনে হলো কথাটা ঠিক না। মুক্তিযুদ্ধ বন্দুক দিয়েই করতে হয়েছে।

একটা অত্যন্ত দরকারি জিনিস।

একবার

স্যার।

বন্দুক দিয়ে কিছু হয় না তোমাকে যে বললাম এটা ঠিক না। বন্দুকের দরকার
খাচ্ছে।

স্যার তা তো আছেই। গ্রামের এক বাড়িতে বন্দুক আছে তখনলে সেই গ্রামে আর
কাজ আসে না।

এই নাকি?

স্যার।

তোমার বন্দুক বাড়িতে থাকবে?

জি।

তুমি কত দিন আছ?

এক সপ্তাহ থাকব স্যার। কাল একবার আসব আপনার কাছে?

কোনো কাজে? না, এমনি দেখা-সাক্ষাৎ

একটা কাজ স্যার আছে।

আজ্ঞা ঠিক আছে।

কখন আসলে পাওয়া যাবে আপনাকে?

সব সময়। যাব কোথায়? ঘরেই থাকি সারাদিন।

রকিব বিদায় নিতে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল। এটা একটা নতুন ব্যাপার। কোনো
উদ্দেশ্য আছে কি? উদ্দেশ্য ছাড়া আজ্ঞাকাল কেউ কিছু করে না। তিনি ভুরু কুঁচকালেন।
ওড়তে ওড়তে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়। বদর পেয়েছিলেন শিয়ালজানি খালে
পানি বাড়ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। বন্যা এ বছরও কি হবে? একটু ঘুরে শিয়ালজানি
খাণ্ডা দেবে গেলে হয়। একটা বাঁধটাধ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতি বছর বন্যা
এলে তো সবাই তিথিরি হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে তিনি শিয়ালজানি খালের দিকে রওনা
হলেন। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। সঙ্গে ছাতা আছে, কিন্তু ছাতা মেলতে ইচ্ছা
করাচ্ছে না। পথে যেতে যেতে তার মনে হলো আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। কাজে হাত
দেয়া দরকার। মানুষ কল্হণ নয়, সে আড়াইশ বছর বাঁচে না। অল্প কিছু দিন বাঁচে। যা
করবার এই অল্প সময়ের মধ্যেই করতে হবে। শুরু করতে হবে ত্রুটি, তারপর অনেকে
এসে দাঁড়াবে পাশে। কোনো সংকাজে মানুষের অভাব হয় না। মানুষ এক সময় না এক
সময় পাশে এসে দাঁড়ায়। তার পাশেও লোকজন এসে দাঁড়াবে।

ছাত্রদের কাছে চিঠি লিখতে হবে। দেখা করতে হবে সবার সাথে। অনেক কাজ।
শিয়ালজানি খালের পাড়ে কবির সাহেব দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমক্রম করে বৃষ্টি
পড়ছে। ছাতা মেলতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। পানি সত্যি সত্যি অনেকখানি বেড়েছে। ছোট

একটা খাল। কিন্তু কত অল্প সময়ের নোটিশে বিশাল হয়ে যেতে পারে। এ রকম নজির আছে।

গ্রামালিকুম মাষ্টার সাব।

ওয়ালাইকুম নালাম।

খালে পানি বাড়তাকে।

হঁ।

এই বছর কিছুক পানি আইত না।

বুঝলে কিভাবে?

পর পর দুই সন বান হয় না। তারপর পানিটা দেখেন, ভারী পানি, বানের পানি অয় পাতলা।

তাই নাকি?

জি।

ভারী-পাতলা বোঝ কিভাবে?

হাতে নিলেই বুঝন যায়।

কবির সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, খালের তীর বরাবর বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করব বুঝলে মজনু মিয়া।

এইটা সম্ভব না মাষ্টার সাব।

কবির সাহেব রাগী গলায় বললেন, অসম্ভব বলে কোনো জিনিস নেই মজনু মিয়া, সবই সম্ভব। মানুষের ক্ষমতা খুব বেশি। অবশ্যি বেশিরভাগ মানুষই তা জানে না। আসো ছাতার নিচে আসো, ভিজছে কেন?

মজনু মিয়া হাসতে হাসতে বলল, ভিজতে ভালো লাগে মাষ্টার সাব। মজনু মিয়ার দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে ফেঁটা ফেঁটা হয়ে। ভালো লাগছে দেখতে।

তিনিও ছাতি নামিয়ে ফেললেন। মজনু অদাক হয়ে বলল, ও মাষ্টার ভিজতেছেন তো।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোই লাগছে।

মজনু মনে মনে ভাবল, আমাদের মাষ্টার খুব পাগলা কিসিমের আছে।

সন্ধ্যার দিকে খবর এলো শিয়ালজানি খালের পানি অনেকখানি বেড়েছে। এই হারে বাড়তে থাকলে রাতের মধ্যে গ্রামে ঢুকবে। নীলগঞ্জের সমস্ত মানুষ শঙ্কিত। খালের পাশে লোকজন আছে। অবস্থা তেমন দেখলে হাঁকডাক দেবে।

কবির সাহেব সন্ধ্যা থেকেই চান্দর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। সকালবেলা বৃষ্টিতে তেজা ঠিক হয়নি। জ্বর এসে গেছে। গলা ব্যথা করছে। চোখ গিলতে পারছেন না। বয়সের লক্ষণ শরীর বলছে-এখন আর আমাকে দিয়ে ঠাট্টা করা করিয়ে নিতে পারবে না। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে।

শওকত ঘুরছে শুকনো মুখে। তার খুব ইচ্ছা একজন ডাক্তার নিয়ে আসে। কবির সাহেব রাজি নন। সামান্য জ্বর জারিতে ডাক্তার কি? তাছাড়া এ গ্রামের ডাক্তার নেই।

কিছু পানো যেতে হবে ফটিকখালি। কোন অর্থ হয় না। শওকত কাচু মাচু মুখে বলল,
একটু ভিজাইয়া দেই খান।

না।

কিটো বানাইয়া দেই? দুধ দিয়া চিনি দিয়া খান।

না-তু খাব নারে শওকত। তুই যা পানির অবস্থাটা কি খোঁজ নিয়ে আয়।

না খাইয়া থাকবেন সারারাইত?

তাঁ। একটা কথা মন দিয়া শোন শওকত। এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পেটে ক্ষিধে
মরে খুমুতে গেছে। সুস্থ মানুষ। আর আমি অনুস্থ। খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি
একটো-না খেলে কিছু যাবে আসবে না।

কবির সাহেবের মন অন্য একটি কারণেও বেশ খারাপ। ঢাকা থেকে নীলু হঠাৎ করে
ঢাকা দৌর্য একটি চিঠি লিখেছে। সে চিঠিতে শাহানার সেকেন্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাসের
বৃত্তান্ত সঙ্গে তার বোন বিলুর মৃত্যু সংবাদ আছে। শেষ লাইনটিতে সে লিখেছে, মামা
আপনিতো অনেক জ্ঞানী মানুষ আপনি আমাকে বলেন এত কষ্ট কেন মানুষের? চিঠি পড়ে
চিনি চোখ মুছেছেন। এটাও বয়সের লক্ষণ। মন দুর্বল হয়ে গেছে। সামান্যতেই চোখ
জ্বলতে ওঠে।

দুপুর রাতে শওকত খবর নিয়ে এলো পানি কমতে শুরু করেছে। এই খবরের
খানদেই সম্ভবত কবির সাহেবের জ্বর কমে গেল। তিনি হাসি মুখে বললেন, একটু যেন
পানি লাগছেরে শওকত।

ভাত খাইবেন?

দে চারটা ভাতই খাই। তরকারি কী?

খইলশা মাছ ডেকা দিয়া রাখছি। মাষের ডাইল আছে।

খেয়েই ফেলি চারটা।

খেতে খেতেই তিনি মনস্থির করলেন, আগামী কাল ভোরে ঢাকা যাবেন। সুখী
নীলগঞ্জের কাজে হাত দেয়া দরকার। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

শওকত।

জি স্যার।

ঢাকা যাব কাল। তুইও চল আমার সাথে।

জি আচ্ছা।

বড় একটা কাজে হাত দিব। সুখী নীলগঞ্জ! নীলগঞ্জের মানুষের আর কোনো দুঃখ
পাকবে না।

শওকত তাকিয়ে থাকল। এই অদ্ভুত মানুষটিকে সে খুব পছন্দ করে। সেও মজলু
মিয়ার মতো মনে মনে ভাবল, আমাদের স্যার খুব পাগলা।

কবির সাহেব যাবেন ঢাকা, ভৈরব রেল স্টেশনে ছাটাকা পড়ে গেলেন। এক গ্রাস
পানি খাবার জন্যে স্টেশনের পাশের এক হোস্টেল টুকেছেন। ক্যাশ বাত্র নিয়ে বসা
মোটাসোটা লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল-যেন ভূত দেখছে। কবির সাহেব বললেন,
গ্রামালিকুম। লোকটি জবাব দিল না।

পানি খাব। এক গ্রাস পানি দেয়া যাবে?

লোকটি লাফিয়ে উঠল। কবির সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না।

স্যার আমি আপনার ছাত্র।

ভালো আছ বাবা?

আমার নাম স্যার ফজল। ফজল পা ছুঁয়ে সালাম করল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। পানির গ্রাসের জন্যে নিজেই ছুটে গেল। কিন্তু ফিরে এলো পানি ছাড়াই।

স্যার বাড়িতে চলেন। বাড়িতে পানি খাবেন। কাছেই বাড়ি, দুই মিনিট লাগবে।

ঢাকার গাড়ি ধরব ফজল।

আমি স্যার গাড়িতে তুলে দেব।

পানিটা এখানেই খেয়ে গেলে হত না?

বাড়িতে খাবেন স্যার।

ফজল, কবির সাহেবের হাত থেকে ব্যাগ প্রায় ছিনিয়ে নিল। কবির সাহেব হাঁটতে শুরু করলেন। এ জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় তার ছাত্র বের হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তাকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়। একবার শান্তাহার যাচ্ছিলেন ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। টিকেট চেকার উঠেছে। টিকিট নেই যাত্রীর সংখ্যাই বেশি। টিকেট চেকার দিব্যি বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে এক টাকা দুটাকা করে নিয়ে নিচ্ছে। তার ডাব দেখে মনেই হচ্ছে না যে কাজটা অন্যায় এবং এরকম প্রকাশ্যে করাটা ঠিক হচ্ছে না। এক পর্যায়ে কবির সাহেব বললেন, আপনি কি করছেন এসব? টিকিট চেকার রাগী মুখে তার দিকে ডাকাল পরমুহূর্তেই তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে থেমে বলল, স্যার আপনি? স্নেহে এগিয়ে এসে সালাম করল।

তুমি কি বাবা আমার ছাত্র?

জি স্যার।

তুমি তো আমাকেও লজ্জা দিলে। তোমার মতো ছাত্র তৈরি করল যে মাস্টার সে কেমন মাস্টার?

টিকিট চেকার গাড়ির দরজার কাছে মুখ কামুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কবির সাহেবের নিজেরই একটু খারাপ লাগতে লাগল। কিছু না বললেই হতো। মুখের কথায় কি আর অন্যায় বন্ধ হয়? দোষতো তার একার নয়। লোকগুলি বিনা টিকিটে উঠল কেন? প্রথম অন্যায় তো করেছে যাত্রীরা। দেশের সব মানুষই কি অসৎ হয়ে যাচ্ছে? নীতিবোধ নেই। ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই।

শান্তাহার স্টেশনে ট্রেন বদলের জন্যে কবির সাহেব নামলেন। টিকিট চেকার ছাত্র এসে উপস্থিত। কথা নেই বার্তা নেই, স্যাটকেস উঠিয়ে নিল ছাত্র।

ব্যাপার কি?

বাসায় যেতে হবে স্যার।

আমিতো রংপুর যাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি।

রাতের বেলা যাবেন স্যার। রাতে একটা ট্রেন আছে।

আজ বাবা বাদ দেয়া যায় না?

না স্যার। আমার অনেক দিনের শখ আপনাকে সাথে নিয়ে একবেলা চারটা ভাত
খাব। আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেননি।

না।

আপনি স্যার পুরো এক বছর আমার কলেজের পড়ার খরচ দিয়েছেন। প্রতি মাসের
শেষে আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসতাম।

গেতে হলো তাকে। গিয়ে মনে হলো ছেলেটি তাকে ইচ্ছে করেই বোধ হয় এনেছে।
শিলাল পরিবার। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে ছাড়াও তিনটি বড় বড় বোন, দুটি ভাই
এবং মা। সবাই মিলে দু'কামরার রেলের কোয়ার্টারে আছে। কবির সাহেবের বেশ
খ্যাতিপ হইছে গেল। ছেলেটি রাতে তাকে ট্রেনে তুলে দিল। মৃদু স্বরে বলল, স্যার বড়
আছি। আপনি স্যার আমাকে বলেন, আমি কি করব।

তিনি কিছু বলতে পারলেন না। মাঝেমাঝে দারুণ সব অস্বস্তিতে পড়তে হয়।

ভরবেও এই জাতীয় অস্বস্তি হলো। পানি খেতে গিয়ে তিনি আটকা পড়ে গেলেন।
কিছু বড়ো বাড়ি তাঁর পছন্দ নয়। ফজল সেই জিনিসটিই করতে লাগল। তাকে
সহিয়ে রেখে-একটু আসি স্যার বলেই উধাও হয়ে গেল এবং ফিরে এল প্রকাণ্ড একটা
মোহ নিয়ে। কবির সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। তার ঢাকা যাবার দরকার।



দুপুরবেলা পিওন একটি রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেছে। খামের উপর লেখা- নীলুফার
ফাসমিন। ইংরেজিতে টাইপ করা ঠিকানা। নীলু খুবই অবাক হলো। কে তাকে রেজিস্ট্রি
চিঠি দেবে? বিয়ের আগে চিঠি আসত। আজ্ঞেবাজে সব কথাই চিঠি। তোমাকে আজ
দেখলাম কলেজে যাচ্ছে কেন কোনো রাজকন্যা পথ ভুলে এসেছে। জানো, তোমার কথা
ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুম হয় না। রাত জেগে জেগে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ি
তবু তার কবেরকার.....। এই চিঠিও সেরকম কিছু নাকি?

নীলু ভয়ে ভয়ে খাম খুলল। ইংরেজিতে টাইপ করা একটা চিঠি। মার্ক এন্ড ফিসার
এব জেনারেল ম্যানেজার লিখছেন, তোমাকে জানান যাচ্ছে যে, মার্কস এন্ড ফিসার-এর
পাবলিশিং ডিভিশনে জুনিয়র প্র্যাপ্রেনটিস অফিসার হিসেবে তোমাকে নিয়োগপত্র দেয়া
হচ্ছে। চাকরির শর্তাবলি নিম্নরূপ। শর্ত পছন্দ হলে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে
কাজে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সহজ ইংরেজি, অর্থ না বোঝার কিছু নয়, তবু নীলু বুঝায় কিছু ঢুকছে না। সে
পব পর চারবার চিঠিটা পড়ল। মার্কস এন্ড ফিসার চাকরির জন্যে সে কোনো দরখাস্ত
করেনি। মার্কস এন্ড ফিসার কেন কোথাও করেনি? ফিসার চাপাচাপিতে সে তার মামার
কাছে গিয়েছিল। চাকরির চেষ্টা বলতে এইটুকুই। বন্যা অবশ্যি একদিন এসে সাদা
কাগজে তার দস্তখত নিয়ে গেছে। সার্টিফিকেট মার্কশিট নিয়েছে ফটো কপি করবার

জানো। কোথায় কোথায় নাকি পাঠাবে। তাই দেবেই চাকরি হয়ে যাবে। ইস্ট টিষ্টারভূ কিছু লাগবে না? বাংলাদেশ, এরকম সোনার দেশ হয়ে গেছে।

নাকি কোনো রহস্য আছে এর মধ্যে। হয়তো এই নীলুফার ইয়াসমিন সে নয়, কেউ। ভুল ঠিকানায় এসেছে। কিংবা ফাঁটান পেতেছে কেউ সে জয়েন করতে। আমি তাকে ধরে পাচার করে দেবে পাকিস্তানে কিংবা সিন্ধাপুরে। গতকালের পত্রিকা আছে দশটি মেয়েকে পাচার করেছে পাকিস্তানে। ধরা পড়ে তারা এখন আছে লাহো। এক জেলহাজতে। একটি মেয়ের ছবিও ছাপা হয়েছে। কেমন বউ বউ চেহারা। দেখা আদর করতে ইচ্ছে করে। কুমা নাম।

সারাটা দুপুর নীলুর কাটল অস্বস্তিতে। চিঠিটা কাউকে দেখানো যাচ্ছে না। ব্যাংক রফিক অবশ্য আছে। তাকে এখনি কিছু বলা ঠিক হবে না। হৈ চৈ চোঁচামেচি করবে। ব্যাপারটা পুরোপুরি না জেনে কাউকে কিছু না বলাই ভালো। বন্যাকে টেলিফোন করা যায় অবশ্য। সে সবচে' ভালো বলতে পারবে। রশীদ সাহেবের বাসায় নয় টেলিফোন এসেছে। বন্যার টেলিফোন নাম্বারও লেখা আছে। কিন্তু দুপুরবেলায় বেকাল গেলেই মনোয়ারা হাজারটা প্রশ্ন করবেন, কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে। দরকারটা নি তবে মনোয়ারা খাওয়া দাওয়া শেষ হলেই ঘুমুতে যাবেন। সেই সময় যাওয়া যায়। নী তার শাওড়ির ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বন্যাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। মার্কস এন্ড ফিসারে কথা শুনেই বলল, সে অফিসেই তো তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার অফিস। নামটাও মনে নেই? গাধা নাকি ভুই?

জয়েন করব?

করবি না মানে? এত ঝামেলা শুধু শুধু করলাম? কতবার যে আমি আমার কান্ট গিয়েছি সেটা আমি জানি আর মামা জানে।

আমার কেন জানি শুধু ভয় ভয় লাগছে।

ভয় ভয় লাগার কি আছে এর মধ্যে?

অফিসের চাকরি, পারকটোরব না, সবায় বকা বাব।

বাজে কথা বলিস না। চড় খাবি।

বাসার সবাই কিভাবে নেবে কে জানে।

যেভাবে ইচ্ছা নিক। কিছুই যায় আসে না।

শাওড়ি হয়তো রেগে যাবেন।

বেতন পেয়ে তাকে একটা গরদের শাড়ি কিনে দিস দেখবি সব ঠাপ জল হয়ে গেছে। উঠতে-বসতে তখন শুধু বৌমা বৌমা করবে।

বন্যা খুব হাসতে লাগল। এটা কোনো হাসির ব্যাপার না। হয়ত শেষ পর্যন্ত সফিকই বলে বসবে- এত ছোট বাক্যকে রেখে চাকরি করবে কি? ওকে কে দেখবে? তাহাড়া সে রাজি হলেও নীলু কি পারবে টুনীকে রেখে অফিস করতে?

রফিক বাসায় ফিরল নটার দিকে। তার মনটন ভালো নেই। চাকরির ব্যাপারে একজনকে ধরার কথা ছিল। ধরা যায়নি। এক্ষুণি আসবেন এক্ষুণি আসবেন করে গুরা

বসিয়ে রেখে বলেছে আজ মঙ্গলবার খেয়ালই ছিল না। মঙ্গলবারে তিনি
আপনি ভাই মঙ্গলবার ছাড়া অন্য যে কোনোদিন আসেন। রফিক বহু
কাল বলেছে, আমি কাল আসব। কাল গেলেও লাভ হবে না। তবু যেতে
কাল লোক একজন মন্ত্রী ফুপাতো ভাই। তাকে ধরে মন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছতে

রফিক হাসায় ফিরেই খেতে বসল। তার খুব ক্ষিপে পেয়েছে।

কাল খান আলু ভাজা? অত্যন্ত উচ্চমানের খাবার দেখছি ভাবী। নীলু বলল, বাজার
খাস।

ককটা ডিম ভেজে নিয়ে এসো।

কিছু নেই ঘরে। থাকলে ভেজে দিতাম।

কাকটা পুট সবিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ককটা ফালতু জিনিস আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব না।

না খেয়ে থাকবে?

কক। খাবার যা দিয়েছ সেটা খাওয়া আর না খাওয়া সমান।

নীলু আর কিছু বলল না। রফিকের মধ্যে এই ছেলেমানুষীটা আছে। এই বয়সে
কক নিয়ে রাগ করে কেউ? মনোয়ারা এসে বললেন, রফিক কি না খেয়ে চলে গেল
কক।

কি।

কক। তাই তো সে এসব আজবাজে খাবার খেতে পারে না। একটা ডিম এনে রাখলে
কক।

কক। দিয়ে আনাব বলেন? বাবার পায়ে বাখা, শুঁখে আছেন। ও এখনো অফিস
কক থেকেছেন।

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বললেন, কি মুখে মুখে তর্ক করছ। আনিস ছোড়াটাকে
কক। তো এনে দেয়। চেষ্টা থাকলে একটা উপায় হয়। সেই চেষ্টাই নাই।

নীলু কিছু বলল না। মনোয়ারার মেজাজ চড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত
কক। গিয়ে পড়ল রফিকের উপর-সম্রাট জাহাঙ্গীর। মোঘলাই খানা ছাড়া খেতে পারেন
কক। পনের উপর খাওয়া তো টের পার না। নিজের রোজগারে যখন খাবে তখন বৌমা,
কক। দরবে আলু ভর্তা দিয়ে সোনামুখ করে ভাত খাচ্ছে। শাহানশাহর জন্যে দুপুর রাতে
কক। ডিম কিনে আনতে হবে। কি আমার ডিম খানোয়লা।

নীলু মৃদুস্বরে বলল, মা ও শুনবে।

দানলে শুনবে। আমি কি ওর রাগের ভোয়াক্তা করি? কান ধরে ধাক্কা করে দেব না?
কক। নাকরি না পেয়ে তেল বেশি হয়ে গেছে। তেল কমানো দরকার।

রফিক শোবার আয়োজন করছে। নীলু এসে দরজার কাছে দাঁড়াল, ঘুমিয়ে পড়েছে
কক।

মা।

আসব ভেতরে?

টেকে করলে আসতে পারো।

নীলু ভেতরে ঢুকল। রফিকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। মনোয়ারার কাঁটা কাটা নিশ্চয়ই কানে গিয়েছে। নীলু বলল ক্ষিধে নিয়ে ঘুম আসবে না। ভাত দিয়েছি, আসো। রফিক জবাব দিল না।

তোমার বিখ্যাত ডিম ভাজাও আছে। অনিসকে পাঠিয়ে ডিম আনানো হয়েছে। এমন ছেলেমানুষী করে রফিক? এসো, পিঁজ।

রফিক খাবার ঘরে এলো কোনোরকম আপত্তি না করেই। নীলু খেতে রফিকের সঙ্গে।

তুমি খাওনি?

না।

রফিক হালকা গলায় বলল, সব সময় এমন ভালো মেয়ে সাজতে চাও কেন? আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার ছিল না।

নীলু কিছু বলল না। রফিক গম্ভীর গলায় বলল, ধরো আমি যদি রাতে না যে তুমিও কি না খেয়ে থাকতে?

কি জানি। জানি না।

না না বলতে হবে তোমাকে।

আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে আমি খেয়ে নিতাম।

দ্যাটস ওড। বাঙালি মেয়েদের একটা প্রবণতাই হচ্ছে ডালোমানুষীর ভান ক' ভান আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। তোমার মধ্যেও প্রচুর ভান আছে।

আছে নাকি?

অককোর্স আছে। থাকতেই হবে।

নীলু প্রসঙ্গ পাল্টে মৃদুস্বরে বলল, খবর আছে রফিক।

খারাপ খবর না ভালো খবর?

বুঝতে পারছি না।

বলো শুনি।

আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

কি পেয়েছ?

চাকরি। মার্কস এন্ড ফিসারে জুনিয়ার এ্যাপ্রেন্টিস অফিসার। বেসিক পে শোল। টাকা। হাউস রেন্ট আছে, মেডিকেল আছে, যাতায়াতের জন্যে এ্যারাউন্স আছে।

ঠাট্টা করছ তুমি।

না ঠাট্টা না। ঋণা শেষ করো, এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখাও। রফিক অবাধ্য হয়ে তাকিয়ে রইল।

সত্যি বলছ ভাবী?

হ্যাঁ। আজই পেয়েছি। কাউকে বলিনি এখনো।

ডাইয়াকেও না?

না। তাকে বলব ভেবেছিলাম। সে এসেই পড়েছে, তার শরীর ভালো না ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

ডাইয়াকে ডেকে তোলাও এবং খবরটা দাও, দেখবে সে চান্স হয়ে উঠবে।

গণ দু'এক করে রইল। রফিক বলল, ভাইয়ার জন্যে এটা যে কি পরিমাণ বিলিফ হবে
তুমি বুঝতে পারছ না। ভয়ে আধমরা হয়ে আছ। ভাইয়াকে খবরটা দাও, দেখবে সে
তোমার পিঠের ধরে অরিয়েন্টাল ডান্স দেবে।

গণ খেসে ফেলল। রফিক বলল, এখন থেকে ভাবী আমার চাকরি না হওয়া পর্যন্ত
তোমার দু'শ টাকা করে হাতখরচ দেবে। তোমার নিজের বেতনের টাকা থেকে
তোমার খরচা অবস্থা টাইট।

সফিক জেগেই ছিল। নীলু দেখল টুনীকে সরিয়ে একপাশে দেয়া হয়েছে। সফিক
নীলুর জন্যে জায়গা রেখেছে। নীলু একটি দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করল। সমস্ত
চলারচলির মধ্যে অপমান এবং অবহেলা আছে। আজ রাতে সফিকের নীলুকে প্রয়োজন,
টুনীকে এক পাশে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আগামীকাল এই প্রয়োজন হয়তো
কোনো না, টুনী ঘুমুবে দু'জনের মাঝখানে।

সফিক বলল, কটা বাজে?

গারোটা দশ। ঘুমুওনি এখনো?

তুমিয়েই ছিলাম হঠাৎ ঘুম ডেঙে গেল।

সফিক নীলুকে তার কাছে টানল। নীলু মৃদু করে বলল, আমি একটা চাকরি নিলে

কোন হয়?

এটা চাকরির কথা বলছ কেন?

কেনো না কেমন হয়? অনেকগুলি বাড়তি টাকা আসে সংসারে। যা অবস্থা।

সফিক হালকা গলায় বলল, চাকরিটা তোমাকে দেবে কে? বাজারের অবস্থা তো
কোনো না। রফিককে দেখছে না। এম.এ. পাস করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

নীলু বলল, আল্লা ধরো, যদি পাই তাহলে?

তাহলে কি?

তাহলে কি চাকরিটা নেব?

তোমার শখ হলে নেবে।

শখ বলছ কেন, এটা কি প্রয়োজন না?

সফিক কিছু বলল না। চাকরির প্রসঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে তার ইচ্ছে করছে না।

গারো ব্যক্তি নিভিয়ে ঘুমুতে গেল একটার দিকে। বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। কমকম শব্দ হচ্ছে
বৃষ্টির। এ বৎসর বর্ষা নেমেছে ভালো।

নীলু টুনীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমি কিন্তু চাকরি একটা পেয়েছি।
আমি এত ফিসারে। আমার এক বন্ধু বন্যা, সে ছোঁগাড় করে দিয়েছে।

সফিক কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শুধু।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়েন করবার কথা। জয়েন করব?

চাকরি পেয়েছ এই কথাটা আগে বললেই পারতাম। এত ভণিতা করছিলে কেন?

তোমার কি ইচ্ছা না আমি চাকরী করি?

ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার না। চাকরি করতে চাও করবে। ভণিতা করবে না।

মেয়েলী ভণিতা আমার ভালো লাগে না।

মেয়েমানুষ মেয়েলী ভণিতাই তো করব।

আর কোনো কথা হলো না। রাত বাড়তে লাগল। কমকম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। প্রাণ শব্দে বাজ পড়ল কাছেই। ছোট টুনী ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠল। নীলু তাকে কাছে টেনে নিল। মনে মনে বলল, পৃথিবীতে কেউ যদি আমাকে ভালো না বাসে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। ভূই ভালোবাসবি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালোবাসার আমার দরকার নেই। একজনের ভালোবাসা পেলেই হবে।

নীলুর ঘুম আসছে না। সমস্ত শরীরে ক্রান্তি অথচ চোখে ঘুম নেই। নীলু মনে মনে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, বুখলি টুনী, আমি খুব একজন অসুখী মানুষ। বাইরে থেকে সেটা কেউ বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে-বাহু নীলু মেয়েটা তো খুব সুখী হয়েছে। স্বামী-কন্যা স্বস্তর-শাতড়ি নিয়ে কি চমৎকার মিলেমিশে আছে। এরকম সুখ কিন্তু আমি চাইনি রে পাগলি। আমি অন্য রকম সুখ চেয়েছিলাম। এমন একজন স্বামী চেয়েছিলাম যে সব সময় তার পাশে আমার জন্যে জায়গা রাখবে। শুধু বিশেষ বিশেষ রাতে রাখবে না।

আজ নীলুর একটি বিশেষ দিন। চাকরিতে যোগ দেবার তারিখ। সাড়ে নটায়া সফিক বলল, এসো খেয়ে নেই। নীলুর লজ্জা করতে লাগল। সে বলল, তুমি খেয়ে নাও। খাবে না?

ইচ্ছা করছে না। ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নেব।

খেতে বসল সফিক একাই। নীলু বসল তার সামনের চেয়ারে। মনোয়ারা বাবার এগিয়ে নিচ্ছে তার মুখ গম্ভীর। তিনি নীলুর দিকে একদারও তাকাচ্ছেন না। সফিক বলল, এবারে বসে আছ কেন? তৈরি হও।

নীলু তৈরি হয়েই ছিল। তবু উঠে পড়ল। হোসেন সাহেব শোবার ঘরে বসে পত্রিকা দেখছিলেন। নীলুকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাসি মুখে তাকালেন, তৈরি নাকি মা? হ্যাঁ।

নীলু পা ছুঁয়ে সালাম কবল। হোসেন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, ফি আমানুল্লাহ মা। ফি আমানুল্লাহ। নীলু একটু ইতস্তত করে বলল, বাবা, আমার এই চাকরি করতে যাওয়া নিয়ে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে? হোসেন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আপত্তি থাকবে কেন?

মা বোধহয় খুব একটা পছন্দ করছেন না।

এখন না করলেও পরে করবে।

উনার উপর অনেক কামেলা পড়বে।

সহ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া টুনীতো বিরক্ত করে না। আমি দেখছি টুনীকে।

যাই তাহলে বাবা।

যাও মা। দশ বার ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা আগের দিকের ঘর থেকে বেরুবে।

মনোয়ারা শেষ পর্যন্ত গম্ভীর হয়েই রইলেন। বৌয়ের চাকরির ব্যাপারটি তিনি গোড়া থেকেই অপছন্দ করে এসেছেন। সফিককে বেশ কয়েকবার বলেছেনও। কিন্তু সফিক কোনো উত্তর দেয়নি। যেন এ ব্যাপারে তার কোনো বক্তব্য নেই। কিছু জিজ্ঞেস করলে সফিক এমন ভাব কবে যেন এর উত্তর দেয়াটা জরুরি নয়। গতকাল রাতেই তিনি

রফিককে ডেকে বললেন, আমি এই বয়সে সংসার সামলাব কি করে? সফিক হাই তুলে
বললো, অসুবিধা হবে না। কাজের একটা লোকতো আছে।

এ লোককে আমি এক্ষুণি বিদায় করব।

কেন?

এ বড় একটা জোয়ান কেউ রাখে বাসায়? কোনো দিন সবাইকে খুন করে
কিনিসপত্র নিয়ে ভাগবে।

তাহলে তোমারই অসুবিধা হবে মা।

লোক অসুবিধা।

মনোয়ারা কাজের লোকটিকে সত্যি সত্যি বিদায় করে দিলেন। এতেও সফিক কিছু
বলল না। ছেলেদের সংসারে থাকার কাল কি তাঁর শেষ হয়েছে? বোধ হয় হয়েছে।

রফিক নীলুকে অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। সে তার স্বভাব মতো বক বক
কথা বলতে লাগল। নীলুর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না, তবুও বলতে হচ্ছে। রফিক সঙ্গে থাকলে কথা
বলতে থাকা মুশকিল।

কি ভাবী গুমি হয়ে আছ কেন? আজকে তোমার খুশির দিন। আনন্দ-ফুর্তি করো।

কি আনন্দ-ফুর্তি করব?

গানটান গাও।

কি যে পাগলের মতো কথা বলো।

আমি হলে তাই করতাম। রিকশায় যেতে যেতে গান ধরতাম, কি আনন্দ চারিধারে।

কি আনন্দ চারিধারে।

তুণীকে ছাড়া এতক্ষণ থাকতেই পারব না। খুব পারবে। আর এত ভয় পাচ্ছ কেন?
কি সবারই দেখব। চোখে চোখে রাখব।

সারাদিনতো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। তুমি আবার চোখে চোখে কি রাখবে?

আমি না রাখলেও অন্যরা রাখবে।

রফিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নেমে গেল। মতিঝিল পর্যন্ত তার যাবার কথা কিন্তু
সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এমনভাবে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল যেন খুব জরুরি কোনো
কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়েছে। অথচ তেমন কোনো কাজই নেই। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে
এই হাঁটার মধ্যেই পরিচিত, অর্ধপরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হওয়া।

এ্যাই রফিক না?

ই।

চিনতে পারছিস?

না।

বলিস কি আমি ইয়াসিন। কলেজে তোর সঙ্গে পড়তাম।

ও ইয়াসিন। আছিস কেমন?

ডালো। এখন বিটসিতে আছি।

ওড।

বেতনপত্র মন্দ না। তিনটা বোনাস আছে। আসিস একদিন আমার এখানে সিগারেট দেব। খাস তো সিগারেট?

হাই।

আসিস তাহলে অফিসে।

আচ্ছা আসব।

অফিস কোথায় কিছুই না বলে চলে গেল ইয়াসিন। অনেক দিনের পুরনো পরিচিতদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু অবশি আশা করা যায় না। ইউনিভার্সিটি বন্ধুরাই যেখানে দায়সারা গোছের কথা বলা শুরু করেছে। সেদিন করিমের সঙ্গে দেখা। সুন্দর একটা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে নিউমার্কেটে ঘুরছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বলে দেয়া যায় নতুন বিয়ে। সঙ্গের মেয়েটি তাঁরই স্ত্রী অন্য কারোর নয়, এটা বোঝানোর প্রবল চেষ্টা। গর্বিত দৃষ্টি। রফিক দূর থেকে ডাকল-করিম নাকি?

করিম অনুসাহের সঙ্গে এগিয়ে এলো। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারত, তা এলো না। সুন্দরী মেয়েটি ঘাড় কাত করে বইয়ের দোকানে বই দেখতে লাগল।

কিরে বিয়ে করেছিস নাকি?

হুট করে হয়ে গেল। কাউকে খবর দিতে পারিনি। তুই আছিস কেমন?

ভালোই।

দাড়িটারি যেভাবে বড় করছিস-দরবেশ হয়ে যাচ্ছিস মনে হয়।

চেষ্টা করছি।

চাকরি বাকরি?

হবে হবে করছে। যা তুই, তোর বউ বিরক্ত হচ্ছে।

করিম প্রায় ছুটে গেল তার পুতুল পুতুল স্ত্রীর কাছে। সময় বদলে যাচ্ছে। পুরনো বন্ধুত্বের গাঁথুনী আঁলগা হয়ে যাচ্ছে। আর পাঁচ বছর পর একজন অন্যজনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলবে, কেমন ভালো? ব্যস ফুরিয়ে গেল।

দুপুরে রফিক নীলুর খোঁজ নিতে গেল। হাসি মুখে বলল, দেখতে এলাম কাজকর্ম কেমন আগাচ্ছে।

নীলুর জন্যে ছোটখাটো ছিমছাম একটা ঘর। টেবিলের উপর একটা টেলিফোন। রফিক চোখ কপালে তুলে বলল, টেলিফোনও আছে নাকি?

সবার টেবিলেই আছে। পিবিএস। ডিরেক্ট লাইন না।

খুব মালদার পার্টি মনে হচ্ছে।

নীলুর লজ্জা করতে লাগল।

কাজকর্ম শুরু করেছে নাকি?

না। প্রথম দিন কাজকর্ম কিছু নেই। এটা-ওটা শিখছি। দুপুরবেলা ঘুরঘুর করছি কেন বাসায় গিয়ে ঝাওয়া-দাওয়া করো।

তোমাদের এখানে ঝাওয়ার ব্যবস্থা নেই? ক্যান্টিনফ্যান্টিন কি আছে?

আছে। চলো যাই।

ক্যান্টিন দেখে রফিক মুগ্ধ হয়ে গেল। নীচু গলায় বলল, কাজ করলে এইসব বিদেশি

কাজ করতে হয়। তুমি ভাবী আমার জন্যে একটু ট্রাই করবে। বসটসদের
কাজে বলবে আমার কথা।

কি আমার কথা শুনবে?

শুনবে না। শুনুক বৎসর খানিকের মধ্যেই শুনবে। তোমার কাজকর্মে খুশি হয়েই ওরা

শুনবে। শুনতেই হবে।

তোমা-এ ধারণা আগামী এক বৎসরের মধ্যে তোমার চাকরি হচ্ছে না।

কিন্তু যা দাঁড়িয়েছে তাতে সে রকমই মনে হচ্ছে। অবস্থা সুবিধার না ভাবী।

হাল হেঁড়ে দিচ্ছ নাকি?

এখনো ছাড়িনি। ধরেই আছি। তবে ধরে থাকতে থাকতে হাত বাধা হয়ে গেছে।

কাজে উঠে দাঁড়াল। নীলু বলল, যাচ্ছ কোথায় এখন?

এক বন্ধুর বাসায়।

এখন কি কারো বাসায় যাবার সময়?

আনএমপুয়েডদের সময়-অসময় বলে কিছু নেই।

তোমার বন্ধুও কি আনএমপুয়েড?

কোনো কোনো জবাব দিল না। সে হেঁটে হেঁটে চলে এলো পুরনো ঢাকায়।

কাজীদের বাসায় যাবার তার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তবু সে কেন জানি

পুশোনায়া উপস্থিত হলো সেখানে। কাজের মেয়েটি বলল, আপা ঘুমাইতাহে। ডাকুম।

না কোনো দরকার নেই। আমি অপেক্ষা করব। ঘুম ভাঙলে খবর দিও। পত্রিকা বা

ল্যান্সিও কিছু থাকলে দিয়ে যাও, বসে বসে পড়ি।

গড়লোকদের বাড়ির কাণ্ডকারখানাই অন্য রকম। কাজের মেয়েটা ন্যাশনাল
নিউজপ্যারের লেটেস্ট সংখ্যাটি দিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে চা এবং কেকও এসে গেল।

এতে খেতে পত্রিকা ওল্টাতে ভালোই লাগছে। চমৎকার সব ছবি। বিদেশি

লাঞ্চারগুলি ছবি দেখার জন্যেই বের হয় সম্ভবত। একটি এ্যাক্সিমো পরিবারের ছবি দেখে

কান্না মুক্ত হলো। বাস্তবের সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। দেখেই মনে হয় চমৎকার একটি

জীবন এদের। পাশ করে চাকরি খুঁজতে হয় না। বাড়ি বানানোর জন্যে জমি কিনতে হয়

না। যেখানে পছন্দ সেখানে বরফের একটা ঘর বানিয়ে নিলেই হলো। রাতে তিমি মাছের

চেনের বাতি জ্বালিয়ে সবাইকে নিয়ে গল্পগুজব চলবে। বাইরে হু হু করে বইবে তুষার

পড়। চমৎকার একটা জীবন। রফিক একটি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

আরে তুমি কখন এসেছ?

এইত কিছুক্ষণ।

আমাকে ডাকোনি কেন?

সারা দুপুর ঘুমিয়ে শারমিনের চোখ ভারী হয়ে আছে। এলোমেলো করে পড়া শাড়ি,
চণ বাঁধা নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে দৃশ্যটি এত সুন্দর।

চা দিয়েছে?

হঁ।

কোনো কাজে এসেছ না এমনি এসেছ।

এমনি এসেছি।

এসো আমার সাথে ।

কোথায়?

আসতে বলছি আসো ।

শারমিন তাকে নিয়ে এলো দারোয়ানের ঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে । মাটি আছে সেখানে । শারমিনকে ঢুকতে দেখে এক ধরনের ঘর্ষর শব্দ করল । শারমিন মৃদুস্বরে ডাকল, মাটি সাহেব । মাটি মাথা তুলে একবার মাত্র তাকাল তারপরই মাটি নামিয়ে নিল ।

ও বাঁচবে না । এই ঘরেই তার শেষ শয্যা ।

বলতে বলতে শারমিনের গলা ভারী হয়ে এলো । কেন্দে ফেলবে নাকি?

বেচারার এত কষ্ট হচ্ছে । সারা রাত ঘুমায় না । কান্দে শুধু ।

রফিক কিছু বলল না । শারমিন নিচু হয়ে মাটির মাথায় হাত রাখল ।

চাপা স্বরে বলল, পতনের সবচে' বড় কষ্ট হচ্ছে এরা নিজের কষ্টের কথা অন্যকে বলতে পারে না ।

অনেক মানুষও সেটা পারে না ।

বাজে কথা বলবে না । মানুষ ঠিকই পারে । আজ তোমার মনে কোনো কষ্ট হচ্ছে সেটা তুমি কাউকে বলবে না ।

সব কষ্টের কথা কি বলা যায়? কিছু কিছু কষ্টের কথা কখনো বলা যায় না ।

শারমিন বলল, মাটি মারা গেলে আমার খুব কষ্ট হবে । আমার বন্ধু কেউ নেই । মাটিই আমার বন্ধু ।

শারমিন উঠে দাঁড়াল । হালকা গলায় বলল, আজ কিছু তুমি রাতে খাবে এখানে । কেন?

একা একা খেতে আমার খুব খারাপ লাগে । বাবা চিটাগাং গেছেন, কাল আসবেন । তুমি না এলে সাক্ষির ভাইকে আসতে বলতাম ।

উনি আমেরিকায় যাননি?

সামনের সপ্তায় যাবেন । আমার বাসায় আছেন । সাতদিনের জন্যে এসে বেচারাকে দু'মাস থাকতে হলো । মায়ের অসুখ ।

তুমি কি তাকে আপনি আপনি করে বলো?

হঁ ।

কেন, আপনি বলো কেন?

তুমি বলতে কেমন জানি লজ্জা লাগে ।

উনি কিছু বলেন না এ নিয়ে?

খুব একটা বলেন না । হঠাৎ এক আধদিন বলেন ।

বাগানে বসে চা খাওয়া গেল না । টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে । শারমিন বলল, এসো দোতলায় বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখি ।

বৃষ্টির মধ্যে দেখার কি আছে?

দেখার কিছু নেই? কি বলো তুমি?

আমার মধ্যে এত কাব্য ভাব নেই ।

সকাল পর্যন্ত রফিক বারান্দায় বসে রইল। তেমন কোনো কথাবার্তা শুনের মধ্যে
লো। না। শারমিন কেমন অনামনক। কথাবার্তা কিছুই বলছে না। রফিকের হঠাৎ খুব
ক্লান্ত লাগল। কেন সে বার বার ঘুরে ঘুরে এখানে আসে? এটা ঠিক না। কেন সে
আসছে?

শারমিন, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে উঠি।

পেয়ে যেতে বললাম না।

না আজ থাক অন্য দিন।

আজ অসুবিধা কি?

রফিক হাস্তা করে বলল, আজকের রাতটা খুব চমৎকার। তুমি সাক্ষির সাহেবকে
আসতে বল। দুজনে মিলে ঝাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় বসে গল্পটুকু করো।

শারমিন কিছু বলল না। রফিক উঠে দাঁড়াল। অন্য সময় শারমিন আসত তার সঙ্গে
সঙ্গে। ড্রাইভারকে বলত পৌছে দিতে। আজ সে কিছুই করছে না।

রফিক ভিজতে ভিজতেই রওনা হলো। তার বার বার ইচ্ছা করছিল পেছনে ফিরে
শারমিনকে একবার দেখতে। কিন্তু সে তাকাল না। মাটি সাহেব কাঁদছে। বৃষ্টির শব্দের
সঙ্গে সে কান্না মিশে কেমন অদ্ভুত শুনায়।

গেটের দারোয়ান বলল, চলে যাচ্ছেন নাকি স্যার?

হ্যাঁ।

গাড়ি নিয়ে যান। গাড়ি আছে তো। ড্রাইভার চা বেতে গেছে ডেকে নিয়ে আসছি।
ডাকতে হবে না।

রফিক লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল। দারোয়ান শ্রেণীর কারোর গলায় এমন শুদ্ধ
ভাষা শুনতে ভালো লাগে না। কেন লাগে না? এটা কি অত্যন্ত বাজে ধরনের একটা
মানসিকতা নয়? দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এর মধ্যে অবাক হবার কি আছে?
এরা কি রফিকের এখানে আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে?



মনোয়ারা গম্বীর মুখে বললেন, বৌমা আজ অফিসে যাবে না? নীলু হাসিমুখে বলল,
আজ টুণীর জন্মদিন। অফিস যাব না। মনোয়ারা কিছু বললেন না। আরো গম্বীর হয়ে
গেলেন। নীলুর খুব ইচ্ছা টুণীর দ্বিতীয় জন্মদিনটি খুব ভালোমতো করে। প্রথমটি করা
হয়নি। সফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখায়নি। বিরক্ত মুখে বসেছে, জন্মদিন আবার কি?
নীলু বলেছে, আমাদের জন্যে তো না, টুণীর জন্যে।

এক বছরের বাচ্চা ও জন্মদিনের কি বুঝে? বাদ দিও।

এ বছর সে রকম কিছু বলতে পারবে না। টুণীর বয়স এখন দুই। জন্মদিনটি সে
কিছু কিছু বুঝতে পারবে। আর না পারলেও জানবে তাকে ঘিরে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে।

সফিক বলতে পারবে না, টাকা পয়সা নেই। এরজন্যে সে টাকা আলাদা করে রেখেছে।
 তেমন কোনো বড় উৎসব হবে না। একটা কেক কাটা হবে। কিছু ভালো-মন্দ রান্না হবে।
 টুনীকে সঙ্গে নিয়ে সে এবং সফিক একটা ছবি তুলবে ঝুড়িওতে। প্রতি বছর এ রকম
 একটি করে ছবি তোলা হবে। সেই ছবির গ্যালারামটি টুনীর বিয়ের সময় টুনীকে উপহার
 দেয়া হবে। প্রথম জন্মদিনের ছবিটি অবশ্যি তোলা হয়নি।

সফিক অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। নীলু এসে বলল, তুমি কি আজ একটু
 সকাল সকাল আসতে পারবে?

না।

একটু চেষ্টা করে দেখো না।

কেন?

টুনীর আজ জন্মদিন না? তুমি এলে তোমাকে নিয়ে ঝুড়িওতে একটা ছবি তুলব।

সফিক জবাব দিল না। নীলু নরম স্বরে বলল, প্রিজ।

আচ্ছা দেখি।

দেখাদেখি না আসতেই হবে। সন্ধ্যাবেলা কেক কাটা হবে। রাতে একটু খাওয়া
 দাওয়া হবে।

অনেককে বলেছ নাকি?

না বন্যাকে বলেছি। ও তার হাসবেওকে নিয়ে আসবে। আনিসকে বলেছি। আনিস
 ম্যাজিক দেখাবে।

ও ম্যাজিক জানে নাকি?

শিখছে। জানে নিশ্চয়ই। তুমি যদি তোমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে বলতে চাও বলো।

আমার আবার বন্ধুবান্ধব কোথায়?

কেউই নেই?

সফিক জবাব দিল না।

নীলুর ধারণা ছিল সফিককে বাজারে পাঠানো সমস্যা হবে। সে যেতে চাইবে না।
 ইদানীং সে অল্পতেই রেগে ওঠে। বাজারের কথা বললেই নিশ্বাস ফেলে বলে, বাজার
 করাই শেষ পর্যন্ত আমার ক্যারিয়ার হবে। বাজার সরদারের কাজই পাব। অন্য কিছু পাব
 না।

আজ সে খুব অগ্রহের সঙ্গে রাজি হলো। শার্ট পরতে পরতে বলল, সিরিয়াস একটা
 হৈচৈ হবে মনে হয়। বিরাট খাওয়া-দাওয়া নাকি?

বিরাট কিছু না। তোমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে বললে বলতে পারো।

বেকারের কোনো বন্ধুবান্ধব থাকে না। লিফট দাও। কি কি নিয়ে আসতে হবে বলো।
 ঘর সাজানো হবে নাকি।

দাও না সাজিয়ে। বেলুন-টেলুন দিয়ে সাজালে ডাঙাই লাগবে।

সাজিয়ে দিতে পারি তবে একশ টাকা ফিস লাগবে।

দেব ফিস দেব।

সবচেয়ে অগ্রহ দেখা গেল শাহানার মধ্যে। তার উৎসাহের সীমা রইল না। সে
 কলেজে গেল না। নিজেই নিউমার্কেট থেকে রঙিন কাগজ কিনে আনল। হোসেন

১৭৭ পার সঙ্গে জুটে গেলেন। শিশুদের উৎসাহ নিয়ে রঙিন কাগজের শিকল বানাতে
আলগ। বনোয়ারা বিরক্ত মুখে বললেন, তুমি বুড়ো মানুষ রঙিন কাগজ দিয়ে মালা
কিভাবে বানসেছ?

১৭৮ মানুষরা মালা বানাতে পারবে না এরকম কোনো আইন আছে নাকি?
পারবে তর্ক করবে না।

১৭৯ দিন পরে একটা উৎসব হচ্ছে বাড়িতে আর তুমি ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছ
কিভাবে না।

১৮০ ঝগড়া বাধালাম?

১৮১ তো বাধাচ্ছ। আমি এখন একটা কথা বলব তুমি তার উত্তরে দশটা কথা
বলো। তারপর আমি আবার আরেকটা কথা বলব, তুমি তার উত্তরে বলবে বিশটা
কথা।...

বনোয়ারা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মাথা ধরেছে এই অজুহাতে বিছানায় শুয়ে
গেলেন। কোনো ব্যাপারই কোনোরকম আগ্রহ দেখালেন না। নীলু যখন এসে বলল,
মালাওটা একটু বসিয়ে দিন না মা। তখন তিনি ডুক কুঁচকে বললেন, কেন তুমি কি
মালাও বান্না তুলে গেছ নাকি? নীলুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

সফিকের জন্যে সে সেজে গুজে বিকাল থেকেই বসে ছিল। সফিক আসা মাত্র ছবি
দেখতে যাবে। টুনীও খুব আগ্রহ নিয়ে নতুন জামা পরে বসে আছে। সে বার বার বলছে,
বাবা! কখন আসবে? বাব্বা হচ্ছে আব্বা। টুনী কিছু কিছু শব্দ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে।
বাব্বা হলো বাব্বা। পাচ্ছি হচ্ছে পাখি। সে 'বা' পা উচ্চারণ করতে পারে না, তা নয়।
টুনীই পারে।

তবু নতুন শব্দগুলি কেন বলে কে জানে। শিশুদের মধ্যে অনেক দুর্বোধ্য ব্যাপার
থাকে।

সাড়ে ছটা বেজে গেল সফিক এলো না। শাহানা বলল, তুমি একাই টুনীকে নিয়ে
চল তুলে আসো ভাবী, ভাইয়া আসবে না।

বলেছিল তো আসবে।

আসার হলে এসে যেত। চল আমরা তিনজনে একটা রিকশা নিয়ে চলে যাই।
শাহানীতে একটা ভালো ষ্টুডিও আছে।

আরেকটু দেখি।

তবু সফিক নয় বন্যাও আসেনি। নীলুর মন খারাপ হয়ে গেল। এত চমৎকার করে
দেখা সাজানো হয়েছে অথচ লোকজন কেউ নেই। কেউ আসুক না আমাকে সফিক তো
আসবে। হোসেন সাহেব বললেন, টুনী ঘুমিয়ে পড়বে বৌমা কেঁকাই কাটাও। আনিস
ম্যাজিক শুরু করুক, আমরা দেখি বসে বসে। উৎসবটা জমছে না মোটেই। নীলু মৃদু
ধরে বলল, আরেকটু অপেক্ষা করি ও এসে পড়বে।

আনিস চূড়ান্ত রকমের নার্ভাস। আজই তার জীবনের প্রথম ম্যাজিক শো। কে জানে
কি হবে। পাঁচটা আইটেম সে তৈরি করে রেখেছে, আইটেম হিসেবে পাঁচটাই চমৎকার।
আজ সারাদিনে সে প্রতিটি আইটেমই প্রায় এক হাজার বার করে প্রাকটিশ করেছে। তবু
তার মনে হচ্ছে আসল সময়ে একটা কিছু গুণগোল হয়ে যাবে। সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে

তার কোনো কনফিডারেট নেই, যে দর্শকদের মধ্যে বসে থাকবে। প্রয়োজনের লক্ষ্যে বিশেষ সাহায্যটি করবে। এরকম একজন কাউকে পাওয়া গেলে চমৎকার একটা ম্যাচ দেখানো যেত। আনিস চিন্তিত মুখে বীণার সঙ্গে কথা বলতে গেল। বীণাকে বলে দেওয়া যেতে পারে। সে রাজি হবে কি হবে না কে জানে।

বীণা সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, কি করতে হবে বলে দেন, সে প্রবলেম।

বিশেষ কিছুই না, টেবিলের উপর একটা ক্রমালে আংটি লুকানো থাকবে। আংটি আছে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে আংটিটি তুলে নিয়ে আসবে।

তুলে আনবার সময় কেউ দেখবে না?

না। সবার নজর থাকবে ম্যাজিশিয়ানের দিকে। সেই সময় একটা বক্তৃতা শুরু করছি আমি। পারবে না?

পারব না কেন? নিশ্চয়ই পারব।

আনিস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লতিফা বললেন, তোর ও বাড়িতে যাবার কোনো দরকার নেই।

দাওয়াত দিয়েছে, যাব না?

না।

এসব বলে তো মা লাভ নাই। আমি যাব।

লতিফা গম্ভীর হয়ে রইলেন। মেয়েকে আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। কেন জানি তিনি বীণাকে কিছুটা ভয় পেতে শুরু করেছেন। বীণা দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছে। আনিসের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে এই নিয়ে তিনি খুব ভাবেন। তাঁর ধারণা বীণা আনিসকে মাঝে মাঝে এটা-ওটা কিনে দেয়। এই ধারণাটা হয়েছে গত পরশু বীণা একা একা নিউমার্কেটে গিয়েছিল। নিউমার্কেট থেকে ফিরেই সে বেড়াতে গেল ছাদে। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি দেখলেন, আনিস লাল রঙের একটি নতুন চেক শার্ট গায়ে দিয়ে হাসি মুখে নামছে। এর মানেটা কি? সারাটা দিন লতিফার খুব খারাপ কাটল। সন্ধ্যার পর বীণাকে খুব সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আনিসের গায়ে একটা নতুন শার্ট দেখলাম। বীণা হাই তুলে বলল, আমিও দেখলাম। খুব মানিয়েছে।

লাল রঙ ব্যাটা ছেলেরদের মানাবে কি?

লাল হচ্ছে এমন একটা রঙ, যা সবাইকে মানায়।

নিউমার্কেট থেকে তুই কি কিনিনি?

তেমন কিছু না। দু'দিন্ডা কাগজ। একটা বল পয়েন্ট পেন।

এসব কিনার জন্যে নিউমার্কেটে যেতে হলো। সুরমা টোরেই পাওয়া যায়।

তা যায়। তবু গেলাম।

লতিফা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, নিউমার্কেট থেকে ফিরেই ছাদে গেলি কেন?

এমি গেলাম। ছাদে যাওয়া নিষেধ নাকি?

লতিফা একবার ভাবলেন সরাসরি জিজ্ঞেস করে শার্টটা বীণা কিনে দিয়েছে কিনা। সাহস হলো না। ঘরে একটা বড় মেয়ে থাকায় কত যে সমস্যা। চোখের আড়াল হলেই

বীণা গিয়েছে শাহানাদের ওখানে, ঘণ্টা খানিকের ব্যাপার তবু ভালো
আনিসটাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দিতে পারলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত।
শাহানাদ নিশ্বাস ফেললেন।

টুনি এসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। রফিক বলল, ভাবী আমি টেলিফোন করে
একটা অফিসে আছে কিনা। টেলিফোনের কথাটা নীলুর মনে আসেনি। আগেই
স্বপ্ন দেখা যাবে।

এতটুকু করবে? রশীদ সাহেবের বাসা থেকে?

না চান ফার্মেসি থেকে, চেনা লোক আছে। ভাইয়ার টমী অফিসের নাম্বার তোমার
কেন্দ্রে আছে?

না।

হ্যাঁ আছে আমি বের করে নেব।

টুনাকে শুয়ে দিতে গিয়ে নীলুর চোখে পানি এসে গেল। মানুষ এমন হয় আশ্চর্য।
কিন্তু চেষ্টা করতে লাগল বাতি টাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকে টুনির পাশে। কিন্তু তা সম্ভব
না। তাকে হাসি মুখে সবার সামনে ঘুরে বেড়াতে হবে। আনিসের ম্যাজিক দেখতে
পাবে।

ভাবী।

না শাহানা?

তাড়াতাড়ি এসো কে একজন মেয়ে এসেছে আমাদের বাসায়ে। পবীর মতো সুন্দর।
না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না। উপহারের প্যাকেট আছে হাতে।

কিন্তু নাকি।

করে না। উনাকে বুঝি আমি চিনি না? তুমি তাড়াতাড়ি আস।

নীলুও তাকে চিনতে পারল না। মেয়েটি বিব্রত মুখে বলল, আমার নাম শারমিন।
কিন্তু সসে পড়ি। ও আমাকে দাওয়াত দিয়েছে, টুনির নাকি জন্মদিন।

হ্যাঁ। তুমি বস।

আপনি ওর ভাবী?

হ্যাঁ।

আমি সবাইকে চিনি। ও হচ্ছে শাহানা তাই না?

হ্যাঁ।

আমাদের জন্মদিনের মানুষটি কোথায়?

টুনি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওর উপহারটা হাতের কাছে রেখে আসি।

নীলু ভেবে পেল না এই মেয়েটির কথাই কি রফিক মাকে দিয়ে তাকে বলে। এমন
কমবয়সের একটি মেয়ে? শারমিন, হোসেন সাহেব ও মনোয়ারা দু'জনকেই বিনীতভাবে
স্বাগত করল। হোসেন সাহেব তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে নিতান্ত পরিচিত জনের মতো
গল্প শুরু করে দিলেন। এমন কি মনোয়ারা পর্যন্ত হাসি শুরু করে গল্পে যোগ দিলেন।

বাসা কোথায় তোমার?

পুরনো ঢাকায়।

এত দূর একা একা এসেছে?

গাড়ি নিয়ে এসেছি। আর রাত বেশি হয়নি। সাতটা মাত্র বাজে।

শাহানা, শারমিনকে নিয়ে ছাদ দেখাতে গেল। সে তাড়াতাড়ি কারো সঙ্গে সহজ করে পারে না। সেও চট করে সহজ হয়ে গেল। শাহানার খুব ইচ্ছা করতে লাগল এই চমৎকার মেয়েটিকে ম্যাজিশিয়ান আনিসের কথা বলে। কাউকে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে।

এখানে কেউ থাকে নাকি শাহানা?

আনিস ভাই থাকেন।

আনিস ভাই কে?

একজন ম্যাজিশিয়ান। যা সুন্দর ম্যাজিক দেখান।

তুমি দেখেছ?

না।

তাহলে বুঝলে কি করে সুন্দর?

শাহানা চুপ করে গেল। শারমিন হাসিমুখে বলল, আমি ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে একবার গিয়েছিলাম ইংল্যান্ড, সেখানে মি. স্মিথের ম্যাজিক দেখেছি। অপূর্ব!

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভদ্রলোক একটা ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর। অথচ পেশন্যাশ ম্যাজিশিয়ানদের হার মানাতে পারেন। শারমিন জন্মদিনের উৎসবে এসেছে এটা শুনে রফিকের বিশ্বাসের সীমা রইল না। টেলিফোনে জন্মদিনের দাওয়াত অবশ্য সে দিয়েছে। সেটাও তেমন কোনো জোরালো দাওয়াত নয়। শারমিনও আসবে এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। ঠিকানা অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিল।

নীলু বলল, শাহানা ওকে ছাদে নিয়ে গেছে?

শীতের মধ্যে ছাদে কেন?

নীলু হেসে ফেলল, মমতা খুব বেশি মনে হচ্ছে।

তুমি যা ভাবছ তা না ভাবী, শারমিনের শিগগিরই বিয়ে হচ্ছে। আগষ্টে হবার কথা ছিল পিছিয়ে গেছে।

আমি অবশ্য মনে মনে আশা করছিলাম এ মেয়ে এই বাড়িতেই আসবে।

পাগল হয়েছ? এরা যে কি সিরিয়াস বড়লোক এটা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।

সিরিয়াস বড়লোকদের মেয়েরা বুঝি বিয়ে করে না?

করে তবে আমার মতো কাউকে করে না।

সফিক আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসবে বলেছিল। একঘণ্টা পার হয়ে গেছে, তার দেখা নেই। হোসেন সাহেব বললেন, আনিসের ম্যাজিকটা শুরু হয়ে যাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি বরঙ টুনীকে ঘুম থেকে তোল।

টুনীর ঘুম ভাঙানো গেল না। আজ দুপুরে ঘুমায়নি। সেহেতু সে আর জাগবে না। নীলু বলল, থাক ও ঘুমাক, আসুন আমরা ম্যাজিক দেখি।

আনিস এই শীতেও রীতিমত ঘামছে। হাত-পা কাঁপছে কি অবস্থা হবে কে জানে। প্রতিটি আইটেমই অনেকবার করে করা। চোখ বন্ধ করেও এসব করা যাবে কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে একুনি একটা হাসির কাণ্ড হবে। শাহানা বলল, শুরু করুন আনিস ভাই।

বীণা বসে আছে শাহানার পাশে। বীণার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। কারো সঙ্গেই সে কথাবার্তা বলছে না। যে কোনো কারণেই হোক সে অস্বস্তি বোধ করছে। আনিস গাঢ় একশ ভাগ নিশ্চিত সে আংটি সরিয়ে দিতে পারবে না। আনিস ঘরের কোণের দিকে গেল। তার হাতে কিছু নেই।

আমি তাহলে শুরু করছি। দেখুন আমার হাত। হাতে কিছু নেই।

হোসেন সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। ম্যাজিকের ব্যাপারে তিনি পাণ্ডিত্য উৎসাহ বোধ করছেন। আনিস তার খালি হাত দেখিয়ে মুহূর্তেই দুটি টকটকে লাল রুমাল তৈরি করল। হোসেন সাহেব মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

শাহানা বলল, দেখি রুমাল দুটি আমার হাতে দিনতো আনিস ভাই। পরীক্ষা করে দেখি।

ম্যাজিকের রুমালতো দেয়া যাবে না।

বলতে বলতেই আনিস রুমাল দুটি নিশানের মত কিছুক্ষণ বাতাসে উড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হলো একটি টকটকে লাল গোলাপ। আনিস গোলাপটি এগিয়ে দিল শাহানার দিকে। শাহানা কেন জানি খুব লজ্জা পেল। হোসেন সাহেব মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, অদ্ভুত ম্যাজিক। এত সুন্দর ম্যাজিক আমার জীবনে আমি দেখিনি। বীণা শুধু কঠিন দৃষ্টিতে বসে রইল। সে আশা করেছিল এই গোলাপটি সে পাবে।

আনিস আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে কাজেই তার তৃতীয় ম্যাজিক লিংকিং রিং হলো মংকার। রফিক বলল, এ তো সিরিয়াস ম্যাজিশিয়ান। ঠিক না শারমিন?

হ্যাঁ আমার নিজেরই এখন ম্যাজিক শিখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শাহানা বলল, মি. স্মিথের ম্যাজিকের মত লাগছে আপনার কাছে?

হ্যাঁ, সেরকমই লাগছে।

শেষ ম্যাজিকে গুণগোল হয়ে গেল। আংটি হাওয়া করে দেয়ার ম্যাজিক। আনিস শারমিনের আংটি নিয়ে রুমালে ভরে রাখল টেবিলে। মুখে বলল, এখানে আংটি আছে, এ বিষয়ে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে। সন্দেহ থাকলে হাত রুমালে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে যান। বীণার দায়িত্ব হচ্ছে পরীক্ষা করতে এসে আংটি উঠিয়ে নেয়া। সে উঠে দাঁড়াল এবং সক্র গলায় বলল, আমার মাথা ধরেছে আমি বাসায় যাব। শাহানা বলল, আরে এখন যাবে কি? দেখে যাও কি হয়।

যা ইচ্ছা হোক আমার ভালো লাগছে না।

আনিস বীণার এই হঠাৎ রাগের কোনো কারণ বুঝে পেল না। সে বলল, বীণা এসে দেখে যাও আংটি আছে কিনা।

অন্যরা দেখুক।

বীণা গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। শেষ ম্যাজিকটি আনিসের দেখানো হলো না। হোসেন সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আনিস, আংটিটার কি হলো দেখাও।

ম্যাজিকের মাঝখানে কেউ উঠে গেলে সে ম্যাজিক আর দেখানো যায় না।

ভাই নাকি, জানতাম নাতো।

এইটা অন্য কোনো দিন দেখাব।

শাহানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মন বলছে-বীণার মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। কি হয়েছে সে সম্পর্কে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তবে সে একেবারেই খে বুঝতে পারছে না, তাও নয়।

মনোয়ারা ম্যাজিক শেষ হওয়াযাত্র নীলুকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, শারমিন মেয়েটি কেন এসেছে এ বাড়িতে?

রফিক দাওয়াত করেছে তাই এসেছে।

দাওয়াত করবে আর হট করে চলে আসবে? তাও একা একা এসেছে। আমার কিছু ভালো লাগছে না।

ঐসব কিছু না মা।

তুমি বুঝলে কি করে ঐসব কিছু না? বড়লোকের মেয়ে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছে।

নীলু কিছু বলল না।

রফিক চাকরি বাকরি কিছু বুঁজছে না। ঐ মেয়ের পেছনে ঘুর ঘুর করে সময় কাটাচ্ছে।

না, মা চাকরির চেষ্টা ও ঠিকই করছে।

বাজে কথা বলবে না। চেষ্টা করলে এই অবস্থা হয়? হয় না। আর কিছু যে হচ্ছে না সেই নিয়ে কোনো মাথাব্যথাও নেই। দিবা মেয়েদের সঙ্গে ফটিনটি করে বেড়াচ্ছে। আজ আমি তাকে কিছু কথা শুনাব।

থাক মা আজ আর কিছু না বললেন।

কেন? তাকে কথা শুনাতে হলে আগে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে? পঞ্জিকা দেখতে হবে?

আপ্তে কথা বলুন, মা ওরা শুনবে।

শুনলে শুনুক, আমি কাউকে ভয় পাই নাকি? ওর রোজগারে আমি খাই?

ওদের খাবার দিয়ে আসি মা। রাত হয়ে যাচ্ছে।

সফিক ফিরল এগারোটায়।

নীলু না খেয়ে অপেক্ষা করছিল। সে কিছুই বলল না। সফিক বলল, জন্মদিন কেমন হলো?

ভালোই।

লোকজন এসেছিল?

এসেছে কেউ কেউ। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আস, খাবার গরম করছি। নাকি খেয়ে এসেছে?

না, খাব কোথায়? অফিসে একটা ঝামেলা হলো।

নীলু কোনো আগ্রহ দেখাল না।

স্যুরেনসেন মনে হয় চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। অবশি গুজবও হতে পারে।

নীলু নিঃশব্দে ভাত বেড়ে দিতে লাগল। সফিকের কথাবার্তা তার শুনতে ইচ্ছা করছে

৯। সাবাদিনে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। রফিক ভাত খাওয়াতে বলল, হুইকি খেয়ে ব্যাটা খুব হৈচৈ করছিল আজ, কেলেকারী অবস্থা।

১০। সফিক অনেক রাত পর্যন্ত বসার ঘরে বসে বসে সিগারেট টানল। নীলু যখন বলল, ঘুমে না? তখন সে নিয়ম ভঙ্গ করে চা খেতে চাইল।

১১। না হলে একটু চা করো তো নীলু। কাজের ছেলেরা কোথায়? ওকে দেখছি না।

১২। বিদায় করে দিয়েছেন?

১৩। বে করলেন?

১৪। গত সপ্তাহেই করেছেন। তোমার চোখে পড়েনি বোধহয়।

১৫। সফিক আর কিছু বলল না। চা খেতে খেতে এলোমেলো ভাবে কিছু কথাবার্তা হল। যেমন, রফিকের কিছু হয়েছে? চেষ্টা করছে না বোধহয় সে রকম। চাকরির ক্ষেত্রে এতটা খারাপ নিশ্চয় না। প্রশ্ন করার জন্যেই করা। নীলু বলল, আমি ঘুমেতে আছি।

১৬। সফিক কিছু বলল না।

১৭। নীলু শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল, তারা দু'জনে কি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে? বোধহয় যাচ্ছে। কিন্তু কেন? দোষটা কার? সফিকের একান্ত নিশ্চয়ই নয়। তারও নিশ্চয়ই কোনো ভূমিকা আছে। সংসারের পেছনে সফিককে একা খাটতে হচ্ছিল। এখন সে কিছু সাহায্য করছে। সফিকের সেটা পছন্দ নয়। শুধু সফিক নয়, তার শাওড়িরও।

১৮। প্রথম বেতনের টাকা থেকে এক হাজার টাকা সে মনোয়ারাকে দিতে গেছে, তিনি দ্বিধা মুখে বললেন, ঐ টাকা তোমার কাছেই রাখ বৌমা। আগে যদি সফিকের টাকায় চলবে এখনো চলবে। সফিকও বলেছে একই কথা তবে একটু ঘুরিয়ে, রেখে দাও দরকার হলে নেব।

১৯। প্রথমদিকের সেই অবস্থা এখন নেই। মনোয়ারা এখন টাকা নেন। গত মাসে চললেন, সামনের মাস থেকে আরো কিছু বেশি দিতে পারো কিনা দেখো তো বৌমা।

২০। নীলু তার নিজের মাকে প্রতি মাসেই দু'শ টাকা করে দিচ্ছে। তিনি বার বার দিচ্ছেন, কোনো দরকার নেই। যখন দরকার হবে আমি চাইব। তিনি চাইবেন না কোনোদিন। তার ধারণা মেয়ের টাকায় তার কোনো অধিকার নেই। এটা একটা মিথ্যা ধারণা। ছেলের টাকায় মার অধিকার থাকলে মেয়ের টাকায়ও থাকবে। কেন থাকবে না?

২১। নীলুর চাকরি কেউ পছন্দ করছে না, কিন্তু তার টাকার বাড়তি কিছু কিছু আসছে না। সে টাকা জমাচ্ছে। মাস তিনেকের ভেতরই একটি টিভি কেনার মতো টাকা জমে থাকবে। এটা কম কি-নিশ্চয়ই কম নয়। মশারির ভেতর কয়েকটা মশা ঢুক গেছে। গুন গুন করছে কানের কাছে। নীলুর উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে কিন্তু পুরোপুরি ঘুম আসছে না। বিয়ের আগে এরকম হত। অসমক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হত। তখন সময়টাও খুব খারাপ ছিল। বিয়ে দেবার আগে মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিয়ের কোনো প্রস্তাবই আসে না। বড় ভাবী খুঁটানো করে কাটা কাটা কথা তুলান। তার প্রতিটি কথার তিন চার রকম মানে হয়। একেকবার প্রচণ্ড রাগ হত। কিন্তু কার উপর রাগ করবে? মার উপর? যার কেউ নেই, তার উপর রাগ করা যায় না।

টুনী কান্দতে শুরু করেছে। কোনো ভয়ের স্বপ্ন টপ্প দেখেছে বোধহয়।

কি হয়েছে মা। ভয় লাগছে?

না।

বাথরুম?

না।

পানি খাবে?

না।

তাহলে কান্দছ কেন?

বাথরুম করব।

নীলু, টুনীকে কোলে নিয়ে নামল। টুনী বলল, বাথরুম করব না। দাদুর সঙ্গে ঘুমাব।

কাল ঘুমিও।

না, আজ।

নীলু রাত দুপুরে হোসেন সাহেবের ঘরের দরজায় খাট্টা দিল। প্রায় রাতই একা এরকম হচ্ছে। টুনী ঘুমুতে যাচ্ছে দাদুর সঙ্গে। দাদুকে এখন গল্প বলে বলে ঘুম পাড়াতে হবে। মনোয়ারা বিবস্ত্র হবেন। খিটিমিটি বাধবে দু'জনের মধ্যে।



রাত নটা।

রহমান সাহেব খেতে এসে দেখেন শারমিন দোতলা থেকে নিচে নামেনি। জমিলা মা বলল, আফা ভাত ঝাইবেন না।

কেন?

কিছু কন নাই? শরীর খারাপ মনে হয়।

রহমান সাহেব বিস্মিত হলেন। শরীর ভালো থাকুক না থাকুক খাবার সময় শারমিন উপস্থিত থাকে। কিছুদিন থেকে তিনি তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছেন। রহমান সাহেব নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলেন। রাতের খাবার সময়টা তিনি বেশ আনন্দে কাটান। ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে হালকা আলাপ করেন শারমিনের সঙ্গে। অফিসের ব্যাপার নিয়েও কথাবার্তা হয়। আজ তিনি একটি জরুরি ব্যাপার নিয়ে শারমিনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। নাইক্যাংছড়িতে তিনি একটা রাবার চাকের পরিকল্পনা নিতে চাচ্ছেন। এই বিষয়ে মতামত জানা।

রহমান সাহেব খাওয়া শেষ করে শারমিনের দরজায় টুকা দিলেন।

মা জেগে আছে?

আছি।

লক্ষীর খারাপ নাকি?

হ্যাঁ।

কখন?

লক্ষী না দিয়ে শারমিন দরজা খুলল। রহমান সাহেব চমকে উঠলেন। ক্যাকাশে
জান্নাতনের। চোখ লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র কেঁদে উঠেছে।

কখন আমার ঘরে। গল্প করি।

জান্নাতন চাদর গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে এলো। রহমান সাহেবের মনে হলো,
কি খুব একলা হয়ে পড়েছে। নিঃসঙ্গতার চেয়ে বড় কষ্টতো আর কিছু নেই। এই
কষ্ট পরন তাঁর মতো আর কেউ জানে না। তারা দু'জন নিঃশব্দে রহমান সাহেবের
কমরোর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

খাটে পা তুলে আরাম করে বসে তো মা।

জান্নাতন বসল খাটে। রহমান সাহেব আচমকা প্রশ্ন করলেন, সাক্ষিরের সঙ্গে
কি গড়ান গড়া হয়েছে নাকি?

না, ঝগড়া হবে কেন?

ফিরে যাবার সময় এয়ারপোর্টে তাকে খুব গম্ভীর দেখলাম।

পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। অনেক রকম ঝগড়া যাক উনাদের।

মাও অসুস্থ ছিল।

তুমি কি তাকে দেখতে গিয়েছিলে?

চাকর্য নেইতো উনি। জামালপুরে তাঁর মেয়ের কাছে থাকেন।

রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন।

কিছুদিন হলো আবার শুরু করেছেন। তার মনে হচ্ছিল শারমিন সিগারেটের প্রসঙ্গে
এলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না।

সাক্ষির তোমাকে চিঠিপত্র লিখেছে তো?

হ্যাঁ।

জবাব দাও তো তুমি?

হ্যাঁ, দেই। দেব না কেন?

আমি আজ তার একটা লম্বা চিঠি পেয়েছি। সে দেশে চলে আসছে। এমিলের
কথামাঝি এসে পড়বে। তোমাকেও নিশ্চয়ই লিখেছে?

হ্যাঁ।

আমি ঠিক করেছি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে
কেন। কি বল তুমি?

শারমিন কিছু বলল না। রহমান সাহেব বললেন—খুব জমকালো একটা উৎসব
করে চাই। তোমার মার শখ ছিল জমকালো উৎসবের।

শারমিন এমন ভাবে তাকালো যেন সে কিছু বলছে না। অন্য কিছু ভাবছে। রহমান
সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি আশা করেছিলেন বেশ অনেকক্ষণ গল্প গুজব
করবেন। মেয়েটি ক্রমেই কি দূরে সরে যাবে? বিয়ের পর নিশ্চয়ই আরো দূরে যাবে।

শারমিন মৃদুস্বরে বলল-বাবা, তুমি তোমার কোনো কারখানায় একটি চাকরি
বাবস্থা করতে পারবে?

রহমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন-কার চাকরি?

আমাদের সঙ্গে পড়ত একটা ছেলে। অনেক দিন ধরে চাকরির চেষ্টা করছে।
করবার পর প্রায় দু'বছর হয়ে গেল।

রহমান সাহেব গভীর গলায় বললেন, যে ছেলে দু'বছর চেষ্টা করেও কিছু করা
পারছে না, সে মোটামুটিভাবে একজন অপদার্থ।

অপদার্থ হবে কেন? দেশের অবস্থা খারাপ।

খারাপ ঠিকই কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলেরা এই খারাপ অবস্থার মধ্যেও গুছিয়ে নি
পারে।

শারমিন কিছু বলল না। রহমান সাহেব বললেন, ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও আ
কাছে, আমি দেখব। ও কি প্রায়ই আসে নাকি এখানে?

না প্রায়ই আসবে কেন?

ঠিকানা জান?

না, জানি না।

বলেই শারমিন চমকে উঠল। এই মিথ্যাটা সে কেন বলল? কোনো দরকার ছিল
তো।

ঠিকানা না জানলে খবর দেবে কি করে?

শারমিন লজ্জিত মুখে বলল, আমি ঠিকানা জানি। রহমান সাহেব অবাক হা
তাকিয়ে রইলেন।

বাবা, আমার মাথা ধরেছে, ঘুমতে যাই।

শারমিন উঠে দাঁড়াল। তার সত্যি সত্যি মাথা ধরেছে। জ্বর আসছে বোধহয়
রহমান সাহেব বললেন, একটু বসো। আদা চা করে দিক, মাথা ব্যথা কমবে। জি
চায়ের কথা বলবার জন্যে উঠে গেলেন। এবং তখনই জানতে পারলেন আজ বিকেল
মাটি মারা গেছে। খবরটি দিতে গিয়ে জয়নালের মুখের ভাব এরকম হলো যেন ও
নিজেই মাটিকে মেরেছে।

আমাকে খবরটা তখন দাওনি কেন?

আপা নিষেধ করছিলেন। বলেছিলেন ডাক্তার খাওয়ার পরে দিতে।

রহমান সাহেব মাটিকে দেখতে গেলেন। ঠাণ্ডা মেঝেতে মাটি এলিয়ে পড়ে আছে
তার গায়ে মোটা একটা কবল।

মারা গেল কিভাবে?

জানি না। খাণ্ডন দিতে গিয়া দেখি এই অবস্থা।

শারমিন কি খুব কান্নাকাটি করছিল?

জি, না।

কিছুই বলেনি?

বলছেন সকাল হইলে মাটি দিতে। বরই গাছের নিচে।

জামিণি খায়ে কবল দিয়ে রেবেছ কেন?

জামিণি নাই, আফা দিল্ছেন।

জামিণি গম্বাধা হলো নিঃশব্দে। মার্টি প্রসঙ্গে কোনো কথাই হলো না। শারমিন বলল,
জামিণি গাই?

জামিণি মা, ঘুমাও। আর শোন ঐ ছেলটিকে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

শারমিন নেই।

শারমিন থাকবে না কেন?

জামিণি সেই করুক। আমার এত মাথা ব্যথা নেই?

জামিণি কি শারমিনের রাগের কথা? কেন সে রাগ করছে? কার উপর রাগ করছে?
জামিণি নিজেই তা বুঝতে পারছে না। সে কি অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে? সব মেয়েই কি
একদম এদলে যায়, না এটা শুধু তার বেলায় হচ্ছে। জানার কোনো উপায় নেই কাকে
জিজ্ঞাস্য করবে?

শারমিনের কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। আত্মীয়-বন্ধন যারা ঢাকায় আছেন তাদের
জামিণি কোনো রকম যোগাযোগ নেই। কেউ কেউ ঈদের দিনে বেড়াতে আসেন। গেটের
জামিণি ঢাকার পর থেকেই তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সেই অস্বস্তি বাড়ি থেকে
জামিণি না হওয়া পর্যন্ত কমে না। এদের অনেককেই শারমিন চেনে না। রহমান সাহেব
জামিণি। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র উদ্ভাস দেখান না। মেয়েকেও কারো বাসায় বেড়াতে যাবার
জামিণি বলেন না। যে কোনো কারণেই হোক মেয়েকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। তবু
জামিণি মাঝে নিতান্ত অপরিচিত একজন কেউ আসে। অন্তরঙ্গ ভাষাতে কথাবার্তা বলে যেন
জামিণির চেনা। এদের কথার ধরন থেকেই বুঝা যায় সাহায্য প্রার্থী।

একবার দুপুরবেলায় ঘোমটা পরা একজন মহিলা এলেন। সঙ্গে চারটা আনারস,
দুগৈওল আচার। শারমিনকে জড়িয়ে ধরে বানিকরণ কঁাদলেন, আহ গো মা কতদিন
দেখলাম। গায়ের রঙটা একটু মসলা হয়ে গেছে আগে সোনার পুতুলের মতো ছিল।
জামিণিকে চিনছ তুমি?

না।

আমি আটপাড়ার। তোমার আন্নার মামাতো বোন।

সেই মহিলা খুব আগ্রহ নিয়ে সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। এবং ঘন ঘন দীর্ঘ
নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। এবং এক সময় জানা গেল তিনি এসেছেন হুঁহাকার টাকার
জামিণি। মেয়ের বিয়ে আটকে গেছে। জামাই একটা সাইকেল এবং একটা টেবিল রেডিও
জামিণি। বিয়ের কথাবার্তা সব পাকা। এখন এই অল্প কিছু টাকার জামিণি বিয়ে আটকে
থাকে। শারমিন লজ্জিত হয়ে বলল, আমার কাছে তো এত টাকা থাকে না। আপনি
অপেক্ষা করুন বাবা আসুক। তিনি বিকেলে আসেন।

তোমার কাছে কত টাকা আছে?

আমার কাছে খুব অল্পই আছে এতে আপনার কাজ হবে না। আপনি বিশ্রাম করুন
জামিণি চলে আসবেন।

ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করতে লাগলেন। শারমিন সাধ্যমত তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার

করতে চেষ্টা করল। ভালো ব্যবহারের চেষ্টা করাও মুশকিল। তারা দু'জন দুই জগৎ মানুষ। এই দু'জগতের ভেতরে কোনো বন্ধন নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই শারমিন ধীরে হয়ে পড়ল। ভদ্রমহিলা একটির পর একটি আদার করেই যাচ্ছেন, ওমা তোমার তো বাপ ভর্তি শাড়ি। দুই একটা আমাকে দিও গো মা। পুরানা চাদর আছে? খুব শীত পড়ে আটপাড়ায়। না গেলে বুঝবা না।

সক্যাবেলা রহমান সাহেব এলেন। টাকার কথা শুনে বললেন, তোমাকে তো মেয়ে বিয়ের জন্যে তিন মাস আগেই পাঁচ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে বন্ধুর সাহেব এসে নিচ্ছে গেছেন।

সেই বিয়াটা হয় নাই ভাইজান।

আরুন হওয়া বিয়ে ভেঙে গেছে? বন্ধুর সাহেব তো বললেন আকদ হয়ে গেছে, রোসমত আটকে আছে। তিনি তিন হাজার টাকা চেয়েছিলেন। আমি দিয়েছিলাম ঠাণ্ডা হাজার টাকা।

ভদ্রমহিলা কান্দতে শুরু করলেন। বিশী অবস্থা। শারমিন সরে গেল সামনে থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনল বাবা বলছেন, আমার সঙ্গে চাল চালতে যাবে না। তোমাদের চাল বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।

সময় কাটানোই হয়েছে শারমিনের সবচে' বড় সমস্যা। সময় পাহাড়ের মতো বুকের উপর চেপে বসে থাকে। বই পড়া, গান শোনা এর কোনোটাই এখন আর ভালো লাগে না। ছবি আঁকা শেখার কথা একবার মনে হয়েছিল। রংতুলি কিনে কয়েকদিন খুঁব রঙ মাখামাখি করা হলো, তাও মনে ধরল না।

প্রতিটি কাজ এত বিরক্তিকর।

কোনো কোনোদিন একা একা ঘুরতে ইচ্ছা করে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে খারাপ লাগে না। সবদিন তো আর তা করা যায় না। পুরনো বান্ধবীদের কারোর ঠিকানা নেই নয়তো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত। অদিতির ঠিকানা ছিল। তাকে পর পর দু'টি চিঠি দিয়েছে জবাব পাওয়া যায়নি। হয়তো এই ঠিকানায় সে এখন থাকে না কিংবা থাকলেও তার জবাব দেবার ইচ্ছা নেই। শারমিন বন্ধুর জন্যে অতীতে কখনো হাত বাড়ায়নি তার মূল্য দিতে হচ্ছে এখন। হাত বাড়িয়ে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শারমিন জেগে উঠল খুব ভোরে। চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল আজকের দিনটি কেমন করে কাটানো যায়। ইউনিভার্সিটিতে গেলে কেমন হয়? পরিত্যক্ত কাউকে কি পাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটিতে? সম্ভাবনা খুব কম। এই পরিকল্পনাটা বাস্তব দিতে হলো। রফিকদের বাসায় গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হলে কেমন হয়? শাহানা মেয়েটিকে ঐদিন চমৎকার লেগেছিল। ওর সঙ্গে গল্পগুজব করা যেত কিন্তু সে নিশ্চয়ই কলেজে। কোন কলেজে পড়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি। জানা থাকলে ঐ কলেজে হাজির হলে মশক হতো না। শাহানাকে বের করে সিনেমা দেখা যেত কিংবা চাইনিজ রেস্তোরাঁতে বসে সমস্ত কাটানো যেত।

কিংবা ঐ ম্যাজিশিয়ান আনিসকে একবার খবর দিয়ে এ বাড়িতে নিয়ে এলে হয়।

১৭৭৮। একটা উৎসবের মতো করা হবে। ম্যাজিশিয়ান আনিস ম্যাজিক দেখাবে।

১৭৭৯। কিছু মানুষ থাকবে।

১৭৮০। টেবিলে শারমিন হাসিমুখে বলল, ম্যাজিক তোমার কেমন লাগে বাবা?

১৭৮১। ম্যাজিক?

১৭৮২। রুমাল ভ্যানিস হয়ে যাবে। শূন্য থেকে তৈরি হবে রক্ত-গোলাপ।

১৭৮৩। এগেই লাগে। ইঠাৎ ম্যাজিক প্রসন্ন কেন?

১৭৮৪। একজন ম্যাজিশিয়ানকে চিনি। তাঁকে আমি বাসায় শো করতে বলব।

১৭৮৫। তো বলবে।

১৭৮৬। কবে করলে তোমার সুবিধা হয়?

১৭৮৭। যে কোনোদিন করতে পারো। রবিবারে করা যেতে পারে।

১৭৮৮। আছে বাবা, রবিবার সন্ধ্যায়।

১৭৮৯। রহমান সাহেব মেয়ের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। ম্যাজিশিয়ান শ্রেণীর কাউকে

১৭৯০। মেয়ে চেনে এটা বিশ্বাস করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

১৭৯১। বাবা, তাহলে ঐদিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

১৭৯২। ঠ্যা, ব্যবস্থা কর।

১৭৯৩। ঐদিন সব রান্না আমি করব কি বলো?

১৭৯৪। ভেরি গুড আইডিয়া।

১৭৯৫। দেশি রান্না না চাইনিজ? কোনটা চাও তুমি?

১৭৯৬। মিক্সড হলে কেমন হয়?

১৭৯৭। ভালোই হয়।

১৭৯৮। শারমিনের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রহমান সাহেবের মনে হলো মার্টিন শোক

১৭৯৯। শারমিনকে স্পর্শ করেনি। তার জীবনে কি এরচেহেও কোনো বড় শোক আছে?

১৮০০। শারমিন হাসি মুখে বলল, নাশতা খাওয়ার পর আজ সারাদিন আমি ঘুরব।

১৮০১। ভেরি গুড। কোথায় ঘুরবে?

১৮০২। ঠিক নেই কোনো।

১৮০৩। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ তো?

১৮০৪। হুঁ।

১৮০৫। তুমি নিজে গাড়ি চালানোটা শিখে নাও না কেন?

১৮০৬। আমার ইচ্ছে করে না।

১৮০৭। প্রেসক্রাবের সামনে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। ছোটখাট একটা ভিড় সেখানে। শারমিন

১৮০৮। গাল, ড্রাইভার সাহেব গাড়ি থামান।

১৮০৯। ড্রাইভার গাড়ি থামাল।

১৮১০। ঐ কোণায় পার্ক করে রাখুন। তারপর রফিককে ডেকে নিয়ে আসুন। ঐ যে হলুদ

১৮১১। পাঞ্জাবি দড়ির ব্যাগ কাঁধে।

১৮১২। রফিক হাসিমুখে এগিয়ে এলো, আরে কী ব্যাপার?

১৮১৩। তুমি এই ঠাণ্ডায় শুধু একটা পাঞ্জাবি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

ইয়েস ম্যাডাম। বেকারদের শীত লাগে না।

করছ কি এখানে? ভিড় কিসের?

চাকরির দাবিতে অনশন হচ্ছে। তাই দেখছিলাম। নিজেও ঢুকে পড়ব কিনা ডাবা।

উঠে আস।

কোথায় যাচ্ছ?

ঠিক নেই।

রফিক উঠে এলো। শারমিন বলল, তোমার ঝুলির ভেতর কি আছে?

কিছুই নেই। যাচ্ছি কোথায় আমরা?

কোথাও না। শুধু ঘুরব ঢাকা শহরে। তোমার কোনো কাজ নেই তো?

না। দুপুরবেলা ভাবীর অফিসে যাবার একটা প্ল্যান ছিল সেটা বাতিল করলাম।

বাতিল করবার দরকার কি? যাবে দুপুরে। আমি বাইরে অপেক্ষা করব। কিংবা আমি ও যেতে পারি। তোমার ভাবী যদি রাগ না করেন।

রাগ করবে কেন? রাগ, হিংসা, ঘেঁষ এইসব ভাবীর মধ্যে নেই। শি ইজ এন একসেপশনাল নেভি। তারপর তোমার কি খবর বলো?

কোন খবর জানতে চাও?

ভুলোক কবে আসছেন?

এপ্রিলে।

বিয়েটা হচ্ছে কবে?

মে মাসে।

মহানন্দে আছ?

হুঁ। তোমার কি হিংসা হচ্ছে নাকি?

একটু যে হচ্ছে না তা না। ভালো কথা, তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে?

কেন?

যদি থাকে তাহলে এক প্যাকেট দামি সিগারেট কিনে দাও। ক্ষতুর হয়ে গেছি। শারমিন হেসে বলল, ভিক্ষা?

হ্যাঁ ভিক্ষা।

ভিক্ষাই যখন চাইছ তখন ছোট জিনিস চাইছ কেন? বড় কিছু চাও।

পাওয়া যাবে না এমন কিছু আমি চাই না।

দুপুরবেলা তারা দু'জন সত্যি সত্যি নীলুর অফিসে উপস্থিত হলো। নীলু বেশ অবাক হলো। যে মেয়েটির কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে হচ্ছে সে একটি ছেলের সঙ্গে এমন সহজভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিভাবে।

ভাবী কেমন আছেন?

ভালো। তুমি কেমন আছ? তুমি বললাম রাগ করোনি তো?

হ্যাঁ, খুব রাগ করেছি।

শারমিন হেসে ফেলল। নীলুর মনে হলো এই মেয়েটি বড় ভালো। কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের সব সময় কাছের মানুষ মনে হয়। এই মেয়েটি সেই দলের।

পাশাপাশি বলল, আসুন ভাবী আজ দুপুরে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে খাব। নতুন
কম্পিউটার রেটুরেন্ট হয়েছে খুব ভালো খাবার।

খান তে ভাই যেতে পারব না। আমাদের বোর্ড মিটিং আছে। সবাইকে থাকতে
হবে। পরের শেষ হচ্ছে তো।

আজ তাহলে আপনি খুব ব্যস্ত?

হ্যাঁ। অন্য কোনোদিন সবাই মিলে একসঙ্গে খাব।

আজ মানে আপনি এখন আমাদের বিদায় হতে বলছেন?

নীল হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ। আজ আমাদের খুব ঝামেলা।

কিন্তু আপনাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন?

আমার একটা সুখবর আছে।

কোনক অবাধ হয়ে বলল, কি সুখবর, প্রমোশন হয়ে গেছে নাকি তোমার? চাকরি
এক বছরও হয়নি?

নীল কিছু না বলে অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। সে নিজেও তার সুখবর
কিছু জানে না। সকালবেলা অফিসে আসতেই সালাম সাহেব বলেছেন, আপনার
সুখবর আছে। বোর্ড মিটিংয়ের পর জানতে পারবেন। নীল ভয়ে ভয়ে বলেছে,
কি?

জানবেন, জানবেন। এত ব্যস্ত কেন? দুঃসংবাদ তাত্তাতিড়ি শোনা ভালো, কিন্তু
দুঃখবাদের জন্যে অপেক্ষা করাতেও আনন্দ।

এখাটা ঠিক, নীলুর আনন্দই লাগছে। কি হতে পারে খবরটা? প্রমোশন হবে না।

খটা সম্ভব না। চাকরি এক বছরও হয়নি। কিন্তু এছাড়া আর কি হতে পারে?

শারমিন বাসায় ফিরল সন্ধ্যাবেলা। সমস্তটা দিন বাইরে কেটেছে কিন্তু এতটুকুও
লাগছে না। বরং বেশ ঝরঝরে লাগছে।

বহমান সাহেব বাসায় ছিলেন। তিনি অনেকদিন পর শারমিনের উৎফুল্ল চোখ-মুখ
দেখলেন। তিনি বললেন, চলো মা বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাই।

এই শীতের মধ্যে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাবে কি?

খুব শীত না। চলো যাই। চাদরটাদর কিছু গায়ে দিয়ে নাও।

বহমান সাহেব গোলাপ ঝাড়ের দিকে এগলেন। এই বাগানের পেছনে অনেক শ্রম
এবং অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু বাগান প্রাণহীন। প্রচুর গোলাপ গাছ আছে, কিন্তু বেশির
ভাগ গাছই ফুল ফুটাতে পারে না। হয়তো মাটি ভালো না। কিংবা মালী ফুলগাছের কিছু
জানেন না। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে বহমান সাহেবের একটু মন খারাপ হলো।

কি করলে আজ সারাদিন?

তেমন কিছু না। ঘুরলাম কিছু কেনাকাটা করলাম।

কি কিনলে?

সূতীর শাড়ি কিনেছি দু'টি। ঘরে পরার ফ্যান কিনেছি না।

ফ্যান কিনেছি কিনলেই পারতে।

কিনব এক সময়।

রহমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, তাড়াতাড়িই কেনা উচিত। উৎসবের দিন এগিয়ে আসছে।

শারমিন কিছু বলল না।

তুনেছি অনেকেই বিয়ের শাড়িটারি কোলকাতা থেকে কেনে, তুমি যেতে কোলকাতায়?

না।

আমি আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি কোলকাতায় ইচ্ছা করলে তুমি যেতে পারো।

না, অভ শখ নেই আমার।

এটাতো শখের বয়স। তোমার শখ নেই কেন?

ভেতরে চলো বাবা। ঠাণ্ডা লাগছে।

রহমান সাহেব হালকা স্বরে বললেন, একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলো শারমিন সাক্ষরকে বিয়ের ব্যাপারে তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা দেখা দিয়েছে?

না শুধু শুধু দ্বিধা দেখা দেবে কেন?

আজ তার একটি চিঠি পেলাম। তোমার কাছে চিঠি লিখে লিখে নাকি জবাব পাঠে না।

মাঝে মাঝে আমার চিঠি লিখতে ভালো লাগে না। আলসী লাগে।

আজ তাকে চিঠি লিখে দিও।

হ্যাঁ দেব।

আর ঐ ম্যাজিসিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল?

না। রোববারের প্রোগ্রামটা ঠিক আছে?

না।

না, কেন?

এখন আর ইচ্ছা করছে না। রহমান সাহেব মেয়ের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। শারমিনকে তিনি বুঝতে পারছেন না। বাবারা হয়তো সব সময় তা পারে না। মা'রা পারে। শারমিনের মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই শারমিনকে বুঝতে পারত। রহমান সাহেব অনেকদিন পর নিজের স্ত্রীর কথা মনে করলেন।



সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল তবু নীলু জানতে পারল না, ভালো খবরটি কি? ম্যারামন বোর্ড মিটিং হচ্ছে। চারটার পর তিনবার চা দেয়া হয়েছে ভেতরে, ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শেষবারের চা আনতে হলো বাইরে থেকে। ভাবভঙ্গি মেটে মনে হচ্ছে মিটিং চলবে রাত নটা দশটা পর্যন্ত।

নীলু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বাসায় বসে আসা হয়নি। সবাই নিশ্চয়ই চিন্তা করবে। কিন্তু মিটিংয়ের মাঝখানে চলে যাওয়া যায় না। কেউই যায়নি। আজ বোনাস

এই কথা। এ বছর কোম্পানি দু'কোটি টাকার কাছাকাছি লাভ করেছে। বড়
কোম্পানি বোনাস হবার কথা। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে চার মাসের বেসিক পে বোনাস
হবার কথা হবে। গুজবটা এসেছে খুব উঁচু লেভেল থেকে। সত্যি হলেও হতে পারে।
না হলেও অবশ্যি নীলুর কোনো লাভ নেই। যাদের চাকরি এক বছরের কম তারা
কোম্পানি পাবে না-নিয়ম নেই। নীলুর চাকরির এক বছর হতে এখনো তিন মাস বাকি।
কোম্পানি পাবে নীলু পাবে না। ভাবতে একটু ঝারাপ লাগে। টাকাটা পেলে সে টিভি
কেনাবে। বাসার সবাইকে দারুণ একটা চমক দেয়া যেত।

এই আটটায় নীলুর টেলিফোন এলো। রফিক টেলিফোন করেছে।

হ্যালো ভাবী! ব্যাপার কি এত দেরি।

মোর্ড মিটিং হচ্ছে।

মোর্ড মিটিং করবে ডিরেক্টররা তুমি চুনোপুটি। তুমি বসে আছ কেন?

খামি একা না। সবাই অপেক্ষা করছে।

এত রাতে বাসায় ফিরবে কিভাবে?

এটা নীলু ভাবেনি। বাসায় ফেরা একটা সমস্যা হবে। দশটা পর্যন্ত অবশ্যি বাস
কোম্পানি করে। বাসে করে ফিরে যেতেও ঘণ্টাখানিক লাগবে।

হ্যালো ভাবী।

তুমি অপেক্ষা করো আমার জন্যে। আমি নিতে আসছি এক্ষুণি রওনা দিচ্ছি।

ঠিক আছে। তোমার ভাই এসেছে?

হ্যাঁ এসেছে। তুমি এখনো ফেরনি শুনে ভায় হয়ে আছে। আজ মনে হয় গরম
হওয়া দেবে। ভাবী আমি রাখলাম।

নীলু টেলিফোন নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল মিটিং শেষ হয়েছে।

মুখুর মঞ্জুর হোসেন ডেকেছেন সবাইকে।

মঞ্জুর হোসেন সাহেবের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। এই মুখ দেখে ভয়সা হয় না
কোনো ভালো খবর আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি ভালো খবর ছিল। বড় সাহেব নীরস
ভাষিতে খবরগুলি দিলেন।

“কোম্পানি এ বছর ভালো বিজনেস করেছে। কোম্পানির পলিসি মতো লাভের
একটি ভালো অংশ কর্মচারীদের জন্যে ব্যয় করা হবে। সবাই এবার স্পেশাল বোনাস
পাবে। সেটা হচ্ছে চার মাসের বেসিক পে। আমাদের এখানে দু'জন আছেন যাদের
চাকরির মেয়াদ এক বছর হয়নি। আইন অনুযায়ী তারা বোনাস পেতে পারেন না, তবে
এ বছর তাদেরকে বোনাস দেবার সুপারিশ করা হয়েছে।

কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং মেডিকেল
ক্যালাউন্স বাড়ানোর সুপারিশও করা হয়েছে। মেডিক্যাল এন্ডলিঙ্গের ব্যাপারটি যাবে
মাইনাস কমিটিতে।”

তুমুল হাততালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হলো। মঞ্জুর সাহেব নীলুকে হাত ইশারা করে
ডাকলেন, আপনি একটু আমার কাছে আসুন। নিশ্চয়ই সুখবরটা বলা হবে। নীলুর বুক
টিপ টিপ করতে লাগল।

বসুন।

নীলু বলল।

আপনার জন্যে একটা ভালো খবর আছে। কোম্পানি এ বছর আপনাকে সুইথে ট্রেনিংয়ের জন্যে সিলেক্ট করেছে। ছ'মাসের ট্রেনিং। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের উচ্চ ট্রেনিংটা হবে। কাল সকালে আপনাকে ক'গজপত্র দেব। ট্রেনিং পিরিয়ডে থাকা ঝাওয়া খরচ ছাড়াও প্রতি মাসে দু'শ পঞ্চাশ ইউএস ডলার পাবেন হাতখরচ।

নীলু মৃদুস্বরে বলল-থ্যাংক ইউ স্যার।

থ্যাংকস দেবার কিছু নেই। সুযোগটা আপনি পেয়েছেন আপনার নিজেকে যোগ্যতায়। খুব অল্প সময়ে আপনি কাজের নেচার পিক আপ করেছেন এবং চমৎকা ভাবে করেছেন। গ্র্যানুয়েল রিপোর্টটাও আপনি ভালো তৈরি করেছেন।

আনন্দে নীলুর চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। নীলু নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করা ভদ্রলোকের সামনে কেঁদে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে।

রাত হয়ে গেছে তো আপনি যাবেন কিভাবে?

আমাকে নিতে আসবে স্যার।

বাসা কোথায় আপনার?

কল্যাণপুর।

সে তো অনেক দূর। যাতায়াত করেন কিভাবে?

বাসে আসি স্যার।

কোম্পানি শিগগিরই একটা মাইক্রোবাস কিনবে। যাতায়াতের প্রবলেম তখন অনেকটা দূর হবে।

বড় সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

আপনাকে কখন নিতে আসবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে স্যার।

দরকার হলে আমি একটা লিফট দিতে পারি।

থ্যাংক ইউ স্যার। আমার দরকার নেই।

রফিক এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। চোখ বড় বড় করে বলল, বাড়িতে পৌঁছামাত্র আজ একটা 'ফাইটিং চিত্র' হবে। ভাইয়া আগুন খেয়ে লাফাচ্ছে।

দেরি হয়েছে বলে?

হুঁ।

তার দেরি হয় না? সেও তো প্রায়ই রাত এগারোটার দিকে বাড়ি ফেবে। পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে না? মহিলাদের বাড়ি ফিরতে হবে সূর্য ডোবার আগে।

কেন।

আমি জানি না কেন? এটাই নিয়ম। চলো ভাবী রওনা হওয়া যাক।

নীলু বলল, কিছু মিষ্টি কিনতে চাই রফিক। দেহি এখন হয়েই গেছে আরেকটু হোক।

মিষ্টি কেন?

তোমার ভাইয়ার রাগ কমানোর জন্যে। বলতে বলতে নীলু হেসে ফেলল।

হাই পড তোমার প্রমোশন হয়েছে নাকি, বিগ বস?

না সেসব কিছু না। বলব তোমাকে, চলো রিকশা নেই। নিউমার্কেট পর্যন্ত রিকশায়

নিউমার্কেট থেকে বেবিট্যাক্সি নেব।

লাগণ ঠাণ্ডা পড়েছে। হু হু করে শীতের হাওয়া বইছে। সাড়ে আটটা বাজে কিন্তু

লাগণ জনশূন্য। রফিক বলল, এত বড় শহর ঢাকা কিন্তু এখনো কেমন গ্রামের ছাপ

আটটা না বাজতেই লোকজন বাড়ি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলু কিছু বলল

লাগণ কেন জানি বড় ভালো লাগছে।

পেস ক্লাবের সামনে এসেই রফিক বলল, এক মিনিট ভাবী, একটু দেখে যাই।

কি দেখবে?

কোনোটি ছেলে চাকরীর জন্যে আমরণ অনশন শুরু করেছে। এদের একটু দেখে

তুমিও আসো এক মিনিট লাগবে।

সাতজন ছিল দিনে, এখন দেখা গেল তিনজনকে। কবল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

এদের এর মধ্যে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। ঘন ঘন নাক ঝাড়ছে। আশেপাশে কোনো

লোকজন নেই। একটি নীল শাড়ি পরা অসম্ভব রোগা মেয়ে টুলের উপর বসে আছে

মুখে। অনশনকারীদের কারোর স্ত্রী হবে। এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে।

রফিক বলল, কি ভাইসব কেমন আছেন?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

আপনি তো দেখি একেবারে সর্দি লাগিয়ে বসে আছেন। দেখেন শেষে নিউমোনিয়া
নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে বসবেন।

রোগা মেয়েটি বিড়বিড় করে কি যেন বলল। সে ডাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। তীক্ষ্ণ

ও তীব্র দৃষ্টি। নীলুর অস্বস্তি লাগছে। রফিক বলল, আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন?

সিগারেটে অনশন ভঙ্গ হয় না। খাবেন কেউ? আমার কাছে ভালো সিগারেট আছে।

এদের মধ্যে শুধুমাত্র সর্দিতে কাতর লোকটিই হাত বাড়াল।

তারা বাসায় পৌঁছল রাত নটা কুড়িতে। নীলু যেমন ভেবেছিল তেমন কিছু হলো
না। সফিক বসার ঘরে পত্রিকা পড়ছিল সে চোখ তুলে একবার তাকাল তারপর আবার
গাও হয়ে পড়ল পত্রিকা নিয়ে।

মনোয়ারা কোনো কথাই বললেন না। হোসেন সাহেব শুধু বললেন, এ রকম দেরি
চলে আগে থেকে বলে যেও মা। যা দৃষ্টিশ্রী হচ্ছিল। ঢাকা শহর দুই লোকে ভরে গেছে।
রাজধানীগুলিতে যা হয় সমস্ত দেশ থেকে আজ বাজে লোকেরা ভীড় করে রাজধানীতে।

টুনী ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় ঘুমিয়েছে। শাফায়া মশারি ঝাটছে।
নীলু নিচু হয়ে টুনীর গালে চুমু খেল। ঘুমের ঘোরেই টুনী হাত দিয়ে খান্না দিল মা'কে।
দেবতে ফিরে আসা মা'কে সে যেন গ্রহণ করতে পারছে না। শাহানা বলল, টুনী আজ
শুণ বিরক্ত করেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বিকেল থেকেই খুব কান্নাকাটি শুরু করেছে, মা'র কাছে যাব। মা'র কাছে
যাব। তারপর ভাইয়া এলো। তুমি তখনো ফেরনি দেখে সেও রোগে গেল।

নীলু ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। শাহানা বলল, ভাইয়া বিকেলে চা-টা ফায়িনি। তখন থেকে পত্রিকা নিয়ে বসার ঘরে বসে আছে। আমাকে শুধু একটা দিল।

কেন?

গ্রাসে পানি ঢালতে গিয়ে পানি ফেলে দিয়েছিলাম।

নীলু বেশ অবাক হলো। সফিক কখনো ছোটখাটো কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়। অন্য কোনো কারণে কি তার মেজাজ খারাপ হয়েছে? অফিসে কোনো ঝামেলা হয়ে নাকি? শাহানা বলল, তোমাকে ভাইয়া কিছু বলেছে?

না।

নির্দাত বলত। কবির মামা এসেছেন তো ভাই নিজেকে চেক করেছে।

কবির মামা এসেছেন নাকি?

হঁ। আটটার সময় এসেছেন। শুয়ে আছেন শরীর ভালো না।

এবারও কি হেঁটে এসেছেন?

না হেঁটে আসেননি। রিকশা করেই এসেছেন। তবে কাহিল। কবির মামা বেশি দি আর বাঁচবে না।

নীলু কাপড় বদলে কবির মামার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি বাতি নিভিয়ে শুতে ছিলেন। নীলুকে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।

কেমন আছেন মামা?

ভালোই আছি। বেটি। থাক থাক সালাম লাগবে না। শরীরটা ভালো তো মা?

জ্বি ভালো। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ পেয়েছি। চিঠিতে তুমি মা দুটা সাধারণ বানান ভুল করেছ। এটা ঠিক না। বিশদ বানান লিখে 'ষ' দিয়ে। তারপর মুহূর্ত বানানও ভুল।

নীলু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

চিঠিপত্র লেখার সময় হাতের কাছে ডিকশনারি রাখবে। ডিকশনারি আছে না ঘরে? আছে মামা।

ওড। কোনটা আছে, আধুনিক সংসদ অভিধান?

নীলু না জেনেই মাথা নাড়ল। কবির মামা বললেন, রাতে শোবার সময় ডিকশনারিতে বানান দুটা দেখে নিও মা।

জি আচ্ছা দেখব। আপনি খাওয়া-দাওয়া করেছেন?

না রাতে আর কিছু খাব না। শরীরটা আগের মতো নাই। পরিশ্রম করলে পারি না।

না খেলে তো শরীর আরো খারাপ করবে।

এটা ঠিক না। মাঝে মধ্যে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করলে শরীরের বিশ্রাম হয়। সবাই তো বিশ্রাম চায়।

নীলু ঘুমতে গেল অনেক রাতে। সফিক তখনো জেগে। নীলুর জন্যেই অপেক্ষা করছে বোধহয়। শোবার ঘরের প্রাইভেসিতে কিছু কিছু কড়া কথা শুনাবে। নীলু একটা পিঁচিটে দুটি সন্দেশ এবং এক গ্রাস পানি নিয়ে ঘরে ঢুকল। মৃদুস্বরে বলল, মিষ্টি খাও।

না।

১১০ ৥ একটা অন্তত ঝাও ।

১১১ ৥ একটি মিষ্টির খানিকটা ভেঙে মুখে দিল । নীলুকে অবাক করে দিয়ে সহজ স্বপ্ন,

১১২ ৥ নিভিয়ে গুয়ে পড়ো । রাত হয়েছে ।

১১৩ ৥ গাতি নিভিয়ে দিল । সফিককে কি আজ রাতেই তার সুইডেনের ব্যাপারটা বলা । দু'জন গুয়ে আছে পাশাপাশি । হাত বাড়ালেই একে অন্যকে ছুঁতে পারে । তবু ।

১১৪ ৥ দু'প্রান্তেই না বাস করে । নীলু মৃদুস্বরে ডাকল, এ্যাঁই ঘুমাচ্ছ?

১১৫ ৥ আমাদের বোর্ড মিটিং হলো, আমাদের সবাইকে চারটা বোনাস দিয়েছে ।

১১৬ ৥ তাহোই তো ।

১১৭ ৥ মন খারাপ হয়ে গেল । বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই সফিকের গলায় । ভদ্রতা করেও ।

১১৮ ৥ একটা কথা বলতে পারত । নীলু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আমার আর । ভালো স্বপ্ন আছে ।

১১৯ ৥

১২০ ৥ আমাকে ওরা ট্রেনিং-এ সুইডেনে পাঠাচ্ছে । ইমাসের ট্রেনিং ।

১২১ ৥ কেব সেটা?

১২২ ৥ মাঠে কিংবা এপ্রিলে । আমি ঠিক জানি না ।

১২৩ ৥ সফিক আর কোনো কথা বলল না । কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিশ্বাস ভারী হয়ে

১২৪ ৥ একজন সুখী মানুষের নিশ্বাস ঘুম । ঘুমের মধ্যেই সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্ন দেখতে

১২৫ ৥ আজ রাতে নীলুরও স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করছে । কোনো এক দূর দেশের স্বপ্ন । যে

১২৬ ৥ দেশে দুঃখ নেই, অভাব নেই, ক্ষুধা নেই । যেখানে চাকরির জন্যে কেউ আমরণ অনশন

১২৭ ৥ করে না । স্ত্রীরা বাড়ি ফিরতে দেরি করলেই স্বামীদের মুখ অন্ধকার হয় না ।

১২৮ ৥ সেই দেশের আকাশ এদেশের আকাশের চেয়েও অনেক বেশি নীল । গাছপালা

১২৯ ৥ অনেক বেশি সবুজ ।

১৩০ ৥ কবির মামা রফিককে নিয়ে বের হয়েছেন ।

১৩১ ৥ তাঁর হাতে প্রকাশ জাবনা খাতা । ছাত্রদের নাম ঠিকানা সেখানে লেখা, প্রথমে

১৩২ ৥ বাবেন নীলক্ষেতে-ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার । মুকসেদ আলি থাকেন সেখানে ।

১৩৩ ৥ এনোসিয়েট প্রফেসর । রফিকের সঙ্গে যাবার কোনো ইচ্ছা ছিল না । মানুষের খড়্গে বাড়ি

১৩৪ ৥ গিয়ে চাঁদা তোলার কোনো অর্থ হয় না । তাছাড়া কেউ দেবেও না কিছু । নিজেরই চলে

১৩৫ ৥ যা চাঁদা দেবে কি ।

১৩৬ ৥ কিন্তু তবু সঙ্গে যেতে হলো । কবির মামা নিউমার্কেটের রাস্তা থেকে নেমে হাঁটা শুরু

১৩৭ ৥ করলেন । রফিক গম্বীর গলায় বলল, চাঁদা তোলার ব্যাপারটা কী মামা হেঁটে হেঁটে করা

১৩৮ ৥ হবে?

১৩৯ ৥ হ্যাঁ । আপত্তি আছে?

১৪০ ৥ আছে ।

১৪১ ৥ তোর জন্যে মোটরগাড়ি লাগবে?

পেলে ভালো হতো আপাতত একটা রিকশা হলেই চলবে।

টাকা যেটা উঠবে সেটা তো রিকশা ভাড়াতেই চলে যাবে।

রিকশা ভাড়া আমি দেব।

তুই দিবি কোথেকে? তুই তো এখনো সিদ্দাবাদের ভূতের মতো ভাইয়ের ঘায়ে
আছিস।

সেটা নিয়ে এখন কোনো আর্গুমেন্টে যেতে চাই না। শুধু এইটুকু স্টাট ভাষায়।
চাই হাঁটাইটি সম্ভব না।

যা তুই চলে যা। আমি একাই পারব।

রফিক গেল না। মুখ আমসি করে আসতে লাগল পাশাপাশি। মুকসুদ
সাহেবকে বাসায় পাওয়া গেল। ভদ্রলোক, স্যারকে দেখে যে পরিমাণে উৎসাহিত হা।
ন্যারের নীলগঞ্জ প্রজেক্টের কথা শুনে ঠিক সে পরিমাণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন।

আপনি একা কতটুকু করবেন স্যার?

একা কোথায়? ডোমরা সবাই আছ আমার সঙ্গে। আছ না? তাহাড়া পৃথিবীর অ
বড় বড় কাজ একা একাই করা হয়েছে।

বহু টাকা-পয়সার ব্যাপার স্যার।

টাকা-পয়সার ব্যাপার তো আছেই। তুমি কত দিবে বলো? কবির মামা খাতা খ
ফেললেন।

তোমাকে নিয়েই শুরু।

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, মাসের প্রথমদিক ছাড়া তো স্যার আমার প
সম্ভব না। ইউনিভার্সিটির মাস্টারদের মাসের প্রথমদিকে কিছু টাকা-পয়সা থাকে তারপ
নুন নাই পাওয়াও নাই অবস্থা।

মাসের প্রথমদিকে আসব?

আপনার আসার স্যার দরকার নেই। ঠিকানা রেখে যান। আমি কিছু পাঠিয়ে দেব
তোমার কথাবার্তা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে না তুমি পাঠাবে। মনে হচ্ছে তুমি চেষ্টা
করছ আমাকে বিদায় করতে।

মকসুদ আলি সাহেবের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। রফিক দারুণ অস্বস্তিবোধ
করল। কবির মামার কথাবার্তার কোনো মাত্রা নেই। যা মনে আসছে বলে ফেলছেন।
এই যুগে মনের কথা সব সময় বলা যায় না। চেপে রাখতে হয়।

মকসুদ আমি উঠলাম। মাসের প্রথমদিকে আবার আসব। আমি হিম্মি কক্কপ, যেটা
কামড়ে ধরি, সেটা ছাড়ি না। ইউনিভার্সিটির মাস্টারদের মধ্যে আমার ক্ষয় কৌন ছাত্র
আছে?

ঠিক বলতে পারলাম না।

একটু বোঝ করবে। আর শোনো, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আমার প্রজেক্টের কথা
বলবে। সবাই তো আর তোমার মতো না। কেউ কেউ উৎসাহিত হবে।

আমি বলব।

নীলক্ষেত থেকে কবির মামা গেলেন মতিখিল। তিন চারজন ছাত্রের নাম ঠিকানা
আছে তাদের মধ্যে একজনকে শুধু পাওয়া গেল। সেই ছাত্র স্যারকে দেখে ভূত দেখার

কাজে উঠল। স্যারের কথাবার্তা শুনে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমতা আমতা করে
এক ৭৬ কাজ কি স্যার প্রাইভেট সেটরে হয়? সরকারি সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব

প্রশ্নে যদি তুমি ধরে নাও সম্ভব না তাহলে আর সম্ভব হবে কিভাবে?

অনেক-অড়িত হয়ে স্যার অনেকে অনেক প্রোগ্রাম নেয়। সোনার বাংলা করতে
কাজ আর হয়?

হবে না কেন?

ছাত্রটি মৃদুরে বলল, চা খান স্যার। আপনি বেগে যাচ্ছেন।

তুমি বেকুবের মতো কথা বলবে আমি রাগতেও পারব না।

আমি স্যার প্রাকটিক্যাল প্রবলেমগুলির দিকে আপনার দৃষ্টি ফেরাতে চাচ্ছি।

কাজে আমার আগেই তুমি প্রবলেমের কথা ভাবতে শুরু করেছ? আমার ছাত্র
লোকালপন তো তুমি এতটা বোকা ছিলে না। সেই সময়তো তোমার কিছু বুদ্ধিগুণ

রফিক, কবির আমার কথাবার্তায় স্তম্ভিত। বলে কি এই লোক? ছাত্রটি অবশি

ছাত্রটি ভদ্র ব্যবহারই করল। চা কেক টেক আনিয়ে খাওয়াল এবং ফিরে আসার সময়

টাকার দুটি চকচকে নোট দিল। এটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। রফিক

নিয়েছিল এই লোকের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। মুখ শুকনো করে বলবে,

একদিন আসুন। দেখি কিছু করা যায় কিনা।

সম্ভব না বলে বলল, সামনের মাসে আসেন একবার দেখি আর কিছু করা যায়

কিনা।

করা যায় কিনা বললে তো হবে না। করতেই হবে।

গাভার নেমেই রফিক বলল, চলো মামা বাড়ি যাওয়া যাক। একদিনে তো রোজগার

কালোই হল। কবির মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, এখনই বাড়ি যাবি কি?

আরো ঘুরবে?

ঘুরব না মানে? কাজটা সহজ ভাবছিস তুই?

আগামীকাল থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করলে কেমন হয়?

তোর কাজ থাকলে তুই চলে যা।

দুপুর হয়ে গেছে খাওয়া-দাওয়া করবে না। তাছাড়া এখন লাক টাইম কাটতে পাবে

না। তারচে' চল খানাপিনা করা যাক।

কোথায় খাবি?

সস্তার একটা হোটেল আছে সেতুনবাগানে। সেখানে যেতে পারি। কিংবা তুমি

ভাবীর অফিসে গিয়েও যেতে পারি। ভালো ক্যান্টিন আছে।

চল যাই সেখানে।

তবে মামা সেখানে না যাওয়াই ভালো।

কেন?

আমি তো বলতে গেলে রোজ দুপুরে খাচ্ছি সেখানে এখন তোমাকে নিয়ে গেলে

আমাদের লোকজন ভাববে পুরা ফ্যামিলি এনে পার করে দিচ্ছে।

চল তাহলে সেগুনবাগানের দিকেই যাই।

একটা রিকশা নেয়া যাক কি বলো?

নে একটা।

সেক্রেটারিগ্রেটের কাছে এসে রিকশা থেকে নেমে যেতে হলো। মিছিল বের হ
একটা। আকাশ ফাটানো গর্জন উঠছে, ‘গণতন্ত্র চাই, গণতন্ত্র চাই’!! কবির মামা
নিঃশ্বাস ফেলে কলেন, স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের জন্যে মিছিল বের করতে হচ্ছে।
লঙ্কার ব্যাপার আর কি হতে পারে?

রফিক কিছু বলল না। কবির মামা বললেন—মিছিলটা কাদের? রফিক বিরক্ত
বলল, মানুষদের মিছিল আবার কাদের? তুমি কি মামা মিছিলে ডিড়ে যাবে নাকি?
না?

হঁ, খাব।

তাহলে দাঁড়াও মিছিল চলে যাক।

চল ঝানকটা যাই। প্রেসক্লাবের সামনে বেরিয়ে পড়লেই হবে।

রফিকের বিরক্তির সীমা রইল না। সে ইচ্ছা করেই পিছিয়ে পড়ল। সিগারেট
দরকার। দীর্ঘ সময় বিনা সিগারেটে চলেছে। বুক ব্যথা করছে এখন। মিছিল আ
খুব শ্রুত গতিতে। লক্ষণ ভালো নয়। নিরীহ ধরনের এইসব মিছিল মাঝে মাঝে ত
চরিত্র নেয়।

এটিও হয়তো নেবে। রফিক সিগারেট টান দিয়ে স্রোগানে গলা মিলাল, “
চাই, বাঁচতে চাই। বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।”

কবির মামা ক্লান্ত মুখে প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অনশন করা
তিনটি এখনো আছে। নীল শাড়ি পরা মেয়েটিও আছে। আশেপাশে আর কেউ
যেন এই ব্যাপারটিতে কারো কোনো উৎসাহ নেই।

রফিক কাছে আসতেই কবির মামা বললেন, দেশের কি অবস্থা দেখেহিস? চা
দাবিতে অনশন করতে হচ্ছে। কি সর্বনাশের কথা।

রফিক কিছু বলল না।

কবির মামা বললেন, বাথরুমে যাওয়া দরকার।

বাথরুম কোথায় পাবে এখানে? বসে যাও রাস্তার পাশে।

কি যে কথাবার্তা তোর।

তাহলে যাও প্রেসক্লাবে গিয়ে বলো, আমি নীলগঞ্জের প্রভাতী পত্রিকার সম্প
আমাকে একটু পেছাব করার সুযোগ দিন।

কবির মামা বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন প্রেসক্লাবের দিকে। রফিক গেল নীল
পরা মেয়েটির কাছে।

অনশনের আজ কতদিন?

ছয়দিন।

বলেন কি?

বিছানায় শুয়ে থাকে মানুষ তিনজন চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। মেয়েটি :
আপনি কি কাগজের লোক?

না। আমিও একজন বেকার। তুমি ভাই, আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন? ভালো
সিগারেট আছে আমার কাছে খেতে পারেন। মেয়েটি বলল, আপনি বেকার, ভালো
সিগারেট পেলেন কোথায়?

আমার ভাবী প্রজেক্ট করেছে। আপনি কে?

আমার নাম রীতা।

এবার মধ্যে আপনার কেউ আছে?

আমার ছোট ভাই আছে।

কোনজন?

মেয়েটি আঙুল দিয়ে দেখাল। এই লোকটিই বোধহয় কাল রাতে সিগারেট
খাওয়াতেন। রফিক বলল, কি নাম ভাই আপনার?

কাদ্দ।

কই হচ্ছে খুব?

লোকটি জবাব দিল না।

সিগারেট নিবেন?

না।

কবির মামা আসতে দেরি করছে। তাঁর বড় বাথরুমে পেয়েছে কি না কে জানে।
কক আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীল শাড়ি পরা রোগা মেয়েটি কি কিছু খেয়েছে?
কক মনে মনে ভাবল মেয়েটিকে যদি বলা হয়, আসুন আপনি আমাদের সঙ্গে চারটা
খান, তাহলে সে কি আসবে? মনে হয় না। মেয়েদের আত্মসম্মান খুব বেশি।



সফিক অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। নীলু এসে বলল, এখানে তোমার একটা
কাগজ লাগবে।

কিসের সই?

আমার পাসপোর্টের দরখাস্তের ফরম। স্ত্রীর দরখাস্তে স্বামীর সিগনেচার লাগে কিন্তু
আমার দরখাস্তে স্ত্রীর কোনো সিগনেচার লাগে না, অতীত নিয়ম-কানুন।

সফিক গম্ভীর স্বরে বলল, তোমার সুইডেনের ব্যাপার?

হ্যাঁ। আমাদের অফিসের একজন কলিগ দশ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট আনিতে দিবে।

খুব কাজের লোক মনে হয়।

খুবই কাজের। আমাকে একটা টিভি কিনে দিয়েছেন এক হাজার টাকা কম দামে।

বলেই নীলু জিন্দে কামড় দিল। টিভির কলিগ এখন সে বলতে চায়নি। এটা ছিল
দশদিনে একটা সারপ্রাইজ। আজ সন্ধ্যায় ইসমাইল সাহেবের টিভি নিয়ে আসার
কথা।

সফিক বলল, টিভি কিনছ নাকি?

হঁ।

কই আগে তো কিছু বলোনি।

তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।

ঘরে আসবে কবে?

আজই আসবে। সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসার কথা।

নীলু উজ্জ্বল চোখে হাসল। মনোয়ারা বাইরে থেকে ডাকলেন, শুনে যাও তো।

কয়েকদিন ধরেই তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে আছেন। কথাবার্তা বলছেন না। কিন্তু

যে কোনো কারণেই হোক মেজাজ ভালো।

কি ব্যাপার মা?

আজ অফিসে না গেলে হয় না?

কেন মা?

আছে একটা ব্যাপার।

মনোয়ারা মুখ টিপে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন। নীলু কিছু বুঝতে পারল না।

কি মা না গেলে চলে?

হ্যাঁ চলবে না কেন? বীণাদের বাসা থেকে টেলিফোন করে দেব। ব্যাশারটা কি

শাহানাকে দেখতে আসবে।

দেখতে আসবে মানে?

সাড়ে তিনটার সময় আসবে, ছেলের এক চাচি আর ছেলের মা।

নীলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার শাতড়ি বিয়ের আলাপ-আলোচনা অনেকাংশেই করছেন এটাকে সে কখনই গুরুত্ব দেয়নি। মায়েরা, মেয়ে একটু বড় হলেই ঝি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে। এটাও সে রকমই ভেবেছিল। এখন মনে হচ্ছে রকম নয়। নীলু বলল, কই মা আমি তো কিছু জানি না।

জানার মতো কিছু হলে তবেই না জানবে। তোমার খিলগাঁয়ের মামা স্বস্তর সন্তানলেন। ওরা একজন অল্প বয়েসি মেয়ে চায়, তবে সুন্দর চায়। আর কিছু না।

এখন বিয়ে দিলে তো পড়াশোনা হবে না।

বিয়ে না দিয়েই যেন কত পড়াশোনা হচ্ছে। কোনো মতে ম্যাট্রিক হয়েছে। আইএ পাস হবে না। তুমি যাও তো শাহানাকে বলে আসো আজ কলেজে যেতে হবে না।

ছেলে কি করে?

ছেলে রাজপুত্রের মতো। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা ব্রিটিশ ডিসট্রিক্ট জজ। বিরাট বড় লোক। ছেলের ছবি আছে আমার কাছে দেখবে।

নীলু মন থেকে কোনো আগ্রহ দেখাতে পারছিল না, কিন্তু আগ্রহ না দেখালে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। নীলু দেখতে গেল। ছবি দেখে স্বীকার করতেই হলো ছেলেটি অত্যন্ত সুপুরুষ। যাদের দেখলেই মনে হয়, আহা না জানি কিনি মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ে হবে।

মনোয়ারা বললেন, ছবি কেমন দেখলে মা?

ভালো।

ওধু ভালো?

কান্দে যা খুবই সুন্দর, করে কি?

জানাবার গাল ভর্তি করে হাসলেন। নীলু আবার বলল-ছেলে কি করে?

কামার দাবণা ছেলে যখন এত সুন্দর, তখন নিশ্চয় মাকাল ফল। আমারও সে
দাবণা ছিল। ছেলে কিন্তু খুব ভালো। ওকালতি করছে খুব ভালো প্রাকটিস।

যখন এটা তাহলে অনেক বেশি।

যখনই বেশি নয়। এ বছরই বারে জয়েন করেছে। তুমি যাওতো বৌমা, শাহানাকে
জানিয়ে নিষেধ করো। ওকে কিছু বলবে না। জানতে পারলে কান্নাকাটি-চোঁচামেচি

০৩৭।

শাহানা কলেজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। নীলুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, তুমি
খানসে যাওনি ভাবী?

না।

কেন?

কামো লাগছে না।

হাতলে আমিও আজ কলেজে যাব না।

ট্রিক আছে না গেলে।

মা বকাবকি করবে।

তা হয়তো করবেন।

কালে করুক। আমি কলেজে যাব না আজ। তুমি মাকে একটু বলে আসো আমার
জানা পরেছে কিংবা কিছু একটা হয়েছে।

শাহানা হঠাৎ চিন্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কলেজে যেতে হচ্ছে না এতে সে দারুণ
কষ্ট। তার দাবণা ছিল যা কিছু বলবেন কিন্তু তিনি কিছু বলছেন না। এ রকম সৌভাগ্য
কখনও পূর্ব বেশি হয় না। সে টুনীকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে বেড়াতে গেল।

আনিসের ঘরের দরজা খোলা। শাহানা উঁকি দিল।

কি করছেন আনিস ডাই?

তেমন কিছু না। এসো ভেতরে।

শাহানা ভেতরে ঢুকল না। আনিস হাসি মুখে বলল, নতুন একটা চাইনিজ ট্রিক
খিঁড়ি দেখবে?

না।

শাহানা দরজার সামনে থেকে সরে এলো। আনিস বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

এই যে শাহানা তাকাও এনিকে? কি আছে হাতে? আহ চূপ করে আনিস কেন বল।
কিছু নেই।

ওড। এই দেখ হাত বন্ধ করলাম।

আনিস মুঠি খুলল। চমৎকার একটি গোলাপ তার হাতে। শাহানা রাগী গলায় বলল,
আবার আপনি আমাদের টবের গোলাপ ছিড়েছেন?

গোলাপ ছিড়েছি কি না ছিড়েছি সেটা পরে আসে বলো ম্যাজিকটা কেমন?

এই ম্যাজিকটা শেখার পর আপনি আমাদের টবের সবগুলি গোলাপ নষ্ট করেছেন।
এটা ছিড়েছেন আজ সকালে। কেমন মানুষ আপনি বলেন তো?

আচ্ছা যাও আর ছিড়ব না। কথা দিচ্ছি।

গোলাপ কি আর আছে যে ছিড়বেন? সবই তো শেষ করে ফেলেছেন। আচ্ছা একটু মায়াও লাগে না, না?

আনিস লজ্জা পেয়ে গেল। গোলাপ গাছগুলি শাহানার খুব প্রিয়। সব তুলে কেঁচু ঠিক হয়নি। শাহানার যা রাগ। পড়তে সময় লাগবে। আনিস মৃদুস্বরে বলল গোলাপ নাও শাহানা।

আমার দরকার নেই।

টুনি হাত বাড়াল। শাহানা তাকে একটা ধমক দিল। কড়া গলায় বলল এদিকে নিতে হবে না। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনোয়ারা ডাকছেন শাহানাকে। শাহানা আবার আকাশের মতো মুখ করে নিচে নেমে গেল।

আনিস গোলাপ নিয়ে প্রাকটিস চালান খানিকক্ষণ। ফুলটা প্রকাণ্ড। একে ঠিক 'পাম' করা মুশকিল। কিন্তু প্রাকটিসের একটা মূল্য আছে। হাত অভ্যস্ত হয়ে আসে। এখন সে অনায়াসে ফুলটি লুকিয়ে রাখতে পারে। গোলাপ তৈরির ম্যাজিকে সে বিশ্বাসী। সর্বশ্রেষ্ঠ হতে চায়। যেখানেই সে হাত দেবে সেখানেই তৈরি হবে একটি রক্ত-গোলাপ।

দশটার মতো বাজে। আনিসের তেমন কিছু করার নেই। শরাফ আলির কাছে গেলে কেমন হয়? ফুলের এই ম্যাজিকটা শরাফ আলির কাছ থেকে শেখা। তাকে অবশ্য কখনোই পাওয়া যায় না। তাকে ধরার একমাত্র কৌশল হচ্ছে বার বার যাওয়া। কিন্তু শরাফ আলি যে জায়গায় থাকে সেখানে বার বার যাওয়া সম্ভব নয়। এবং যাওয়া ঠিক নয়।

প্রথমবার গিয়েছিল বদরুলের সঙ্গে। নওয়াবপুর রোডের এক গলিতে বদরুল টুকে পড়ল। নর্দমার পাশ দিয়ে যাবার রাস্তা। পচা গন্ধে পা শুলাতে শুরু করল। গলির ভেতরে তাসা গলি। নবাবী আমলের বাড়িঘর সেদিকে। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ার কথা কিন্তু ভেঙে পড়ছে না। অধিকাংশ বাড়িরই দরজা জানালা নেই। মোটা চট ঝুলছে। দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার ভাব।

আনিস ঘাবড়ে গিয়ে বলল,

কোথায় নিয়ে এলেন বদরুল ভাই?

আসল জায়গা।

আসল জায়গা মানে?

সন্ধ্যা না হলে বুঝবে না। ঢাকা শহরের এটা খুব একটা বান্দানি অঞ্চল। তাহা একটি দোতলা জরাজীর্ণ লাল ইটের দালানের সামনে দাঁড়াল। বদরুল গলা উচিয়ে ডাকতে লাগল, শরাফ আলি ভাই আছেন? শরাফ আলি ভাই। কেউ কোনো সাড়া দিল না। বদরুল নিচু গলায় বলল, পামিংয়ের আসল লোক। ওস্তাদ আদমী। তবে শালা মারাত্মক ঝুঁকর।

বহু ডাকাডাকির পর নীল লুঙ্গী পরা বুড়োমুখ একজন লোক বেরিয়ে এলো। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তাকালো চোখ লাল হয়ে। বদরুল দাঁত বের করে বলল, শরাফ ভাই ভালো আছেন?

হঁ।

সুনাচ্ছিলেন নাকি?

ঠ।

আনিসকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে। বলেছিলাম তো তার কথা আপনাকে। খুব
৭৬ শরের ছেলে। আপনার কাছ থেকে দু'একটা কৌশল শিখতে চায়। সাধ্যমত টাকা-
৭৭ পাখি খরচ করবে। কয়েকটা পামিং যদি...

আরেকদিন আসেন।

আপনাকে তো শরাফ ভাই পাওয়া যায় না। আসছি যখন একটু বসি, আলাপ-
৭৮ পাওয়া যাক।

আরেকদিন আসেন। সেই ভালো না।

শরাফ আলি দ্বিতীয় কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বদরুল
৭৯ আগে খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করল কিন্তু লাভ হলো না। শরাফ আলির সঙ্গে সেই প্রথম
৮০ পাওয়া গেল।

ফিরবার পথে বদরুল বলল, এই লোক অনেক কিছু জানে। ম্যাজিক শিখতে হলে
৮১ এ সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। জায়গাটা খারাপ। তোমাকে ঘন ঘন এখানে আনা ঠিক
৮২ না তবে গরজটা যখন তোমার।

লোকটা কেমন?

শরাফ মিয়ার কথা বলছে? এই শ্রেণীর লোক যতটা ভালো হতে পারে ততটাই।
৮৩ বেশিও না কমও না।

শরাফ মিয়াকে আনিসের মনে ধরল। অসাধারণ পামিং জানে লোকটা। চোখের
৮৪ পামিংকে সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেলল। হাত উল্টে উল্টে দেখাল হাতে সিগারেটের
৮৫ প্যাকেট নেই। কিন্তু হাতেই আছে দর্শকের চোখে পড়ছে না। অপূর্ব কৌশল। আনিসের
৮৬ পামিংয়ের সীমা রইল না। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, আমার পক্ষে কি শেখা সম্ভব?

শরাফ মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, সম্ভব না।

কেন সম্ভব না কেন?

এসব ভদ্রলোকের কাজ না। ছোট লোকের কাজ। ভদ্রলোকের হাতের তালু
৮৭ টক্ষামত নরম হয় না।

চেঁচা কানে দেখতে পারি।

ই, তা পারেন।

প্রথমদিনেই গোলাপ লুকিয়ে রাখার কৌশল শিখিয়ে দিল। ভারী গম্ভীর বলল,
৮৮ ফুলের বোঁটাটা ধরতে হয় আঙুলের ফাঁকে। ফুলটা একবার থাকবে হাতের তালুর দিকে
৮৯ একবার থাকবে পিঠের দিকে এইটা করতে হয় চোখের পাতা ফোলাতে যত সময় লাগে
৯০ তার চেয়েও কম সময়ে।

কতদিন লাগবে শিখতে?

তিন-চার বছর। এর বেশিও লাগতে পারে।

বলেন কি?

ম্যাজিক ভদ্রলোকের কাজ না। ছোটলোকের কাজ।

আনিস অবশিষ্টি চার মাসের মাথাতেই ব্যাপারটা মোটামুটি ধরে ফেলল। শরাফ মিয়া নির্লিপ্ত হয়ে বলল, আপনার হইব। কিন্তু কি করবেন এইসব শিইখা? লাভ কি? কোনো লাভ নেই?

কোনো লাভ নেই, এক সময় রাজা বাদশারা ছিল, এরা এইসব জিনিসের কথা করত। এখন রাজাও নাই, বাদশাও নাই। সব ফকির। ফকিরের দেশে ম্যাজিক চলে না।

এই গলির ভেতর ঢুকতে আনিসের সব সময় একটু গা ছম ছম করে। সব সময়ে মনে হয় সবাই বোধহয় বিশেষ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। একবার ঢুকে পড়লে এই অবস্থিটা কেটে যায়, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অবস্থি লাগে। অনেকদিন ধরে সে আসা-যাওয়া করছে এদিকে তবু অবস্থির ভাবটা কাটছে না।

পানের দোকানের বেঁটে বুড়োটি আনিসকে দেখে পরিচিত ভঙ্গিতে হাসল, ভালো আছেন ভাইসাব?

ভালো।

শরাফ ভাইয়ের কাছে যান?

হঁ।

আচ্ছা যান। নিশ্চিতে যান। কেউ আপনাদের কিছু কইব না। বলা আছে সবেরে।

শরাফ মিয়াকে পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর রেশমা জানালা খুলে বলল, বাসায় নাই।

কখন আসবেন?

জানি না।

মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দিল। আনিস দাঁড়িয়ে রইল। শরাফ মিয়া অনেক সময় ঘরে থেকেও বলে দেয় বাসায় নাই। ঘন্টা খানিক বাড়ির সামনে হাঁটাইটি করলে এক সময় নিষেই বের হয়ে আসে। চক্ষু লজ্জায় পড়েই আসে সম্ভবত।

আনিস সিগারেট ধরাল।

জানালা খুলল আবার। রেশমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, একবার তো কইলাম নাই। বাড়িত যান। কেন খালি খামেলা করেন?

আর দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হয় না। আনিস হাঁটতে শুরু করল। রেশমা খুব সম্ভব শরাফ মিয়ার মেয়ে। অবশিষ্টি এই অঞ্চলে সম্পর্কের ব্যাপারটা খুব জোরালো নয়। মেয়ে নাও হতে পারে। রেশমার চেহারার সাথে কোথায় যেন শাহানার ছাপ আছে। তবে শাহানার মুখ গোল এই মেয়েটির মুখ লম্বাটে। আনিস লক্ষ্য করেছে এই মেয়েটি তাকে সহ্যই করতে পারে না। কিংবা কে জানে এ অঞ্চলের কোনো মেয়েই হয়তো পুরুষ সহ্য করতে পারে না। সহ্য করতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

পানের দোকানের সামনে আসতেই বুড়ো লোকটি বলল, শরাফ ভাইরে পাইছেন? না। বাসায় নাই।

বাসাতেই আছে। আবার যান।

আবার যেতে ইচ্ছে করছে না। আর গেলেও কোনো লাভ হবে না। রেশমা বিরক্ত হয়ে চেঁচাবে, বাসাত নাই।

শান্তির দিনের রোদে এক ধরনের তীক্ষ্ণতা আছে। দুপুরের দিকে এই রোদ গায়ে পড়লে মতো বিধতে থাকে। আনিসের রোদে হাঁটতে ইচ্ছা করছিল না। রিকশা নিয়ে কালিগঞ্জ চলে যেতে ইচ্ছা করেছে। সেখান থেকে কল্যাণপুরের বাস ধরা যাবে। কিন্তু বাসটির অবস্থা ভালো না। এই অবস্থায় বিলাসিতা প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাহাড়া হেঁটে গালাপ অন্য একটা মজা আছে। ইঠাৎ দু'একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিসিয়ানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন একদিন কুদ্দুসকে পাওয়া গেল।

কুদ্দুস পুরনো ঢাকা অঞ্চলে খুঁজলি বিখ্যাত এবং কান পাকার অশুধ বিক্রি করে। পনেরোটি অশুধ রপ্তা পাওয়া এবং অশুধগুলি দেয়া হয় বিনা মূল্যে। কারণ যিনি এই অশুধ রপ্তা পেয়েছেন তিনি বিক্রি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তবে নাম মাত্র হাদিয়া নেয়া হয়। অশুধ তৈরির খরচ জোগাড় করার জন্যেই। অন্য কোনো কারণে নয়। কুদ্দুস অশুধ বিক্রির আগে লোক জড় করবার জন্যে ম্যাজিক দেখায়। অসাধারণ সে সব ম্যাজিক। প্রথম শ্রেণীর 'পামিংয়ে'র কৌশল। একটি গোককে চারদিক থেকে সবাই ঘিরে আছে এবং সে এর মধ্যেই একের পর এক দেখিয়ে যাচ্ছে—দড়ি কাটার খেলা, পিংপংয়ের খেলা, চমৎকার সব তাসের খেলা। একটি খেলাতো বার বার দেখার মতো। কুদ্দুস একটি হরতনের বিবি নেয় হাতের মুঠোয়। কুদ্দুসের সহকারী নব্বইয়ের ফজল ঘন ঘন ডুগডুগি বাজায়। কুদ্দুস তার ভাষা গলায় গলে,

দেখেন ডাই দেখেন, বিবি সাবরে দেখেন। রাজার ছিল চাইর বিবি। এই বিবির কদর নাই। ঋণ পায় না। মনে দুঃখ। দিন যায় আর বিবি দুবলা পাতলা হয়।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হরতনের বিবির তাসটা ছোট হতে শুরু করে। ফজল ডুগডুগি বাজায় প্রচণ্ড শব্দে। তাস ছোট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যায় অপূর্ব একটি খেলা কত সহজেই না দেখাচ্ছে লোকটি।

আনিস অনেকদিন ধরেই খুঁজছে কুদ্দুসকে। আগে তাকে প্রায়ই পুরনো ঢাকায় দেখা যেত এখন দেখা যাচ্ছে না। জায়গা বদল করেছে বোধ হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা খায়াবার শ্রেণীর হয়। এক জায়গায় থাকতে পারে না বেশি দিন।

আনিস নিজেও কি একদিন তাদের মতো হবে? রাস্তার পাশে তাকে ঘিরে থাকবে লোকজন। ছোট একটি অপুষ্ট শিশু চোখে পিঁচুটি নিয়ে প্রাণপণে ডুগডুগি বাজায়। এবং সে দেখাবে তার বিখ্যাত গোলাপ তৈরির খেলা। খেলা শেষ হবার পর বিক্রি করবে—কালিগঞ্জের বিখ্যাত দাঁতের মাজন। যা নিয়মিত ব্যবহার করলে মুখে দুর্গন্ধ, মাড়ি ফোলা, দাঁতের পোকা কিছুই থাকবে না। আসেন জাইসব ব্যবহার করে দেখেন—কালিগঞ্জের-বিখ্যাত দস্ত-বান্ধব নিম টুথ পাউডার।

মনোয়ারা দুপুরের পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। নীলু মনে মনে বেশ বিরক্ত হলো। শাহনাকে বিয়ে নিতে কোনোরকম সমস্যা হবার কথা নয়। তার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ভালো ভালো সম্বন্ধ আসবে। কিন্তু মনোয়ারা এমন করছেন

যেন মেয়ে গলায় কাঁটা হয়ে বিধে আছে। আজ সাড়ে তিনটায় সেই কাঁটা সরানোর শব্দ ধাপটি শুরু হবে।

বৌমা, শাহানাকে দেখলাম কামিজ পরে ঘুর ঘুর করছে। ওকে একটা শাড়ি পরতে বল।

শাড়ি পরার দরকার কি মা? ওরা তো আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে আসছে না। মনোয়ারা রেগে গেলেন-যা করতে বলছি কর। ওকে ভালো দেখে একটা শাড়ি পরাও। চুলে তেল দিয়ে চুল বেঁধে দাও।

এসব করতে গেলেই শাহানা সন্দেহ করবে।

সন্দেহ করলে করবে।

তারপর ধরুন মা কোনো কারণে ওদের পছন্দ হলো না তখন তো শাহানা খুব শক পাবে।

মনোয়ারা বিরক্ত স্বরে বললেন, চাকরি নেবার পর থেকে তুমি বৌমা বড় বেশি কথা বলছ। তুমি গিয়ে ওকে শাড়ি পরতে বলো। তুমি না বললে আমি বলব।

নীলু শাহানার খুঁজে গেল। শাহানা নিজের ঘরে গল্পের বই নিয়ে বসেছে এবং ঘন ঘন চোখ মুছেছে। ভাবীকে দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

টুনী কোথায় শাহানা?

বাবার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। কত বললাম আমার সঙ্গে এসে ঘুমাতে। তা ঘুমাতে না।

তুমি একটু উঠ তো শাহানা। আমার সঙ্গে যাবে এক জায়গায়।

কোথায়?

ছবি তুলব।

তোমার সেই পাসপোর্টটির ছবি?

না পাসপোর্টের ছবি তোলা হয়েছে। তুমি আর আমি দু'জনে মিলে তুলব। কালার ছবি।

কেন?

স্মৃতি রাখবার জন্যে। দু'দিন পর বিয়ে হয়ে কোথায় কোথায় চলে যাবে।

সব সময় ঠাণ্ডা ভালো লাগে না।

উঠ শাহানা। ভালো দেখে একটা শাড়ি পর।

শাহানা খুশি মনে উঠে এলো। শাড়ি পরল। চুল বাঁধল। সবুজ রঙের ছোট একটা টিপ পরল কপালে। আয়নার নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

ভাবী চোখে কাজল দেব?

কাজলের তোমার দরকার নেই।

কেমন লাগছে আমাকে?

তুমি হচ্ছে পৃথিবীর সেরা রূপসীদের একজন। কোনো ছেলে তোমাকে একবার দেখলে সারারাত বিছনায় হটফট করবে।

তুমি ভাবী খুব অসভ্যের মতো কথা বলো। ভালো লাগে না।

সাজগোজ সারতে সারতেই মেহমানরা এসে পড়লেন। দু'জন বয়স্ক মহিলা। তাঁরা একেবারে খুব অল্প সময়। চা-টা কিছুই খেলেন না। কথা বার্তাও কিছু বললেন না। কালানুগত মহিলাটি নীলুকে বললেন, তোমাকে মা আমি আগে দেখেছি। গুলশান হাটের বিছানার চাদর কিনছিলে।

কথাটা ঠিক না। নীলু কখনও গুলশান মার্কেটে যায়নি। কিন্তু সে কোনো প্রতিবাদ করেন না। শাহানার সঙ্গে তাদের তেমন কোনো কথাবার্তা হলো না। ফর্সা এবং অসম্ভব ধীরে মোটা মহিলাটি বললেন, খুব সাজগোজ করেছ দেখি।

আমরা ছবি তুলতে যাচ্ছি।

গেন টুডিওতে যাচ্ছ? গ্র্যালিফেস্ট রোডের দিকে গেলে চলো আমি নামিয়ে দেব।

জি না। আমরা এই কাছেই যাব। হেঁটে যাওয়া যায়।

ভদ্রমহিলার আচার-আচরণ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। সাড়ে চারটায় তাদের এক জামাগায় দাওয়াত আছে তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন। মনোয়ারার মন খারাপ হয়ে গেল। মেয়ে ওদের পছন্দ হয়নি। পছন্দ হলে চলে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠত না। চা দেয়া হয়েছিল কিন্তু কাপে চুমুক পর্যন্ত দিল না। ভদ্রতা করে হলেও কাপে একটা চুমুক দেবার দরকার ছিল। কালো মহিলাটি সারাক্ষণই নাক উঁচু করে ছিল। কপাল কুঁচকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাত্তিল।

নীলু শাহানাকে নিয়ে ছবি তুলতে গেল সন্ধ্যার আগে আগে। দু'টি ছবি তোলা গেলো। একটিতে নীলু এবং শাহানা। অন্যটিতে শুধু শাহানা। অনেক গুলি টাকা খরচ গেলো শুধু শুধু। ছবি ভালো আসবে কিনা কে জানে। টুডিওর মালিক একজন বুড়ো লোক। সে চোখেই দেখে না ছবি তুলবে কি?

ফিরবার পথে শাহানা বলল, চলো ভাবী ফুচকা খাই। এখানে একটা ফুচকার গাড়ি আছে।

কোথায়?

আরেকটু সামনে যেতে হবে। চল যাই। ফুচকা খাবার পর আমরা একটু হাঁটব কি গল?

সন্ধ্যাবেলা শুধু শুধু হাঁটব কেন? আর এখানে হাঁটার জায়গা কোথায়?

তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে ভাবী। হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলব।

এখনই বলো।

শাহানা শান্ত স্বরে বলল, তুমি ভাবী খুব কাহন্দা করে শাড়ি পরিয়েছ। সাজগোজ করিয়েছ। ঐ মহিলা দু'টি আমাকে দেখতে এসেছিলেন। ঠিক কিনা বলো।

ঠিক।

আমি তো ভাবী তোমার মতো বুদ্ধিমতী নই সহজে কিছু বুঝতে পারি না। ওরা যে আমাকে দেখতে এসেছিলেন সেটা বুঝলাম এই অল্প কিছুক্ষণ আগে।

নীলু হাসল। কিছু বলল না। শাহানা বলল, তোমরা আমাকে বিয়ে দেবার যত চেষ্টাই করো কোনো লাভ হবে না।

তুমি বিয়ে করবে না?

যদি করি, করব আমার পছন্দমত ছেলেকে।

এমন কেউ কি পছন্দের আছে?

শাহানা জবাব দিল না। তার ফর্সা গাল লাল হয়ে উঠছে। শেষ সূর্যের রাতায় ষড়্ সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। নীলু বলল, ছেলেটা কে শাহানা?

শাহানা মাথা নিচু করে বলল, আমি যাকে বিয়ে করব সে খুবই সাধাম একজন মানুষ। তোমরা কেউ তাকে পছন্দ করবে না।

আমরা পছন্দ করব না এমন কাউকে তুমি কেন বিয়ে করবে?

কারণ আমি তাকে পছন্দ করি।

ছেলেটি কে-আনিস?

শাহানা জবাব দিল না। তার ভাসা ভাসা ঘন কালো চোখে জল চিক চিক করতে লাগল। নীলু হালকা গলায় বলল, নিয়ে চলো তোমার ফুচকার গাড়িতে। বেশিদূর নাকি? পরবর্তী এক সপ্তাহে খুব দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটল।

সোমবার

বাসায় টিভি এলো। বারো ইঞ্চি চমৎকার একটা টিভি। হোসেন সাহে শিশুদের মতো হৈচৈ শুরু করলেন। সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত টিভির সান্নে থেকে নড়লেন না। মনোয়ারা কয়েকবার বললেন, এরকম করছ যেন টিভি কোনোদিন চোখে দেখো নাই।

প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল টিভি আনার ব্যাপারটা মনোয়ারা ঠিক পছন্দ করেন না। কিন্তু ফিরোজা বেগমের গানের সময় তিনিও খুব আগ্রহ করে সামনে বসলেন। শুধু সফিক এলো না। হোসেন সাহেব রাত দশটার খবরের সময় উঁচু গলায় ডাকলে, আসো সবাই, খবর হচ্ছে খবর। যেন খবরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা শুনেই হবে। সফিক তখনই শুধু বসল খানিকক্ষণ। হোসেন সারাক্ষণই বলতে লাগলেন, ঐত সুন্দর রিসিপশন আমি কোনো টিভিতে দেখি নাই। আর কি সুন্দর সাউন্ড।

মঙ্গলবার

মনোয়ারাকে অবাক করে দিয়ে ফর্সা ও মোটা মহিলাটি বুড়ো এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সকালবেলা উপস্থিত হলেন। তারা দীর্ঘ সময় কথা বললেন। হোসেন সাহেবের সঙ্গে। সফিকের অফিসে যাওয়া হলো না। তাদের কথাবার্তায় নীলুর ডাক মড়ল না। মনোয়ারা শুধু অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে গেলেন, ওদের শাহানাকে পছন্দ হয়েছে। সেদিনই বিকেলে একটি বিশেষ সময়ে নীলুকে যেতে হলো নিউমার্কেটে। নীলুর সঙ্গে শাহানা। নীলুর ডান করতে হলো যে সে বই কিনছে। শাহানা সারাক্ষণই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রইল এবং এক সময় বলল, যার আমাকে দেখার কথা সে কি দেখেছে?

নীলু অন্যদিকে তাকিয়ে বলল,

দেখাদেশির কোনো বাপার এর মধ্যে নেই। বই কিনতে এসেছি বই কিনে চলে
যা।

কেন আমাকে মিথ্যা কথা বলছ ভাবী? কালো সুট পরা লোকটি এসেছিল আমাকে
দেখাতে।

খুব সুন্দর না ছেলেটা?

শাহানা জবাব দিল না। নীলু বলল, এমন চমৎকার ছেলের কথা শুধু গল্প
উপন্যাসেই পড়া যায়। শাহানা গম্ভীর হয়ে রইল। সে রাতে ভাত খেল না। তার নাকি
মাথা ধরেছে।

নীলুর মনে হলো বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোনা ঠিক না। কিন্তু ঘটনাগুলি
গাঢ়ে খুব দ্রুত। এক সময় আর ফেরা যাবে না। রাতের বেলা সে সফিককে বলল,
শাহানার এই বিয়েতে মত নেই। সফিক বিরক্ত হয়ে বলল ওর মতামতটা চাচ্ছে কে?

যে বিয়ে করবে তার কোনো মতামত থাকবে না?

শাহানার মতামত দেয়ার বয়স হয়নি।

ধরো যদি অন্য কোনো ছেলের প্রতি তার কোনো দুর্বলতা থাকে তখন?

কি যে বাজে কথা বলো।

ও যে রকম মেয়ে কোনো একটা কাণ্ডটাও করে বসতে পারে।

কিছুই করবে না। আমি কথা বলব ওর সাথে।

কখন?

এখনই ডাকো। কথা বলছি।

থাক, আজ না বললেও হবে।

আজ অসুবিধাটা কি?

মাথা ধরেছে শুয়ে আছে।

তুমি বলো, আমি ডাকছি।

প্রিজ, আজ না। যা বলার অন্য একদিন বলো।

বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যাবেলা ফর্সা মোটা মহিলাটি অনেককে নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে প্রচুর মিষ্টি।
তারা শাহানার হাতে হীরে বসানো একটি আংটি পরিয়ে দিলেন। মনোয়ারা বসন্তলেন, মা
ইনাকে সালাম করো। শাহানা বাধ্য মেয়ের মতো সালাম করল।

সেই রাতেই সফিক শাহানার সঙ্গে অনেক সময় ধরে কথা বলল, নীলু সেই
আলোচনায় থাকল না। কিন্তু লক্ষ্য করল শাহানার মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।
অস্বস্তির ভাবটা আর নেই।

সহজ ভাবে টিভির সামনে এসে বসল। গানের ভুবন অনুষ্ঠানটি খুব আশ্রয় নিয়ে
দেখল। সেখানে একজন শিল্পীকে একটি মাছি বিরক্ত করছে। বার বার মাছিটি গিয়ে
বসেছে তার নাকে। শিল্পী নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করছেন পারছেন না। দৃশ্যটি দেখে

শাহানা অন্য সবার মতোই হাসতে হাসতে ভেসে পড়ল। নীলুর মনে হলো, শাহানা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। এই বিয়েতে সে সুখীই হবে।

অনেক রাতে শাহানা নীলুকে বলল, ভাবী আংটিটা কি পরে থাকব না খুলে ঝাণ্ডে তুলে রাখব?

বাত্সে তুলে রাখার দরকার কি?

এত দামি আংটি হাত থেকে খুলে পড়ে যায় যদি।

না পড়বে না। আঙটিটা তোমার পছন্দ হয়েছে শাহানা?

শাহানা কিছু বলল না। নীলু নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক তোমার কল্যাণে হীরা দেখা হলো। আমি হীরা আগে দেখিনি।



সফিক অফিসে এসে শুনল, বড় সাহেব সকাল আটটায় এসেছেন, কয়েকবার সফিকের খোজ করেছেন। তাঁর মেজাজ অবিশ্যি ভালো। অন্যদিনের মতো টেচামেটি করছেন না। সফিক ঘড়ি দেখল, দশটা চল্লিশ। আজ তার অফিসে আসতে দেরি হল। এটা সে কখনো করে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে দিন সে দেরি করে আসে বেছে বেছে স্যারেনসেন ঠিক সেদিনগুলিতেই আসে।

স্যার, মে আই কাম ইন?

কাম ইন। কেমন আছ সফিক?

ভালো।

আজকের ওয়েদার কেমন চমৎকার লক্ষ্য করেছে? ব্রাইট সানসাইন। কুল ব্রিজ।

সফিক ব্যাপার কিছু বুঝতে পারল না। বাতাসে কোনো মিষ্টি গন্ধ নেই কাজেই বড় সাহেব প্রকৃত্তই আছেন। সকালবেলার চমৎকার ওয়েদার নিয়ে তাঁর কাব্যভাবের কোনো কারণ নেই। আজকের সকাল অন্যদিনের সকালের মতোই। আলাদা কিছু নয়।

সফিক।

বলুন স্যার।

তুমি কি আমার প্রসঙ্গে কোনো গুজব শুনেছ? আমাকে নিয়ে দুটি গুজব প্রচলিত। একটি হচ্ছে তোমাদের অফিসের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলছি। আমি এই গুজবটির কথা বলছি না। আমি বলছি অন্য গুজবটির কথা।

না স্যার, আমি কিছু শুনিনি।

ঠিকই শুনেছ। এখন প্রিটেভ করছ। তাতে অবশ্যি কিছুই যায়-আসে না। সফিক চুপ করে রইল। বড় সাহেবের কথাবার্তা হেঁয়ালির মতো লাগছে।

জাহাঙ্গীর হেড অফিস জানিয়েছে যে তারা মনে করছে আমি এখনকার কাজকর্ম চাপাতে পারছি না। কাজেই তারা আমার একজন রিপ্রেসেন্ট পাঠাচ্ছে।

কবে?

এই সপ্তাহেই। তো তোমার জন্যে 'যে সুপারিশ আমি করেছিলাম সেটিও বাতিল'। কাজেই তুমি ফিরে যাবে তোমার আগের জায়গায়।

নাহ-না সিগারেট ধরাল। স্যুরেনসেন শান্ত স্বরে বলল, আমার ব্যাপারে ওদের মতামত ঠিকই আছে। আমি মোটামুটি একটি অপদার্থ। কিন্তু তোমার ব্যাপারে ওরা ভুল। আমি খুবই দুঃখিত। ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমি চার্জ হ্যান্ডওভার করব। জেনো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে সাহায্য কর।

নাহক দীর্ঘ সময় তার ঘরে চুপচাপ বসে রইল। স্যুরেনসেনের বদলে অন্য কেউ এল। ভালো হবারই কথা। এখনকার এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অত্যন্ত দুর্বল। প্রায় এগারোটো বছর কাজে এখনো অফিসের সব কর্মচারী এসে উপস্থিত হয়নি। কর্মচারীদের আনা-সেবাও জেনো কোন গাড়ি নেই। অথচ গাড়ির স্যাংশন হয়ে আছে দু'বছর আগে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হ্রাস মারা ফাইলগুলিই সে ফেলে রাখবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তার মুড আসছে না। নংবা মাথা ধরেছে। কিংবা এই ব্যাপারটি নিয়ে সে আরো চিন্তাভাবনা করতে চায়।

কিন্তু তবুও স্যুরেনসেন একজন ভালো মানুষ। জগতের বেশিরভাগ অপটু মানুষরা লম্বাঘাট ভালো মানুষ হয়ে থাকে এর কারণ কি? নিজের ক্ষমতাকে ভালোমানুষী দিয়ে ছাড়া করে রাখার একটা চেষ্টা কি?

সিদ্দিক সাহেব এসে ঢুকলেন। হাসি হাসি মুখ। যেন এইমাত্র মজার কিছু ঘটে গেছে।

কি সিদ্দিক সাহেব সকালবেলাতেই মুখ এমন গম্বীর কেন? বড় সাহেবের খবরে আপসেট নাকি?

কিছুটা তো আপসেট বটেই।

যাকে নিয়ে আপসেট সে কিন্তু সুখেই আছে। সকালে এসে গুনগুন করে গান পাঠছে। আসলে বাংলাদেশ থেকে বেরুতে পেরে ব্যাটা খুশি।

তাই কি?

তাই। নয়তো এতটা ফুর্তি হবার কথা না। বেল টিপুন চা দিতে বলুন। আপনি কি খফিসিয়াল অর্ডার পড়ে দেখেছেন?

না।

আছে আমার সঙ্গে। চা খাবার পর পড়ে দেখবেন।

সিদ্দিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। অফিস অর্ডার সিদ্দিক সাহেবের কাছে যাবে কেন?

বুঝলেন সিদ্দিক সাহেব এবার আমরা অফিস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন টাইট করব। আপনার ফুল কো-অপারেশন দরকার। আমাদের নিজেদের সাবভাইভেলের জন্যেই এটা

দরকার। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে এতে কোম্পানি বিজনেস ওটিয়ে ফেলবে। কোম্পানিগুলি এদেশে আসে কাঁচা পয়সা নিতে। ভ্যাকেশন কাটাতে তো আসে। এদের পয়সা তৈরির সুযোগ করে দিতে না পারলে তো আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ কি বলেন?

সফিকের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। হেড অফিস সিদ্ধিক সাহেবকে প্রমোশন দিয়েছে। অফিস অর্ডার তাঁর কাছে যাবার রহস্য হচ্ছে এই।

সফিক সাহেব।

বলেন।

বড় সাহেবকে এটা জমকালো ফেয়ারওয়েল দেবার ব্যবস্থা করা যাক। এই দাঁড়ি আপনাকেই নিতে হবে। ছোটখাট একটা ফাংশান তারপর ডিনার। ফাংশান সফিক এ্যাটেন্ড করবে ডিনার শুধুমাত্র অফিসারদের জন্যে। এবং সবার তরফ থেকে তাঁর আমরা একটা গিফটও দিতে চাই। কি দিলে ভালো হয় সেটা নিয়েও একটু চিন্তা করবেন। বাংলাদেশের ল্যান্ডস্কেপের উপর একটা ওয়েল পেইন্টিং পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। আপনার চেনা জানা কেউ আছে আর্টিস্ট?

না।

আমি অবিশ্যি দু'একজনকে চিনি। দেখব কি করা যায়।

সিদ্ধিক সাহেব প্রায় এক ঘণ্টার মতো বসলেন। তিনি সম্ভবত এই হঠাৎ আগ্রহ প্রমোশনের খবরে সফিকের কাছে লজ্জিত বোধ করছিলেন। লজ্জা ঢাকার জন্যেই বস।

শাহানাদের কলেজ আজ দুপুরবেলা ছুটি হয়ে গেল। ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ে কুমিল্লা যাচ্ছিল বাবা মা'র সঙ্গে। এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মারা গেছে তিনদিন আগে। খবর পাওয়া গেছে আজ। সেজন্যেই ছুটি এবং শোক সভা।

শোক সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হলো। ডাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বক্তৃতা দিলেন। যার ভাবার্থ হচ্ছে সংসার অনিত্য, জন্মিলে মরিতে হবে। ডাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের লম্বা বক্তৃতা দেয়ার বদঅভ্যাস আছে। সুযোগ পেয়ে তিনি প্রায় পঞ্চাশ মিনিট কথা বললেন। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

শাহানার সবচে' প্রিয় বান্ধবী মিলি, ফিস ফিস করে বলল, আগে আগে ছুটি হয়ে লাভটা কি হলো? সেইতো সাড়ে বারোটা বাজিয়ে ফেলেছে। শাহানা বলল, এখন দেখবি লীনা আপা বক্তৃতা দিবে।

সর্বনাশ হবে তাহলে। লীনা আপা ঝাড়া দু'ঘণ্টা বলবে।

ওদের আজ নিউমার্কেটে যাবার কথা। লীনা আপা ডায়ালগ গেলে সেটা সম্ভব হবে না। শাহানা অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সম্ভবত আজ আপা কিছু বলবে না। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। তাঁর নিশ্চয়ই কোথাও যাবার কথা। হল ভর্তি ছাত্রী মুখ শুকনো করে বসে আছে। শোকসভা না হয়ে অন্য কিছু হলে এতক্ষণে স্যান্ডেল ঘসাঘসি শুরু হত। আজ তা করা যাচ্ছে না। দুঃখী দুঃখী মুখ করে সবাই বসে আছে।

কোনো মন খারাপ করিয়ে লীনা আপা বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কাঁপা কাঁপা গলায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থ একটি কবিতার নাম.....

লীনা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। সূচনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা লম্বা ব্যাপার

হবে। যে মেয়েটি মারা গেছে তাকে এই আপা হয়ত চেনেনও না। কিন্তু কত

জানো কথা বলা হবে। এমনভাবে সবাই বলবে যেন ঐ মেয়েটির মতো ভালো

কিছুতেই জন্মায়নি। এবং তার মৃত্যুতে সবার একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল।

মানুষ হয়? শাহানার ঐ মেয়েটির উপর রাগ লাগতে লাগল। কি দরকার ছিল তার

জানো?

লীনা সময় কাটানোর জন্য অন্যকিছু ভাবতে চেষ্টা করল। এই কাজটা সে খুব

পাঠে। কুলে কোনো লেকচার যখন তার পছন্দ হয় না তখন স্যারের দিকে

দেখে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে। বেশ লাগে তার।

কিন্তু এতে লাগল বাসায় ফিরে গিয়ে কি করবে। করার কিছুই নেই। এমন নিরানন্দ

দিন। কিছুক্ষণ পড়াশোনা, টিভি দেখা, রাতের পর ঘুমানো, ব্যাস। দিনের পর দিন

কটিন। এতটুকুও ভালো লাগে না প্রায়ই ইচ্ছা করে কোথাও পালিয়ে যেতে। ছেলে

কোনো সে নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত। মেয়ে হয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। পত্রিকা

মেয়েদের নিয়ে এমন সব আজেবাজে খবর ছাপা হয়। এসব খবর শাহানার

ভালো লাগে না। কিন্তু মা আবার বেছে বেছে সেই খবরগুলিই ভাবীকে পড়ে

দেখান।

লীনা, তুনে যাও। কি লিখেছে। মানুষ আর মানুষ নাই। জানোয়ার হয়ে গেছে।

লীনা পুনের নবগ্রামে তিনজন যুবক কর্তৃক এগারো বৎসর বয়েসি কুলসুমকে....

এমন খবর কি জোরে জোরে পড়ে শুনানোর জিনিস? কিন্তু মাকে বলবে কে? যতই

চেষ্টা করে, মা ততই অন্যরকম হয়ে থাকে। কি বাজে স্বভাব যে তাঁর হচ্ছে। অবশ্যি

তার সঙ্গে মা খুব ভালো ব্যবহার করছে, যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, তার

যত্নে যাওয়া খারাপ ব্যবহার করার নিয়ম নেই। আগে টুনীকে নিয়ে ছাদে গেলে

লীনাও জবাবদিহি করতে হতো।

ছাদে গিয়েছিল কেন?

দিনের মধ্যে দশবার ছাদে যাওয়া লাগে কেন?

লীনা বদার আর যেন না দেখি। এত বড় মেয়ে ছাদে ঘুর ঘুর করবে কেন? ছাদ কি

লীনা খাবার জায়গা?

যখন মা কিছুই বলে না। কয়েকদিন আগে কলেজ থেকে ফেরবার সময় গলির

কোণে আনিস ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। দু'জন কথা বলতে বলতে আসছে। মা ব্যাপারটা

লীনা খান্না দাঁড়িয়ে দেখল। এই নিয়ে কিছুই বলল না। অন্য সময় হলে এক লক্ষ প্রশ্ন

করে।

কি কথা হলো আনিসের সাথে? হাত নেড়ে নেড়ে, এমন কি কথা?

তোকে কতবার বলব আগ বাড়িয়ে আলাপ জমতে যাবি না।

এসতে হাসতে দেখি ভেসে পড়ে যাচ্ছিল। কান্টার মধ্যে কেন এমন হাসাহাসি?

লীনাকের মেয়ে না তুই?

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার কিছু ভালো দিকেও আছে। স্বাধীনতা আসে। কতদিন এই স্বাধীনতা কে জানে। বিয়ের পর কি হবে এসব নিয়ে শাহানা কখনো ভাবতে ভালো লাগে না। যা হবার হোক। তখন দেখা যাবে। তবে শাহানা শি লোকটির সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে ভালোই হবে। ছায়াবলা ধরনের হবে না। হলে শাহানার সঙ্গে বার বার দেখা করত। চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে চাইত। নিয়ে যেত। প্রেম প্রেম একটা খেলা চলত। সবকিছু ঠিক ঠাক করবার পর অভিনয়। এই ছেলে এসব কিছুই করেনি। এই একটি কারণে শাহানা তার উপর শাহানা ঠিক করে রেখেছে বিয়ের প্রথম রাতেই এজন্য সে তার স্বামীকে ধন্যবাদ ওদের বাড়ি থেকে একবার বিরাট এক গাড়ি এসে উপস্থিত। বাচ্চা চিড়িয়াখানায় যাবে। তাদের ইচ্ছা শাহানাকে নিয়ে যেতে। শাহানা কি পারবে তার যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না মা'র জন্যে যেতে হলো। সাজ সজ্জা করছে চুল বাঁধতে হল। শাহানা ধরেই নিয়েছিল চিড়িয়াখানাটা উপলক্ষ্য মাত্র আসলে সঙ্গে ঘুরতেটুঁরতে চায়। কিন্তু ও ছিল না। বাচ্চারাই গিয়েছে দল বেঁধে।

মাঝে মাঝে শাহানার মনে হয় ওর মধ্যে শাহানার প্রতি একটা অবহেলা আছে। নয়তো বিয়ে ছ'মাস পিছিয়ে দেবার প্রস্তাবে ছেলের আত্মীয়-স্বজনরা ঝগড়া হতো না। কিন্তু ছেলে রাজি হয়ে সবাইকে রাজি করাল। এসব স্ববর অবশিষ্ট মামার কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর সব স্ববর বিশ্বাসযোগ্য নয়; তিনি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেন।

লীনা আপার বক্তৃতা প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনি আধঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। চিবিয়ে কথা। দুই মিনিট পর পর রবীন্দ্রনাথ এই বলেছেন-মহামতী বালজ্ঞা বলেছেন। আগে জানলে সে আসত শোকসভায়?

শাহানার বাসায় ফিরতে ফিরতে তিনটা বেজে গেল। বাসায় কেউ নেই শুধু বসে আছে বসার ঘরে।

ওরা কোথায় ভাইয়া?

বিলগায়।

তুমি আজ এত সকাল সকাল যে?

এসে পড়লাম একটু আগে আগে।

শরীর খারাপ নাকি?

না শরীর ভালোই আছে।

আজ আমাদেরও সকাল সকাল ছুটি হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়ে গেছে-এজন্যে ছুটি।

কিভাবে মারা গেল?

জানি না। গ্যাকসিডেন্ট না কি যেন হয়েছিল।

শাহানা কাপড় বদলাতে গেল। বাড়িটা ফাঁকা বলেই কেমন অচেনা লাগছে হচ্ছে অন্য কোনো মানুষের বাড়ি। আর বিলগায় যখন গিয়েছে তখন রাত এগারোটার আগে ফিরবে না। শাহানার দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল।

শাহানা, শাহানা!

কি কাইয়া।

কি বানাতে পারিস?

কান্না না কেন, তুমি আমাকে কি ভাব?

কান্না এককাল চা।

শাহানা অত্যন্ত উৎসাহে চা বানাতে গেল। রান্নাঘরে যাবার সে কোনো সুযোগ পায়। রান্নাঘরের কঠিন নিষেধ আছে। বিয়ের আগে রান্নাঘরে যাওয়া যাবে না। আঙনের

পাখিও রঙ নষ্ট হয়। রান্নাবান্না যা শেখার বিয়ের পর শিখলেই হবে।

শাহানা চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শাহানা এলো তার পিছু পিছু।

শাহানা গোলাপ গাছে অনেক ফুল ফুটেছে। শাহানা হাসল। গাছের প্রসঙ্গে

কোনো কথা বললেই শাহানার বড় ভালো লাগে।

শাহানা গাছগুলি তুই স্বত্ববাড়ি নিয়ে যাবি না রেবে যাবি আমাদের জন্যে?

কি যে তুমি বলো ভাইয়া।

শাহানার লজ্জা করতে লাগল। ভাইয়া গম্ভীর ধরনের মানুষ ঠাট্টা-তামাশা কখনো

না। কিন্তু শাহানা লক্ষ করেছে বিয়ের প্রসঙ্গে সে মাঝে মাঝে হালকা কথাবার্তা

।

প্রত্যেকদিন আগে তারা খেতে বসেছে। খাবার তেমন কিছু নেই। ভাইয়া হঠাৎ

এক বড় লোকের স্ত্রী একজন খেতে বসেছে আর এই খাওয়া? শাহানার লজ্জায়

শাহানার মতো অবস্থা। সবাই খুব হাসাহাসি করল। বাবার হাসি তো আর খামেই

। শেষটায় বিষম ক্ষেয়ে ফেললেন।

মাস সফিকের মুখ অন্ধকার হয়ে আছে। একটু আগে সে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু তাকে

মনে হচ্ছে তার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। সফিক বলল, তোর ভাবী কখন

সে?

পাঁচটার মধ্যে এসে পড়ে। চারটা পর্যন্ত অফিস। ওদের গাড়ি এসে দিয়ে যায়।

গাড়ি এসে দিয়ে যায়? জানতাম না তো। আমাকে তো কিছু বলেনি।

এই মাস থেকেই নিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে।

শাহানার মনে হলো সফিক আরো গম্ভীর হয়ে গেছে। এতে তো খুশি হবার কথা,

কি হবে কেন? শাহানা বলল,

ভাইয়া আমি একটু ঘুরে আসি।

কোথায় যাবি?

হাদে।

হাদ ফাঁকা। শাহানার মনে হচ্ছিল আনিস ভাইকে তার ঘরে পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘর

জলাবদ্ধ। কাপড় শুকুবার দড়িতে ধবধবে সাদা রঙের কয়েকটা কবুতর। এদের শেষ

কোনো হচ্ছে। ম্যাজিকে লাগবে। শাহানা কবুতরের পাখি হাত রাখতেই একটি কবুতর

বাড় বাকিয়ে তার হাতে ঠোকর দিল। এই বুঝি শেষমানা কবুতরের নমুনা?

শাহানা একা একা হাদে হাঁটতে লাগল। শীত লাগছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। কেমন

খারাপ করিয়ে দেবার মতো একটা সম্মা নামছে। কোনো রকম কারণ ছাড়াই

শাহানার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। খাচার কবুতরগুলি আগ্রহ নিয়ে দেখছে।

ছাদ থেকেই দেখা গেল রফিক আসছে। সে চারদিনের জন্যে যশোর গিয়ে কেন গিয়েছিল কাউকে বলে যায়নি। চাকরির কোনো ব্যাপার হবে বোধ হয়। আ- চাকরির ব্যাপারে সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। শাহানা নিচে নেমে এলো। রফিক- নিকে ডাকিয়ে হাসল। কেমন রোগা লাগছে রফিককে।

কেমন আছেন শাহানা বেগম?

ভালো আছি। তুমি কেমন?

ভালোই।

কেমন খুশি খুশি লাগছে তোমাকে। চাকরিটাকরি কিছু হয়েছে?

না। আমার এসব হবে না। বিজনেস করব ঠিক করেছি। বাসায় কেউ নাই।

না। স্বিলগায়ে গিয়েছে। ভাবী এখনো ফেরেনি।

চট করে চা বানা। খুব কড়া করে। হাই পাওয়ারড টি দরকার। কেউ কি ষ-
খোজ করেছিল?

না। কারোর খোজ করার কথা?

উহু।

নীলু আজও ফিরতে দেরি করছে সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সাড়ে ছটা বাজে।
দেরি করার কথা না। সফিক, শাহানাকে বলল, তোর ভাবী কি দেরি হবার কথা
বলে গেছে?

না।

প্রায়ই কি সন্ধ্যা পার করিয়ে আসে?

না। বীণাদের বাসা থেকে অফিসে টেলিফোন করে দেখব?

দরকার নেই।

শাহানা বলল, আরেক কাপ চা বানিয়ে দেব ভাইয়া?

না।

সফিকের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনো কাজের মানুষ নেই বাড়ি
রফিককে বললে সে এনে দেবে। বলতে ইচ্ছা করল না। সফিক নিজেই চাদর
দিয়ে বেকুল। শাহানা বলল, যাচ্ছ কোথায় ভাইয়া?

সিগারেট কিনব।

আমিও আসি তোমার সাথে?

আয়।

সারাটা পথ শাহানা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, সফিক হঠাৎ অন্যমনস্ক ভা-
শাহানা কি বলছে তার কানে যাচ্ছে কিনা সন্দেহ। সে অসুবিধা হ্যাঁ হুঁ দিয়ে যাচ্ছে।

ভাবীর সঙ্গে তুমিও চলে যাও না কেন সুইডেন? সে যা এ্যালাউন্স পাবে
তোমরা দু'জন দিব্যি থাকতে পারবে। আমরা ঠিকই টুনীকে। কোনোই অসুবিধা
না। তাহাড়া টুনী তো রাতে থাকে বাবার সাথে। তোমাদের জন্যে সে খুব কান্দবে ট-
বলে মনে হয় না। আসবার সময় তার জন্যে একগাদা খেলনা নিয়ে আসবে। ৫

। বিশেষে ডল হাউস বলে একটা খেলনা পাওয়া যায়। যা সুন্দর! চমৎকার একটা
 লব্ধ বস্তু আসবাবপত্র আছে। এমনকি বাথরুমে বেসিন, কমোড সব আছে। ঐ
 নিজে আসবে।

। কখনো মনে হলো শাহানা মানসিক দিক দিয়ে এখনো বড় হয়নি। ছোটই রয়ে
 । ঠাট্টা করে তার বিয়ে ঠিক করাটা বোধহয় ভালো হয়নি। মানসিক প্রকৃতির জন্যে
 , লগা দরকার ছিল।

। সিগারেট কিনেই কি তুমি বাসায় চলে আসবে?

। হ্যাঁ, কেন?

। তোলা না ঐ বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যাই।

। সেখানে কি?

। জাগো মাইক্রোবাস সেখানে থাকে। ভাবী বাস থেকে নেমেই আমাদের দেখবে।

। থাকতে হবে। যাবে ভাইয়া?

। চপ যাই।

। ঠিকনে হাঁটতে শুরু করল। শাহানা মুদ্রবরে বলল, তোমাকে একটা গোপন খবর
) পারি ভাইয়া।

। কি খবর?

। খুবই গোপন। কাউকে কিছু বলতে পারবে না। গোপন খবর হলে না বলাই তো
) না। গোপন খবর তো বলে দেয়ার জন্যে না।

। শাহানা চুপ করে গেল। ভাইয়ার সঙ্গে অন্য কোনো মানুষের কোনো মিল নেই।

। কেউ হলে বলত, কাউকে বলব না খবরটা কি বল? ভাইয়া সেটা বলবে না।

। মার খুব ইচ্ছা করছে খবরটা বলে। ভাবী সতেরশ টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি কিনেছে
) কেনো জন্যে। ম্যারেজ এ্যানিভারসারি উপলক্ষে সেটা সফিককে দেয়া হবে। এই হচ্ছে

। ঘড়ি কেনার সময় নীলু শাহানাকে নিয়ে গিয়েছিল। শাহানা অবাক হয়ে বলেছিল,
) নাম দিয়ে ঘড়ি কিনবে? নীলু লাজুক হেসে বলেছে, ওকে ভালো কিছু দিতে চাই।
 কিন্তু ভাইয়া তো তোমাকে কখনো কিছু দেয়নি।

। কোথেকে দেবে। ওর কি টাকা আছে?

। টাকা থাকলে দিত না। এসব দিকে তার কোনো নজরই নেই।

। কথাটা খুবই সত্য। গত ম্যারেজ এ্যানিভারসারিতে নীলু দুপুরবেলা সফিকের
) কিনে উপস্থিত হলো। সফিক অবাক হয়ে বলল-কি ব্যাপার কি? নীলু হেসে বলেছে,
) দেখতে এলাম কি করছ।

। ওধু ওধু আসবে কেন? নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে। টুকুকে কার কাছে রেখে
) গেছে?

। কার কাছে আর রাখব, মার কাছে। তুমি কি আত্ম হুটি নিতে পারো?

। কেন?

। বিদে লেগেছে খুব। কোনো একটি রেইরেটে বসে লাঞ্চ খাওয়া যেত। আজকের
) গাখটা তোমার মনে নেই তাই না?

তারা প্রায় আধঘণ্টার মতো দাঁড়িয়ে রইল। নীলুর বাস এলো না। সফিক বলল
যাই ঠাণ্ডা লাগছে।

একটু দাঁড়াও ভাইয়া, এসে পড়বে।

সফিক কোনো জবাব না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। শাহানা বলল, আর একটা
থাকি না ভাইয়া। আমার মনে হচ্ছে পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।

আসুক। দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।

নীলু এলো নটার একটু আগে। তাদের এক কলিগ অফিস ছুটির আগে আগে
অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অফিসের মিনিবাসে করে তাকে শেরেবাংলা হাসপাতালে
হয়েছে। অন্য সবাইও গিয়েছে সেখানে। ডাক্তার বললেন হার্ট এ্যাটাক। ভদ্রলো
এখনো জ্ঞান ফেরেনি। তার স্ত্রী এবং দুটি ছেলে হাসপাতালে এসে খুব কান্না
করছে।

সফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখাল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, খবর তো দেবে।

কিভাবে দেব খবরটা? সারাক্ষণ তো হাসপাতালে ছিলাম।

তুমি তো হাসপাতালে থেকে কিছু করতে পারছিলে না। শুধু আমাদেরকে দুশ্চিন্তা
ফেললে।

একজন কলিগের এত বড় দুঃসময়ে আমি যাব না?

সফিক গম্ভীর গলায় বলল, তর্ক পরে করবে এখন দেখো খাওয়া-দাওয়ার ব্যা-
করা যায় কিনা। রান্নাবান্না কিছুই তো হয়নি।

নীলুর প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। সে মাথা ধরা নিয়েই রান্না ঘরে ঢুকল। স্বাভাবিক
দাওয়া শেষ করে ফিরবেন কিনা কে জানে।

দুপুরের তরকারি কিছুই নেই। রাতের বেলার জন্যে কি রাখবে নীলু ভেবে পেল
রফিককে ডিম কিনে আনার জন্যে পাঠাতে হবে।

রফিক ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। নীলু ডাকতেই সে ক্লান্ত স্বরে বলল-ও
আমার জ্বর। হঠাৎ করে জ্বর এসে গেছে। বিশ্বাস না হলে কপালে হাত দিয়ে দেখ

নীলু, আনিসের বোম্বে ছাদে গেল। আনিস ছিল না। নীলু ফিরে এলো মন খ-
করে। ডাল ভাতই খেতে হবে। রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না খুব ক্লান্তি লাগছে।
শাহানাকে ডেকে বলল, তুমি রফিকের পাশে বসো, মাথায় হাতটাত বুলিয়ে দাও
জ্বর।

শাহানার ইচ্ছা করছিল নীলুর সঙ্গে গল্প টল্ল করে। কিন্তু সে গেল রফিকের
জ্বরে সতি সতি রফিকের গা পুড়ে যাচ্ছে। শাহানা বলল, চুল টেনে নিশু, রফিক ব
চুল ধরে টানাটানি করার কোনো দরকার নাই। তুই নিজের কাছে যা।

জ্বরের সময় কোনো একটা কথা কানে গেলে সেটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক
থাকে। চুল টানার ব্যাপারটা রফিকের মাথায় ঘুরতে লাগল। তার মনে হতে লাগল
চারজন অল্পবয়সী মেয়ে একঘেঁয়ে গলায় তার কানের কাছে চেঁচাচ্ছে...

চুল টানা, রফিকনা

সাহেব বাবুর ষেঠকখানা।

সাহেব বলেছে যেতে

পান সুপারি খেতে
পানের ভেতর মৌরি বাটা।
ইসকুপের চাবি আটা।।
চুল টানা বিবিয়ানা
চুল টানা বিবিয়ানা।

সাহেবরা এলেন রাত এগারোটায়। সে সময় রফিকের মাথায় পানি ঢালা
করেন। ফার্মেসীর ডাক্তার অজয় বাবু চিন্তিত মুখে বসার ঘরে বসে আছেন। আনিস
সাহেব আছেন। জ্বর উঠেছে একশ পাঁচ পর্যন্ত। রফিক বিড় বিড় করে ছড়া
গান বলছে। শাহানার বুক ধড়ফড় করছে। একি কাণ্ড! সুস্থ মানুষ। এসে চা
পান করল আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আকাশ-পাতাল জ্বর। মনোয়ারা কান্ডতে
হোসেন সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অজয় বাবু বললেন,
জ্বর নাই জ্বর রেমিশন হবে। অস্থির হবার কিছু নাই।

তিনটার দিকে রফিকের জ্বর অনেকখানি কমল। সে উঠে বসে সহজ স্বরে
বলল, খেতে টেতে দাও ভাবী। দুড়ি ভেজে আনো খাল দিয়ে।

ঘুমুতে গেল রাত চারটার দিকে। সফিক তখনো জেগে আছে। নীলু কান্ড স্বরে
বলল, ঘুমুবে না।

তো বেশি বাকি নেই ঘুমিয়ে কি হবে?
খাম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।
পড়ে পড়।

নীলু শুয়ে পড়ল। টুনী আজ তাদের সঙ্গে ঘুমিয়েছে। অনেক বড় হয়ে গেছে
টুনী। দেখতে দেখতে কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে। নীলু, টুনীকে বুকের কাছে টেনে
লইল। টুনী ঘুমের মধ্যেই মাকে জড়িয়ে ধরল। আহা সারাদিন দেখা হয়নি মেয়েটিকে।
খাওয়া-দাওয়া করেছে কিনা কে জানে। কেমন রোগা রোগা লাগছে হাত-পা।
শাওরের কাছে লাল একটা দাগ, ফুলে উঠেছে। পড়ে গিয়ে ব্যথা টেথা পেয়েছে
টুনী। নীলু চুমু খেল কপালের কাটা দাগে।

সফিক বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে এলো। নীলু বলল, টুনী কেমন ব্যথা পেয়েছে দেখেছ?
শাওর ফুলে উঠেছে।

সফিক কিছু বলল না। নীলু বলল, আরেকটু হলে চোখে লাগত।

তাদের বাবা-মা দু'জনেই ব্যস্ত তাদের ছেলেমেয়েরা অবহেলার মধ্যেই বড় হবে।
এটা নিয়ে দুঃখ করা ঠিক না তুমি ঘুমাও।

নীলু মৃদুস্বরে বলল-আমার চাকরিটা তোমার পছন্দ না, তাই না? সফিক চুপ করে
বসল।

বলো তোমার কি ইচ্ছা না আমি চাকরি করি?

সফিক শান্ত স্বরে বলল, আমার কাছে মনে হয় পরিবারের প্রতি মেয়েদের দায়িত্ব
আমি বোধি।

সেই দায়িত্ব আমি পালন করছি না?

রাত দুপুরে এ নিয়ে তর্ক করতে ভালো লাগছে না।

তর্ক না। তোমার মতামতটা শুনি।

মতামত তো দিলাম। টুনী বড় হচ্ছে অবতু-অবহেলায়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে মানসিক বিকাশ অন্য সব শিশুদের মতো হবে না।

টুনীর মানসিক বিকাশ হচ্ছে না?

আমি ইন জেনারেল বলছি। চাকরীজীবী মহিলার কাছে ঘর-সংসারের চেয়ে ক্যারিয়ারই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। অফিসের একজন কনিগের অসুস্থতা তার কাছে ব্যাপার মনে হয়। যেমন তোমার উদাহরণটাই ধরা যাক।

আমার কি উদাহরণ?

সুইডেনের ব্যাপারটার তুমি কি রকম উল্লসিত হয়ে উঠলে। একবারও ভাবলে এই ছয় মাস টুনী কিভাবে থাকবে?

ভাবিনি তোমাকে কে বলল?

ভাবলেও সেটাকে তেমন গুরুত্ব দাওনি। পাসপোর্ট করা এই করা সেই করাতেই

তুমি চাও না আমি যাই?

সফিক জবাব দিল না।

বল তুমি চাও না?

না।

চাকরি করি তাও চাও না?

আমি না চাইলেই তুমি ছেড়ে দেবে? তা পারবে না একবার যখন চুকেছে সে থেকে কিছুতেই বেরুতে পারবে না। সংসার যদি ভেসেও যায় তাতেও না।

এতটা নিশ্চিত হয়ে কথা বলছ কি ভাবে?

নিশ্চিত হয়ে বলছি কারণ আমি জানি। যে মেয়ে চাকরি করে সে কিছু পণ্ডিত স্বাধীন। সেই স্বাধীনতা কোনো মেয়েই হারাবে না। সে সংসার ছেড়ে দেবে। স্বাধীনতা হারাবে না।

মেয়েরা স্বাধীন হোক সেটা তুমি চাও না?

সফিক বলল, যথেষ্ট তর্ক হয়েছে এখন ঘুমতে যাও। নীলু ঘুমতে পারল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান শুনা গেল। ভোর হচ্ছে। শুরু হচ্ছে আরেকটি দিন। এই দিন অন্যসব দিনের মতো নয়। এটি একটি বিশেষ দিন। এই দিনে সাত বছর তাদের বিয়ে হয়েছিল।



বৈশাখ মাস।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। ধরন দেখে মনে হয় কালবৈশাখী হবে। পানিরা অস্থির হয়ে গুড়াউড়ি করছে। ওরা টের পায়। কবির মাটির দ্রুত পা চালাচ্ছেন।

তার মাথা আছে শওকত। শওকতের মাথায় বিছানার চাদর দিয়ে বাঁধা গাদাখানিক বই।
 ৭৭৭৭ যোগাড় হয়েছে নীলগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির জন্যে। পাবলিক লাইব্রেরি
 খানা ৭৭ তাঁর শোবার ঘরে। খুব শিগগিরই ঘর তোলা হবে। জমি ঝানিকটা পেলেই
 ৭৭৭৭ গার্ম পাওয়া যাচ্ছে না।

৭৭৭৭ মাস্টার আকাশের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হবে বললেন, তাড়াতাড়ি পা চালা
 ৭৭৭৭৭। তুই দেখি বইগুলি ভিজানোর মতলব করছিস।

৭৭৭৭ কত তাড়াতাড়ি যাইতাম কেন? আমি তো আর ঘোড়া না? মাথার উপরে আছে
 ৭৭৭৭ নুনি বোঝা।

৭৭৭৭ লম্বা পা ফেলরে বাবা। বই ভিজলে সর্বনাশ।

৭৭৭৭ লম্বা পা ফেলেও রক্ষা হলো না। কালি মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই চেপে বৃষ্টি
 ৭৭৭৭৭। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। তারা ছুটে ছুটে কালি মন্দিরে উঠল। মন্দিরটি
 ৭৭৭৭৭৭। পূজা টুজা হয় না দীর্ঘদিন। কালি মূর্তির মাথা নেই। মন্দিরের চাতাল গোবরে
 ৭৭৭৭৭৭। কবির মাস্টারের এক পা গোবরে ডুবে গেল।

এহ কি কাণ্ডের শওকত।

৭৭৭৭ পাকা দালানের বাড়ি। ছাদ ফেটে গেছে। পানি আসছে ভাঙা ছাদ থেকে। শওকত
 ৭৭৭৭৭, হাত তালি দেন স্যার।

কেন?

জায়াগাটা সাপে ভর্তি।

বলিস কি?

দুইটা ছাগল মরল সাপের কামড়ে।

আরে ব্যাটা আগে বলবি তো।

৭৭৭৭ কবির মাস্টার এই একটি প্রাণীকে ভয় করেন। এই প্রাণীটির সঙ্গে কেন যেন তাঁর
 ৭৭৭৭ বার দেখা হয়।

শওকত।

জি স্যার।

চলো রওনা দেই।

এই তুফানের মইধো কই যাইবেন? জবর তুফান হইতেছে।

৭৭৭৭ বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের দরজা-জানালা কিছু নেই। বৃষ্টির ঝাপটায়
 ৭৭৭৭৭ কাক ভেজা হয়ে গেল। কবির মাস্টার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। এককালে
 ৭৭৭৭৭৭ জাঁকজমক ছিল মন্দিরের। প্রতি অমাবস্যায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে পূজা হতো। এখন
 ৭৭৭৭৭৭ হয় না। গরু ছাগল চড়ে বেড়াতে। বিত্তশালী হিন্দুদের কেউই নেই। সবার ধারণা
 ৭৭৭৭৭৭ হয়েছে সীমান্ত পার হতে পারলেই মহা সুখ।

৭৭৭৭ পালবাবুরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর একটি ছেলে মারা গেল। পালিয়ে
 ৭৭৭৭৭ যাবার সময় তাঁর বড় ছেলের বউ বরুণা বহস্যময় ভাবে গুলিটারিদের হাতে পড়ল। তার
 ৭৭৭৭৭ আর কোনো খোজ পাওয়া গেল না। মেয়েটি মেনে ক্ষুণ্ণ হয়ে মিলিয়ে গেছে।

৭৭৭৭ পালবাবু প্রায় জলের দরে বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করলেন। সবাই বলল, এখন আর
 ৭৭৭৭৭ কি? এখন কেন যাবেন? পালবাবু থাকলেন না। দেশ ছাড়ার আগে কবির মাস্টারকে

বলে গেলেন, মাষ্টার, বসতবাড়ি আর দশ বিঘা ধানী জমি বিক্রি করি নাই। এইটাগি আমি তোমারে দিয়া যাইতাছি।

কবির মাষ্টার অবাক হয়ে বললেন, কেন?

আমার বৌমা যদি কোনো দিন আসে এগুলি ভূমি তারে দিবা। আমার কেন জ্ঞানি মনে হয় বৌমা বাঁইচা আছে। সে একদিন না একদিন আসব নীলগঞ্জে।

সে বেঁচে আছে এটা মনে করার কারণ কি?

আমি স্বপ্নে দেখছি মাষ্টার।

সে যদি আসে আমি নিজে পৌছে দেব আপনার কাছে।

না মাষ্টার। তার দরকার নাই।

কেন? দরকার নেই কেন?

পালবাবু জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্দতে লাগলেন।

বরুণা ফিরে আসেনি। দশ বিঘা জমি এবং বসতবাড়ি আছে আগের মতোই। একবার ফজল মিয়া দলিল বের করল একটা-বসতবাড়ি এবং জমি তাকে দলিল করে দিয়ে গেছে পালরা। সেই দলিল আদালতে টিকল না। কিছুদিন হলো ফজল আলির ভাগ্নে মিশর মিয়া একটি হ্যাভ নোট বের করেছে যার মর্মার্থ হচ্ছে উনিশশো সত্তর সনে পালবাবু তার কাছে এগারো হাজার বত্রিশ টাকা কর্ত্ত নিয়েছে। সে টাকা শোধ হয়নি। টাকা শোধ কিংবা অনাদায়ে বাড়িঘর নিলামে তোলার জন্যে সে চেষ্টা তদবির করছে।

কবির মাষ্টার মিশর মিশর সঙ্গে দেখা করে ঠাণ্ডা গলায় বলে এসেছেন, দেখ মিশর উনিশশো সত্তর সনে তুমি হাফ প্যান্ট পরতে। দাড়িগোফও জ্বালায়নি। তোমার কাছ থেকে এগারো হাজার টাকা কর্ত্ত নিল পালরা। জালিয়াতি করতে হলে বুদ্ধি লাগে, তোমার মতো বেকুবের কাজ না।

মিশর মিয়া কোনো উত্তর দেয়নি কিন্তু এমনভাবে তাকিয়েছে যার মানে সে সহজে ছাড়বে না।

কিছুদিন হলো কবির মাষ্টার ডাবছেন গার্লস স্কুলটা পালদের বসত বাড়িতে শুরু করলে কেমন হয়? নাম দেবেন-বরুণা বালিকা বিদ্যালয়। বরুণা যদি সত্যি সত্যি ফিরে আসে সে খুশিই হবে। আর একবার স্কুল চালু হয়ে গেলে সহজে কেউ হাত বাড়াবে না।

কড় ভালোই হয়েছে। গাছপালা পড়ে চারদিক লণ্ডণ্ড হয়ে গেছে। অধিকাংশ কাঁচা বাড়ি কড়ে উড়ে গেছে। মানুষজন মারা যায়নি। তবে বদিউজ্জামানের মা'র পা ভেঙেছে দু'জায়গায়। সে চিৎকার করছে গরুর মতো। বদিউজ্জামানের সেনিকে লক্ষ্য নেই। সে তার ঝড়ে উড়িয়ে নেয়া ঘরের শোকে কাতর। সে উঠানে বসে আছে হাঙ্গামা নিচু করে। মায়ের চিৎকাবে বিরক্ত হয়ে একবার ধমকে উঠছে-আর বালি চিল্লায়।

চুপ করেন।

ডাক্তারের কাছে আমারে লইয়া যারে বদিউজ্জামান।

সকাল হউক।

সকালতক বাঁচতাম না।

না বাঁচলে নাই।

বদিউজ্জামানের স্ত্রী হাঁস-মুরগির খবর নিতে ছুটাছুটি করছে।

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। সাধারণত কালবৈশাখির পরে পরেই আকাশ পরিষ্কার
হয়। এবার সে রকম হচ্ছে না। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়িঘর ভাঙা
কিন্তু জনো রাতের একটা আশ্রয় দরকার। এতগুলি মানুষকে আশ্রয় দেবার মতো
সেখানে করা মুশকিল।

কবি মাটার ছাতা মাথায় দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। এত বড় একটা
হাট গেল কিন্তু একজন মানুষও মারা গেল না এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করল।
মধ্যে বেঁচে এদের অভ্যাস আছে।

বদিউজ্জামানের মাকে সদরে পাঠানো দরকার। বদিউজ্জামানের সেদিকে বিন্দুমাত্র
দৃষ্টি নেই। ঘরের শোকেই সে কাঁদে।

কবির মাটার বিরক্ত হয়ে বললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে আছিস কেন? মাকে
পাশে নিয়ে যায়।

সকাল হটক সকালে নিম্ন।

সকালে নিবি কিরে ব্যাটা? অবস্থা তো খুবই খারাপ।

এখন রওনা দিলে শেষ রাইতে পৌঁছবু সদরে। কেউ পুঁছত না আমারে।

এয়াইল বাজারে নিয়ে যা। ডাক্তার দেখা।

পয়সা নাই মাটার সাব। হাঁস মারা গেছে দুইটা। তুফানে ফতুর হইছি।

বদিউজ্জামান খুক করে একদনা খুঁপু ফেলল। তার মা প্রাণপণে চিৎকার শুরু করল।

কবি সাহেব বললেন, ডাক্তারের খরচ আমার কাছ থেকে নে।

তিনি তাঁকে পঞ্চাশটা টাকা দিলেন। এদের এত খারাপ অবস্থা। দুঃসময়ের জন্যে
কোনো সমস্যা নেই। একটা নীলগঞ্জ তহবিল করা দরকার। যেখান থেকে দুঃসময়ে টাকা
পয়সা নেয়া যাবে। তবে যথাসময়ে সে টাকা ফেরত দিতে হবে। তাতে সবার মনে
একটা সাহস হবে।

বদিউজ্জামান।

জি।

টাকাটা ফেরত দিবি মনে করে। আমার নিজের টাকা না। সুখী নীলগঞ্জের টাকা।

জি আইজা।

কবির সাহেব রাতে আর ঘুমুতে গেলেন না। সমস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকটা
দেখা হয়ে গেছে। অল্প কিছু সময়ের জন্যে ঘুমুতে যাবার মানে হয় না। তিনি তাঁর
চিঠিপত্র নিয়ে বসলেন। চিঠিপত্র আসতে শুরু করেছে। ছাত্রদের কাছ থেকে যে রকম
সাদা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়েছিল সে রকম সাদা পাওয়া যায়নি। চিঠি উত্তর
সবাই দিচ্ছে, কিন্তু আসল জায়গায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। যে সব চিঠি পানেন তার
একটির নমুনা এরকম—

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও যে আপনি একটা কিছু
করতে যাচ্ছেন তা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আশা করি আপনার
বন্দু সফল হবে। সুখী নীলগঞ্জ প্রকল্প ব্যয়বস্তিত্ব হবে। আমি কতটুকু

সাহায্য করতে পারব তা জানি না। কারণ বর্তমানে কিছু আর্থিক সমস্যা
যাচ্ছে। সমস্যাটা মিটলেই আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ইতি

আপনার স্নেহধনা

আমীরুল ইসলাম।

এই জাতীয় চিঠিগুলির উপর তিনি লাল কালি দিয়ে লেখেন-সাক্ষাত। যার মাঝে
হচ্ছে চিঠিতে এর কাছে কোনো কাজ হবে না। দেখা করতে হবে। অবশ্যি মাঝে মাঝে
দু'একটা এমন চিঠি পান যে আনন্দে চোখ ভিজে উঠে। রংপুর থেকে ওহীদুল আলম
বলে একটি ছেলে লিখল-“স্যার, আমি ভাবতেও পারিনি আমার কথা আপনার মনে
আছে। কি যে খুশি হয়েছি চিঠি পড়ে। অতি নিকৃষ্ট ছাত্র হয়েও আপনার স্নেহ থেকে
বঞ্চিত হইনি এই আনন্দ আমার রাখার জায়গা নেই। স্যার আমি জীবনে তেমন কোনো
সাফল্য লাভ করতে পারিনি। মোটামুটি একটি টানাটানির সংসার বলতে পারেন। কিন্তু
তাতে কিছু যায়-আসে না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। পাঁচশ'
টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠালাম। আমি আমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের কাছ
থেকে টাকা সংগ্রহ করে আপনাকে পাঠাব। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।
আমার মহা সৌভাগ্য যে আপনার জন্য কিছু করতে পারছি। স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন
সময়ে একদিন একটা বড় অপরাধ করেছিলাম। আপনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে
এক লাইনের যে উপদেশ দিয়েছিলেন আমার তা এখনো মনে আছে। যতদিন বেঁচে
থাকব ততদিন তা মনে থাকবে।....”

এই জাতীয় চিঠিগুলি তিনি আলাদা করে রাখেন। কোনো কারণে মন খারাপ হলে
পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই মন ভালো হয়ে যায়। মনে হয় সুখী নীলগঞ্জ প্রকল্প নিশ্চয়ই
একদিন শুরু হবে।

তিনি ফজরের আজান পড়ার আগে পর্যন্ত চিঠিপত্র নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। তারপর
কুটিন মতো বেড়াতে বেরুলেন। দক্ষিণপাড়া থেকে কান্নার শব্দ আসছে। ব্যাপার কি?
তিনি দ্রুত দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

কান্দছে বদিউজ্জামান এবং তার স্ত্রী। বদিউজ্জামান তার মাকে হাসপাতালে নিয়ে
যায়নি। তার মা কিছুকণ আগেই মারা গেছে।



তিনি অবাধ হয়ে নীলুর দিকে তাকালেন।

যেন নীলুর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। নীলু বলল, স্যার আমি খুব লজ্জিত।
শেষ মুহূর্তে জানালাম।

৭২ সাহেব বললেন, লজ্জিত হওয়াই উচিত। অন্তত একমাস আগে জ্ঞানালেও মাথা অন্য কাউকে পাঠাতে পারতাম।

৭৩ মাথা নীচু করে বসে রইল। বড় সাহেব বললেন, আপনার সুইডেনে যেতে না পারার পেছনে কারণগুলি কি?

আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

৭৪ ছোট?

সাড়ে তিন বছর বয়স।

৭৫ এই প্রবলেমটা আগে লক্ষ্য করলেন না কেন?

আগে ভেবেছিলাম সম্ভব হবে। দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে যাবে।

৭৬ সাহেব যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন। নীলু তার মুখ দেখেই সেটা বুঝতে পারছে।

৭৭ তার করার কিছুই নেই।

ট্রেনিং হবে দুই পর্যায়ে। তিন মাস অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং পরের তিন মাস পেনস এন্ড প্রমোশন। আপনি না হয় প্রথম তিন মাসের ট্রেনিংটা শেষ করে চলে আসুন।

৭৮ সেখানেও অসুবিধা।

মেয়েদের স্যার অনেক অসুবিধা।

তিন মাস আপনার বাচ্চাকে দেখবার কেউ নেই? তার দাদি কিংবা খালা, ফুপু?

নীলু মৃদুস্বরে বলল, আমি একা একা এতদূর যাই এটা আমার স্বামীর পছন্দ নয়।

৭৯ সি।

আপনি যদি মনে করেন আমি কথা বললে তিনি কনডিসন্ড হবেন তাহলে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি।

দরকার নেই স্যার।

নীলু উঠে দাঁড়াল। এখন সাড়ে বারোটা বাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাক্স ব্রেক হবে।

৮০ আজ আর কাজ করতে ইচ্ছা করছে না। সে ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

কেন জানি বাসায় যেতেও ইচ্ছা করছে না। আবার একা একা ঘুরে বেড়াতেও ইচ্ছা করছে না। বন্যা, তার অফিসে নয়ত তার বাসায় গিয়ে আড্ডা দেয়া যেত। অনেকদিন এন্টার সঙ্গে দেখা হয় না। তার অফিসে চলে গেলে কেমন হয়? আগে কোনোদিন যায়নি। ঠিকানা আছে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে কেন?

বন্যা, খুবই অবাক হলো। দু'বার বলল, একা একা খুঁজে বের করলি? তুই তো দারুণ শার্ট হয়ে গেছিস? অল্প কিছুদিন চাকরি করেই তোরতো ভালো উন্নতি হয়েছে। তবে ভালোমত বুদ্ধি খেলাতে পারিসনি। তোর প্রথমে উচিত ছিল টেলিফোন করে দেখা আমি আছি কিনা।

তোর এখানে আসব এমন কোনো প্ল্যান ছিল না। হঠাৎ ষ্টিক করা।

আর মিনিট দশেক দেবি হলেই আমার সঙ্গে দেখা হতো না।

এই সময় ছুটি হয়ে যায় নাকি ভোদের?

না, ছুটি হয় চারটায়। আজ একটু সকাল সকাল ফিরছি, বাড়ি দেখতে যাব।

বাড়ি বদলাচ্ছিস?

না। বরের সঙ্গে বনিবনা একেবারেই হচ্ছে না। আমি আলাদা বাসা নিচ্ছি।
সব বলব, দাঁড়া একটু বসকে বলে আসি। তুই কিছু খাবি?

না।

নীলু অবাক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিসের পাগলামি যে করছে বন্যা। বঁা
না হলেই আলাদা বাসা ভাড়া নিতে হবে? তাছাড়া এই শহরে একটি মেয়েকে কেউ
ভাড়া দেবে না। এই শহরে কেন কোনো শহরেই দেবে না।

বন্যা নীলুকে নিয়ে রিকশায় উঠল। হালকা গলায় বলল, তোর হাতে সময় ও
তো?

আছে।

তাহলে চল আমার সঙ্গে। একজন কেউ সঙ্গে থাকলে সাহস হয়। নিউ গ্র্যান্ড
রোডে একটা মহিলা হোটেলের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম কম্পাউন্ডের ভেতর ঢুকে
কেমন গা ছম ছম করতে লাগল। সুন্দর সুন্দর সব মেয়েরা ঘুরঘুর করছে। ববকাট
ঠোটে লিপস্টিক। বেশ ভদ্র ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়, কিন্তু কেমন একটু বটকা লাগা
হোটেলের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বললাম। বিশাল মৈনাক পর্বতের মতো এ
মহিলা। প্রথমে বলল সিট আছে। তারপর যখন শুনল আমি একটা এ্যাসেসিতে চাক
করি তখন বলল সিট নেই।

তুই কি বললি?

কিছু বলিনি চলে এসেছি। জায়গাটা ভালো না।

নীলু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, এখন কি আবার ঐখানেই যাচ্ছিস নাকি?

না আরেকটা মহিলা হোটেল আছে। ওনেছি সেটা ভালো। অনেক চাকরিজী
মহিলা থাকে। তবে সিট পাওয়া মুশকিল।

হাসবেন্ডের সঙ্গে কি হয়েছে সেটা শুনি।

রিকশায় বসে বলার মতো কোনো স্টোরি না। নিরিবিলিতে বলব। আর ঐ সব শুনে
কি করবি?

হোটেল-টোটেল খোঁজার চেয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলা ভালো না?

আমি কিছু মেটাব না। ও যদি মেটাতে চায় মেটাবে। দোষটা ওর আমার না।

রিকশাতেই বন্যা নিচু গলায় তার সমস্যার কথা বলতে শুরু করল।

তোকোতো আগেই বলেছি আমার চাকরি করাটা ও পছন্দ করে না। মাসখানেক
আগে আমাদের একজন অফিসার বেড়াতে এসেছেন আমার বাসায়। কীসি ভিজিট।
এতেই তার মুখ গম্ভীর-কেন এসেছে? মহিলা কলিগদের বাসায় ঘুর ঘুর করার দরকারটা
কি? এইসব।

তারপর কি হল শোন। সেই ছেলেটা আরেক দিন এলো। আব ওর মাথায় একদম
রক্ত উঠে গেল-কেন বার বার আসবে।

নীলু ক্ষীণস্বরে বলল, সত্যি তো কেন আসবে বার বার?

বার বার কোথায় দেখলি? দু'বার এসেছে মাত্র। আর আমি কি তাকে বলতে পারি
আপনি আসবেন না আমার এখানে?

গীত চুপ করে রইল। বন্যা গম্ভীর গলায় বলল, তারপর কি হলো শোন, ও বলল,
চাকরি ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে যদি থাকতে চাও তাহলে চাকরি ছাড়তে হবে।

তুই কি বললি?

‘আমার রাগ উঠে গেল। আমি বললাম, তুমি এমন কি রসগোল্লা যে তোমার সঙ্গে
থাকতেই হবে।

কি সর্বনাশ!

সর্বনাশের কি আছে। সত্যি কথা বললাম। মেয়ে হয়েছি বলে সত্যি কথা বলতে
পারব না?

সত্যি মিথ্যা এখানে কিছু নেই। তুই তোর বরকে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলি।

তা করেছিলাম। ও আমাকে রাগিয়ে দিতে পারবে আমি পারব না? খুব পারব।

কতদিন থাকবি আলাদা?

যতদিন দরকার হয় ততদিন থাকব। নিজ থেকে ফিরে যাবার মেয়ে আমি না।

হোটেলের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হলো। সুপার আসেন পাঁচটায়। সুপার ছাড়া
কোন কেউ কিছু বলতে পারবে না।

মহিলা হোটেলটি বেশ সুন্দর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভেতরের দিকে ফুলের বাগান
আছে। কমন রুমটি বিশাল। মেয়েরা হৈ হৈ করে পিংপং খেলছে। নীলু অবাক হয়ে
দেখল একটা টেবিল ঘিরে কয়েকজন মেয়ে তাস খেলছে। মেয়েরাও তাস খেলে নাকি?
একদ্রুতের জীবন শ্রুতিতেই মেয়েদের তাস খেলার ব্যাপারটা আছে। বাস্তবেও যে
শেলা হয় নীলু প্রথম দেখল।

দেখ বন্যা তাস খেলছে।

খেলবে না কেন? একশ'বার খেলবে। জুয়া খেলবে। মদ খেয়ে রাতে বাড়ি ফিরে
হামীকে ঠাঙ্গাবে। কোনো ছাড়াছাড়ি নেই।

নীলু হেসে ফেলল। বন্যার স্বভাব চরিত্রে অনেকখানি পাগলামী এসে ঢুকে যাচ্ছে।

সুপার এলো সাড়ে পাঁচটায়। সুপার মহিলা নন পুরুষ। অল্পধরনের লোক। কেউ
কিছু বললে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে যার থেকে ধারণা হয়, লোকটি কারো কোনো কথা
তনে না।

এখানে কোনো সিট নাই দরখাস্ত করলে ওয়েটিং লিষ্টে নাম তুলব। ফরম নিয়ে
দরখাস্ত করুন। কেন মহিলা হোটেলের থাকতে চান তার কারণ আলাদা একটা কাগজ
লিখে সঙ্গে দেন। সিট খালি হলে আপনাকে জানানো হবে।

কবে নাগাদ খালি হবে?

তা আমি কি করে বলব। আর খালি হলেই আপনি পাবেন কেন? ওয়েটিং লিষ্টে যে
প্রথম আছে সে পাবে।

আপনি এত অভদ্রভাবে কথা বলছেন কেন?

কোন কথাটা অভদ্রভাবে বললাম?

সারাক্ষণই তো ক্যাট ক্যাট করে কথা বলেছেন।

হোটেল সুপার প্রথমতঃ মুখে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে থেকে বলল এ্যাপ্রাই করতে
চাইলে ফরম নিয়ে এ্যাপ্রাই করুন। পাশের কামরায় ফরম আছে।

নীলু মৃদুস্বরে বলল, করবি এ্যাগাই?

করব। করব না কেন?

এখন ঘাবি কোথায়?

কোথায় আবার যাব? বাসায় যাব। রোজ একবার খোঁজ নেব সিট খালি।

কিনা।

নীলু লক্ষ্য করল বন্যাকে কেমন যেন ক্রান্ত লাগছে। চোখের নিচে কালি। সে মনে হয় শরীর বিশ্রামের জন্যে কাতর। বাচ্চাটাচ্চা হবে না তো? রাত্তায় নেমেই বলল, তোর কি আর কোনো খবর আছে?

আর কি খবর থাকবে?

এই ধর জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ক কোনো খবর।

বন্যা জবাব দিল না। অনামনকভাবে নিশ্বাস ফেলল। নীলু বলল, কি আছে ন্যাঁ জানি না। তুই এখন বাসায় চলে যা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যেতে পারবি তো এ একা?

পারব।

আয় তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

বাসে তুলে দিতে হবে না। তুই বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর। তোর বিশ্রাম দরকার বলতে বলতে নীলু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল। বন্যা বিরক্ত হয়ে বলল, কি যে বাে কথা বলিস।

তাহলে তোর কোনো খবর নেই।

বন্যা এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তার মুখ বিষণ্ণ। এমন একটি সুখের সময়ে কোঁ এত বিষণ্ণ থাকে কেন? এমন ছেলে মানুষ কেন বন্যা?

নীলু বাসায় ফিরল সন্ধ্যার পর।

তার জন্যে বড় ধরনের একটা চমক অপেক্ষা করছিল। নীলুর মা-রোকেয়া, দুপুরে ঢাকা এসে পৌছেছেন। তাঁর সঙ্গে বাবলু, বিলুর ছেলে। নীলু আনন্দের উচ্ছ্বাসে কোঁ টেদে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলল। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর মায়ের সঙ্গে নীলুর দেখা।

রোকেয়া নিজেও কাঁদছিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে চেষ্টা করেছিলেন মেয়েকে সামলাবার। টুনী এবং বাবলু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছে। টুনী কখনো তার মাকে কাঁদতে দেখেনি। তার বিশ্বয়ের কোনো সীমা ছিল না। বড় মানুষরাও তাহলে এমন করে কাঁদে?

নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, রাজশাহী থেকে ঢাকা কত আঁই-দূর মা? তোমার আসতে সাড়ে তিন বছর লাগল?

রোকেয়া মেয়েকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। কিছুই বললেন না।

তোমার নাতনিকে দেখেছ মা?

হঁ। বড় সুন্দর মেয়ে হয়েছে। তোর ননদের দ্বিতীয় রূপসী হবে।

শাহানা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। খুব লজ্জা পেল। লাজুক স্বরে বলল তোমার কান্না থামাও তো ভাবী। তোমার কান্না দেখে আমার নিজেরো চোখে পানি এসে যাচ্ছে।

নীলু গাধাকে কোলে নিয়ে আবার শানিকরুণ কাঁদল।

দুঃখ বাবলু?

রোকেয়া বললেন, কোল থেকে নামিয়ে দে। কেউ কোলে নিলেই কাঁদে।

নীলু নামাল না। শাহানা বলল, এই ছেলেটা কিন্তু ভাবী অশুভ। কোনো কথা বলে

দুঃখ বাবলু এসেছে এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি। মাএমা ও কি রাজশাহীতেও

কিন।

টো গো মা। কথাবার্তা যা বলে আমার সঙ্গেই বলে। তাও কানে কানে।

নীলু হাত মুখ ধুতে গেল। তার এত আনন্দ লাগছে আজ। মনে হচ্ছে পৃথিবীর মতো

জায়গা আর কিছুই নেই। অসংখ্য দুঃখের মধ্যেও এখানে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব

গাণ্ডার ঘটে যায় যে সব দুঃখ চাপা পড়ে যায়। বাথরুমে দরজা বন্ধ করে নীলু

শানিকরুণ কাঁদল।

রোকেয়াকে এ বাড়ির সবাই বেশ পছন্দ করেন। মনোয়ারা নিজেও করেন। অন্য

কেউ এ বাড়িতে কিছুদিনের জন্যে থাকতে এলেও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন শুধু

একটি ক্ষেত্রে করেন না। এর মূল কারণ হচ্ছে রোকেয়ার স্বভাব। তিনি কথা বলেন

। গভীর আশ্রয়ে অন্যের কথা শুনেন। নিজের কোনো মতামত কখনোই জাহির

করেন না। যখন কিছু বলেন এত আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন যে, শুনতে বড় ভালো

হয়।

মনোয়ারা দুপুর থেকে তাঁর সঙ্গে সুখ দুঃখের অনেক কথা বলছেন। তার মধ্যে

কোটা এড় অংশ ছিল নীলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এই দেখেন না বেয়ান সাহেব আমার ঘাড়ের ঘেয়ে দিয়ে সেই সকালে চলে যায়

কিনেস, ফিরে সম্মুখ পার করে। ঘরে একটা কাজের মানুষ নাই। আমি একা মানুষ।

কিনস তো হয়েছে আমার। না কি বলেন?

কাজের লোক রাখেন না কেন?

হাগারের পাগারের একজন কাউকে ধরে আনলেই রাখব নাকি? একটাকে

খোঁজলাম—বেশ কাজের। তারপর একদিন দেখি নাক ঝেড়ে সেই হাত তার শার্টে মুছে

কিন কিছুই হয়নি এরকমভাবে টেবিলে ভাত বাড়তে গেল। এক চড় দিয়ে হারামজাদাকে

বিদেয় করেছি।

বিদেয় করলেন কেন। ভালোমত বুঝিয়ে দিলেই হতো।

আমার এত সময় নেই বেয়ান সাহেব যে বসে বসে তাকে শিখাব। যে শিখেনা নয়

কিন সে শিখে না নব্বুই বছরে। আর আমেলা কি একটা? শাহানার বিরুদ্ধে ঠিক হয়ে

কিন জানেনতো?

জি জানি।

হটহাট করে গর স্বত্তরবাড়ি থেকে লোকজন আনিছে। ওদের তো আর টোট

কিন কিট দিয়ে চা দেয়া যায় না, কি বলেন?

না তা দেবেন কিভাবে?

কিন্তু দিতে হয়। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। সেই দিন শাহানার একখালা

শাওড়ি এসেছিলেন। একটা মানুষ নেই ঘরে। চা দিতে গিয়ে দেখি চায়ের পাতা চিন্তা করেন অবস্থা।

শাহানার বিয়েটা কবে?

জুলাই মাসের দশ তারিখে মোটামুটিভাবে ঠিক করা হয়েছে। ছেলের ছো থাকেন হাওয়াই। উনি জুলাই মাস ছাড়া আসতে পারবেন না। আর এটা হচ্ছে বংশের প্রথম কাজ। ওরা সবাইকে নিয়ে করতে চায়।

তা তো চাইবেই।

বিরাট খরচের ব্যাপার বুঝতেই পারছেন। এদিকে হাত একেবারে খালি। কি হবে কে জানে। মনে হলোই বুক শুকিয়ে আসে। ভেবেছিলাম এর মধ্যে র্কা একটা কিছু হবে, কিছুই হচ্ছে না।

ইনশাআল্লাহ হবে শিগগির।

আর হয়েছে। মহাঅপদার্থ। ওর কিছুই হবে না।

বাবলু তার অদ্ভুত স্বভাবের জন্যে খুব অল্প সময়েই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ব হোসেন সাহেবের মতে বাবলুর মতো গভীর ছেলে তিনি এর আগে দেখেননি। কথা নেই, কান্নাকাটি নেই, ঝামেলা নেই। গভীর আগ্রহে সব কিছু দেখছে। সবই ও দূর থেকে। মনোয়ারার ধারণা-ছেলেটা হাবা টাইপ। বুদ্ধিভক্তি নেই। কিন্তু ব সম্ভবত ঠিক নয়। ছেলেটির বুদ্ধি ভালো। শুধু ভালো নয় বেশ ভালো।

টুনী তার সঙ্গে ভাব করার খুব চেষ্টা করছে। বাবলু আছে তার সঙ্গে কিন্তু খুব ভাব হয়েছে বলে মনে হয় না। টুনী রান্নাবাটি খেলার সময় বাবলু একটু দূরে বসে থ থাকিয়ে থাকে গভীর মনোযোগে। খেলাতে তার অংশগ্রহণ বলতে এইটুকুই। টুনীর তার কথাবার্তার নমুনা এ রকম-

টুনী : রান্নাবাটি খেলবে?

বাবলু : (নিচুপ)

টুনী : আমি হচ্ছি মা। তুমি কি হবে?

বাবলু : (মৃদু হাসি)

টুনী : বাবা হবে?

বাবলু : (মাথা নাড়ল। তার অর্থ কি ঠিক বোঝা গেল না। হ্যাঁ হতে পারে। ও নাও হতে পারে)

টুনী : আচ্ছা তুমি বাবা। এখন অফিসে যাও। সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে আ:

বাবলু : (নড়ল না)

টুনী : কি অফিসে যাবে না?

বাবলু : (মাথা নাড়ল। কিন্তু এবারো বোঝা গেল না সে হ্যাঁ বলছে কি না বল

অত্যন্ত আকর্ষণের ব্যাপার হচ্ছে এ বাড়িতে যে একটি মাত্র লোকের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয় সে সফিক। সে ঘুরেফিরে সফিকের কাছে আসে এবং অত্যন্ত গভীর সফিকের পাশে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে চলে যায়। এই অল্প কিছু সময়ের ম দু'একটা কথাবার্তা হয়।

দেমন গত রবিবারের কথা ধরা যাক। সফিক তরে ছিল বিছানায়, বাবলু পর্দার
 পেকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করল। তারপর গট গট করে ঘরে ঢুকে
 খাটে বসে রইল। সফিক বলল-কি খবর তোমার বাবলু সাহেব? ভালো আছ?
 বাবলু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। সে ভালোই আছে। সফিক বলল, হাত বাড়িয়ে
 প্যাকেটটা দাও তো। বাবলু দিল। সফিক সিগারেট ধরিয়ে বলল, তুমি
 নাও না কি বাবলু? বাবলু মাথা নাড়ল, সে খাবে না। সফিক বলল, তুমি সিগারেট
 না?

না।

কেন?

ভালো লাগে না।

এমনভাবে বলা যেন আগে অভ্যাস ছিল। ভালো না লাগায় বর্তমানে ছেড়ে দিয়েছে
 খুব পীড়াপীড়ি করলে সে একটা সিগারেট টেনে দেখতে পারে।

বাবলু সাহেব তুমি ছড়া বা কবিতা এসব কিছু জানো?

হঁ।

শোনাও একটা ছড়া। ছড়া শুনতে ইচ্ছা করছে।

বাবলু উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত ছড়া শুনাবার তার তেমন আগ্রহ নেই। ঘর থেকে বের
 গেল নিঃশব্দে, পর মুহূর্তেই পর্দার ওপাশ থেকে বাবলুর ছড়া শোনা গেল....

হইয়ার বাড়ি গেছিলাম

দুধ ভাত দিছিল

দুই ভাত খাইছিলাম।

অদ্ভুত ছড়া। স্বরচিত হবারই সম্ভাবনা। সফিক হাসি মুখে বলল, খুব চমৎকার ছড়া।
 এসো ভেতরে এসো। বাবলু ভেতরে ঢুকল না। সফিককে অবাক করে দিয়ে একই ছড়া
 দ্বিতীয়বার পর্দার আড়াল থেকে বলল। সফিক হেসে ফেলল। বড় মজার হেলেতো।

রোকেয়া রাতে ঘুমান শাহানার সঙ্গে। তিনি, বাবলু ও শাহানা। শাহানার খাটটি
 তিনজনে চাপাচাপি হয়। রোজ রাতেই রোকেয়া বলেন তোমাকে তো মা বড় কষ্ট
 শাহানা লজ্জিত স্বরে বলে, কি যে আপনি বলেন মাঐমা, আপনাকে আমরা উল্টো
 দিচ্ছি। আমার কোনোই কষ্ট হচ্ছে না। আপনি থাকায় কত রকম গল্প টক্কর করতে
 পাচ্ছি।

এই কথাটা খুবই সত্যি। শাহানা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে গল্প করে।
 রোকেয়ার চোখ একেই সময় ঘুমে বন্ধ হয়ে আসে কিন্তু ঘুমুতে পারেন না শাহানা ডেকে
 কখনো-মাঐমা ঘুমাচ্ছেন নাকি?

নাগো মা। জেগেই আছি।

বীণার কথা কি আপনাকে বলেছি?

বীণা কে?

আমাদের বাড়িওয়ালার রশীদ সাহেবের মেয়ে। তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ঘরের
 মেয়ে। প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন বিয়ের এক মাসের মধ্যে। খুব রূপসী ছিলেন। আমরা
 বেশি দেখিনি শুধু শুনেছি। মাঐমা ঘুমিয়ে পড়েছেন?

না।

তাহলে বীণার কাণ্টা তুনে। কাউকে বলবেন না আবার।

না বলব না।

আমার কি মনে হয় জানেন মাঐমা? আমার মনে হয় আনিস ভাইয়ের সঙ্গে কিছু একটা সম্পর্ক আছে।

আনিস ভাই কে?

আহা ঐ দিন না বললাম আপনাকে আমাদের চিলেকোঠায় থাকেন। ম্যাড্রিগাল ও হ্যা বলেছে।

আপনার সঙ্গে দেখাও তো হয়েছে। ঐ যে হলুদ রঙের স্যুয়েটার পর একটি এসে আপনাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

হ্যা হ্যা মনে পড়েছে।

বুঝলেন মাঐমা আমার মনে হয় আনিস ভাইয়ের প্রতি বীণার একটা ইয়ে আছে। কিভাবে বুঝলাম জানেন?

না কিভাবে বুঝলেন?

ব্যাখ্যাটা খুবই গোপন। আমি হঠাৎ টের পেয়ে ফেলেছি। আপনি কাউকে বলবেন না।

না মা আমি আর কাকে বলব?

শাহানা খাটে উঠে বসল। আশেপাশে কেউ নেই তবু সে গল্প করতে লাগল ফিস ফিস করে। মনোয়ারা লক্ষ করেছেন মেয়েটা প্রায়ই আনিস ছেলেটির প্রসঙ্গ নিয়ে আসছে। তার গল্পের এক পর্যায়ে ম্যাড্রিগিয়ান আনিসের কথা থাকবেই। প্রতি রাতে তাবেন সকালবেলা নীলুকে জিজ্ঞেস করবেন। একটি মেয়ে যার কয়েকদিনের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে সে রোজ রাতে অন্য একটি ছেলের গল্প এত আগ্রহ করে করবে কেন?

মাঐমা ঘুমিয়ে পড়েছেন?

না।

বীণা মেয়েটার ঘটনাটা কেমন লাগল?

তিনি কিছু বললেন না। হাই তুললেন।

মাঐমা কাল আমি আনিস ভাইয়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।

আচ্ছা। এখন ঘুমাও মা। রাত অনেক হয়েছে।

আনিস ভাই, মাঐমাকে একটা ম্যাড্রিক দেখান তো। গোলাপেরটা না। ওটা দেখতে দেখতে চোখ পড়ে গেছে।

আনিস খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্রেডের একটা খেলা দেখালো। এই খেলাটা শাহানাও এর আগে দেখেনি। হাত দিয়ে সে শূন্য থেকে একটার পর একটি চকচকে ব্রেড বের করতে লাগল। সেসব ব্রেড সে টপাটপ গিলে ফেলতে লাগল। রোকেয়া আঁতড়ে উঠলেন। একি কাণ্ড। শাহানা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, সত্যি সত্যি খাচ্ছে না মাঐমা। ব্রেড কেউ খেতে পারে?

রোকেয়া ডেবে পেলেন না যে ব্রেডগুলি মুখে পুরেছে সেগুলি গেল কোথায়? সেই রহস্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেদ হলো। আনিস গিলে ফেলা ব্রেডগুলি একটার পর একটা

শেষের করে সামনের টেবিল প্রায় ভর্তি করে ফেলল। রোকেয়ার বিশ্বয়ের সীমা না। করে কি করে এসব? চোখের ধাক্কা নাকি? এই বাচ্চা ছেলে তাঁর মতো বুড়ো চোখে ধাক্কা লাগাবে কিভাবে?

শাওনা রোকেয়ার বিস্মিত মুখ ভঙ্গি খুব উপভোগ করছে। যেন এই চমৎকার কৃতিত্ব তার। এসব তো ভালো লক্ষণ নয়। নীলুর সঙ্গে কথা বলা। এত চমৎকার একটি মেয়ের জীবনে সামান্যতম সমস্যাও আসা উচিত নয়। খুব গাঢ় খুব চালাক মেয়ে। কিছু একটা হলে নিশ্চয়ই তার চোখে পড়বে। কিছু নয়। কিন্তু এমন মুখ চোখে মেয়েটি তাকিয়ে ছিল আনিসের দিকে। এই দৃষ্টি ভুল কথা নয়।

আনিস ছেলেটিকে তাঁর বেশ লাগল, ভদ্র এবং লাজুক। এ বকম একটা লাজুক ম্যাজিশিয়ান হবে কিভাবে? ম্যাজিক দেখানো কি লাজুক ছেলের কাজ? পড়াশোনা তার ম্যাজিশিয়ান হবার এমন অদ্ভুত শব্দইবা কেন হলো? মাথার উপর বুদ্ধি দেয়ার নেই। বুদ্ধি দেয়ার কেউ থাকলে কি এরকম হয়? মা বাবা বেঁচে থাকলে এই ছেলে এই এসব নিয়ে মেতে উঠতে পারত না। রোকেয়ার বড় মায়া লাগল।

তিনি এক সপ্তাহ থাকবেন বলে এসেছিলেন। প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল। যেতে করছে না। জামাইয়ের বাড়িতে এত দীর্ঘদিন থাকাও যায় না। কিন্তু থাকতে তাঁর লাগছে না। ভালোই লাগছে। যার জন্যে আসা সেই নীলুর সঙ্গে কথা বলার জন্যে কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ নীলুর সঙ্গে তাঁর জরুরি কথা বলা দরকার। নীলু জামিন থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে। ফিরেই সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠে। তাকে একা পাওয়াই মুশকিল কারণ শাহানা তাঁর সঙ্গে ছায়ায় মতো লেগে থাকে। কথাগুলো শাওনার সামনেও নিশ্চয়ই বলা যায়, কিন্তু তাঁর বড় লজ্জা লাগে। কিন্তু না বলেইবা যায় কি। রাজশাহী ফিরে যাবার দু'দিন আগে তিনি নীলুকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে হাঁটতে গেলেন। নীলু বলল কিছু বলতে চাও নাকি মা?

হ্যাঁ।

টাকা পরস্যা দরকার।

না সেসব কিছু না।

নিজের মেয়ের কাছেও তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েরা গোধ হয় পুরোপুরি নিজের মেয়ে থাকে না। এদের কাছে সহজ হওয়া যায় না।

চুপ করে আছ কেন মা, বল।

বাবলুকে ভোর কাছে রাখবি? ওকে নিয়ে বড় কষ্টে পড়েছি। নীলু চুপ করে রইল।

তারা ছেলেটাকে সহ্যই করতে পারে না। এইটুকু বাচ্চা অথচ

দুলাভাই কোনোরকম খোঁজখবর করে না।

না।

দেখতেও আসে না?

গত মাসের আগের মাসে একবার ঘণ্টা খানিকের জন্যে এসেছিল।

ছেলেকে নিয়ে কি করবে না করবে কিছুই বলেনি?

না।

কেমন মানুষ বল তো মা?

দু'জন বেশ বানিক্ৰুপ চূপ করে রইল। ছাদে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আনিচে থেকে খনখন শব্দ হচ্ছে, কোনো ম্যাজিকের প্রাকটিস বোধ হয়। রোকেয়া বললেন, বাবলু একটা কাঁচের জাগ ভেঙ্গে ফেলেছিল সেই অপরাধের শাস্তি কি হ শোন...

এসব স্নতে চাই না।

তুই জামাইকে বলে দেখ যদি রাখতে রাজি হয়। শান্তিতে মরতে পারি।

এখনই মরার কথা আসছে কেন?

বাঁচব না বেশি দিন।

বুঝলে কি করে?

এসব বোঝা যায়। তোর বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন।

নীলু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল-বাবলু কি পারবে তোমাকে ছেড়ে থাকতে?

পারবে। ও শক্ত ছেলে। তুই একটু বলে দেখ জামাইকে। নাকি আমি বলব?

তোমার বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব।

রাজি হতে চাইবে না হয়তো? কে চায় একটা বাড়তি ঝামেলা কাঁধে নিতে।

নীলু জবাব দিল না। রোকেয়া বললেন, তুই চাকরি করিস এটা বোধ হয়।

শাতড়ি পছন্দ করে না।

নীলু সে কথারও কোনো জবাব দিল না। সে বাবলুর ব্যাপারটি কি করে বলবে ভাবছিল। রোকেয়া বললেন, চল নিচে যাই। তোর শাতড়ি বোধ হয় খুঁজছে। তুমি মা। আমি থাকি এখানে কিছুক্ষণ। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। রোকেয়া নিচে নেমে গেলে তার কিছুক্ষণ পরই চায়ের কাপ হাতে শাহানা তাকে খুঁজতে এলো। সে অবাক দেখল, নীলু কাঁদছে।

কি হয়েছে ভাবী?

কিছু হয়নি।

তোমার জন্য চা এনেছি।

চা খাব না শাহানা।

একটু ঝাও ভাবী, আমি নিজের বানিয়েছি।

বলতে বলতে সেও কেঁদে ফেলল। কাউকে কাঁদতে দেখলেই তার কান্না যায়। নীলু অবাক হয়ে বলল,

তোমার আবার কি হলো?

শাহানা ফোঁফোতে লাগল। কিছু বলল না।

বাবলুকে রেখে রোকেয়া রাজশাহী চলে গেলেন। মনে করা হয়েছিল বাবলু কান্নাকাটি করবে সে তেমন কিছুই করল না। রোকেয়া যখন বললেন, যাই বাবলু? বাবলু ঘাড় কাত করল। যেন যাবার অনুমতি দিচ্ছে।

কাঁদবে না তো?

বাবলু মাথা লাড়ল। সে কাঁদবে না।



রহমান সাহেব দীর্ঘ দিন পর উত্তেজনা অনুভব করছেন।

মেঘের বিয়েতে তিনি বড় রকমের একটা হেঁচকি করতে চান। সব ধরনের কল্যাণ, উৎসব অনুষ্ঠান তিনি মনে প্রাণে অপছন্দ করতেন। এখনো করেন কিন্তু কল্যাণের বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা মনে হলেই মনে হয় ঢাকা শহরের সবাইকে আনন্দ কল্যাণে ডাকা যায় না?

গাও জেগে আত্মীয় স্বজনদের লিপি তৈরি করেছেন। কেউ বাদ থাকবে না সবাই জামে। দাওয়াতের চিঠি নিয়ে লোক যাচ্ছে। প্রতিটি দাওয়াতের চিঠির সঙ্গে ঢাকার কল্যাণ যাওয়ার খরচ দেয়া হচ্ছে।

তার নিজের বাড়িটি প্রকাণ্ড তবু তিনি আরেকটি দোতলা বাড়ি ভাড়া করেছেন। বিয়ের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা একটা বড় হোটেলের সারবার জন্যে সবাই বলছিল। প্রচণ্ড বেশি হলেও কামেলা কম হবে। তিনি রাজি হননি। তার কামেলা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। বাবুচিরা বিশাল ডেগচিতে পাক বসাবে। সকাল থেকেই ঘিয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। হেঁচকি ছুটাছুটি হবে। তবেই না আনন্দ।

এইটি তো জীবনের শেষ কামেলা। আবাব একদিন শারমিনের বাচ্চার বিয়ের সময় কামেলা হবে। সেই কামেলায় তিনি অংশ নিতে পারবেন এমন মনে হয় না। মানুষ সিন্ডিকের মৃত্যুর ব্যাপারটি আগে আগে টের পায়।

বাত নটা বাজে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। রহমান সাহেব শারমিনের ঘরের দিকে তাকা হলেন। শারমিনকে নিয়ে বারান্দায় বসবেন। বারান্দায় বেশ হাওয়া।

শারমিনকে কেমন যেন রোগা রোগা লাগছে। চোখের নিচে কালি। গুরু কি ভালো খুম হচ্ছে না? অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিয়ের আগে আগে নানান ধরনের দুশ্চিন্তা মানুষকে লাগু করে ফেলে। শারমিনকেও নিশ্চয়ই করছে। এবং ওকে সাহস ও আশ্বাস দেবার কেউ নেই।

শরীরটা ভালো আছে তো মা?

ভালো আছে।

ঘুম হচ্ছে না ভালো? মুখটা কেমন শুকনা লাগছে। শারমিন শুধু করে বলল, যা গরম।

দোতলার ঘরটার এয়ারকুলার চালু করে ঘুমালেই পারবে।

না ঐখানে আমার কেমন দম বন্ধ লাগে।

চা খাওয়া যাক, কি বলো শারমিন?

গরমের মধ্যে আমি চা খাব না।

গরমের মধ্যেই চা ভালো। বিষে বিষ ক্ষয় হয়। যাও চায়ের কথা বলে আস।
চা না চাইলে ঠাণ্ডা কিছু নাও। এসো কিছুক্ষণ গল্প করি। নাকি আমার সঙ্গে গল্প ঠ
ভালো লাগবে না?

ভালো লাগবে না কেন?

কেমন গল্পের মুখে বসে আছি তাই বলছি।

শারমিন হাসল।

তোমার ক'টা কার্ড লাগবে তা ভো বললে না।

আমার কোনো কার্ড লাগবে না বাবা।

কেন লাগবে না কেন?

আমার কাউকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করছে না।

রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কেন করছে না?

জানি না কেন করছে না।

আমার মনে হয় তুমি সাময়িকভাবে একটা ডিপ্রেসনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ। এ
অস্বাভাবিক কিছু নয়। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবে?

না, না আমার কি কোনো অসুখ করেছে নাকি যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব?
তাও ঠিক।

রহমান সাহেব হাসলেন। শারমিনও হাসল।

শারমিন, সাক্ষির কি ছ' তারিখে আসছে?

ছ' তারিখে কিংবা আট তারিখে?

তুমি কিন্তু এয়ারপোর্টে যাবে।

ঠিক আছে যাব।

তুমি কিন্তু মা এখনো আমার চায়ের কথা বলনি। তুমি কি কোনো ব্যাপারে
আপসেট?

না। আপসেট না।

সে আপসেট না এই কথাটা ঠিক নয়। শারমিন এক অদ্ভুত সংশয়ে ভুগছে। যা
উৎস সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। উৎসবের ছোঁয়া চারদিকে কিন্তু এই উৎসব তাকে
স্পর্শ করছে না। বাবা প্রতি রাতে বিয়ের নানান ব্যাপার কত আগ্রহ নিয়ে গল্প করছেন
তাতেও মন লাগছে না। কেন লাগছে না? সাক্ষিরকে কি সে পছন্দ করছে না? তাও ভো
সত্যি নয়।

মানুষ হিসেবে তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। যতটুকু দেখেছে তার
ভালোই লেগেছে। সাক্ষিরের ভেতর এক ধরনের দৃঢ়তা আছে। যা ভালো লাগে। সব
মেয়েই বোধহয় তার পাশে একজন শক্ত সবল মানুষ চায় যার উপর নির্ভর করা চলে।

সে রাতদিন বইপত্র নিয়ে থাকে এখানে কি শারমিনের আপত্তি? তাও ভো নয়,
পড়াশোনা সে নিজেও পছন্দ করে। জীবনের বেশির ভাগ সময়তো সে বই পড়েই
কাটিয়েছে। তাহলে আপত্তিটা কোথায়?

শারমিন নিজেই চা বানাতে। বাবার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করে ইদানীং করা হচ্ছে
না। বিয়ের পর আরো হবে না। এই মানুষটি পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন। সারাদিন

নাকি তার দেখে ফিরে আসবেন জনমানবহীন বিশাল একটি বাড়িতে। হয়তো আবার কুঁকর শব্দে। দিন কয়েক আগেই সরাইলের দু'টি কুকুর আনা হয়েছে। কিন্তু পছন্দ না হওয়ায় ফেরত পাঠিয়েছেন। এ রকম হতেই থাকবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে কুকুর আনা তাদের পছন্দ হবে না। আবার সেগুলি ফেরত যাবে।

পাখার জীবনের শেষ অংশ কেমন হবে? এদেশের অসম্ভব বিস্তারিত একজন মানুষ তার জীবনে একা একা? আসলেই কি বিপুল বৈভবের ভেতর কোনো দরকার আছে?

মাথা!

শ্যামিন চমকে তাকাল জয়নাল, কখন যে নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি ব্যাপার জয়নাল?

শ্যামিনের কাছে যে আসে একজন দাড়িওয়ালা মানুষ রফিক সাব।

হ্যাঁ কেন?

হেইন আইজ সইন্সয়া আসছিলেন।

আমাকে আগে বলনি কেন?

মনে আছিল না আফা।

ডাকলে না কেন আমাকে?

ডাকতে গেছিলাম, জামিলার মা কইল আপনার মাথা ধরছে। দরজা বন্ধ কইরা ঘুমাতাছেন।

ও আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও।

জয়নাল গেল না। মাথা নিচু করে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু বলবে জয়নাল?

জি।

বল।

জয়নাল একটা অদ্ভুত কথা বলল। সে নাকি তার ঘরে ঘুমুতে পারে না। জেগে কাটাতে হয়। কারণ সে প্রায়ই দেখে তার ঘরে মার্টি সাহেব হাঁটছে কিংবা পা ছড়িয়ে ঘুমচ্ছে। ঘর অন্ধকার থাকলেও দেখা যায়। বাতি জ্বাললে দেখা যায় না। শারমিনের শয্যার সীমা রইল না। বলে কি এ।

রোজ দেখ?

রোজ দেখতাম আগে। এখন সারারাত ঘরে বাতি জ্বলে। আমারে অন্য একটা ঘরে পাঠাতে দেন আফা।

বেশ তো থাক অন্য ঘরে। ঘরের ভেতর ভেতর নেই।

জয়নাল বেরিয়ে যেতেই শারমিনের মনে হলো সে মিথ্যা কথা বলেছে। উদ্দেশ্যও পরিষ্কার, একটা ভালো ঘর সে দখল করবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলে অন্য একটা চমৎকার গল্প সে ব্যবহার করছে। আমরা সবাই কি সে রকম কবি নই?

চা নিয়ে বারান্দায় যাওয়া মাত্রই রহমান সাহেব জ্বললেন, তোমাকে একটা বড় খবর দেয়া হয়নি।

কি খবর?

এখন না সে স্ববরটা বিয়ের পর পরই দেব।

ওধু ওধু তাহলে আমার মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে দিলে কেন?

ইচ্ছা করেই দিলাম।

রহমান সাহেব ছেলেমানুষের মতো হাসতে লাগলেন। যেন বুদ্ধি কবে শারমিনকে ভেতর কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরে তিনি খুব খুশি। কিন্তু শারমিন তেমন কৌতূহল অনুভব করল না। তার হুম পেতে লাগল।

আমি যাই বাবা হুম পাচ্ছে।

আর একটু বস মা। রাত বেশি হয়নি।

শারমিন বসল। রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, আমি সব কর্মচারী তোমার বিয়ে উপলক্ষে একটা বোনাস পাচ্ছে তুমি জানো?

জানি। ম্যানেজার সাহেব আমাকে বলেছেন।

আইডিয়াটা তোমার কেমন লাগল মা?

ভালোই। প্রাচীন কালের রাজা মহারাজাদের মতো মনে হচ্ছে। তাঁরাওতো নিজে পুত্র কন্যাদের বিয়ে উপলক্ষে সবাইকে খেলাত টেলাত দিতেন।

রহমান সাহেব উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন। শারমিনের কথাগুলি তাঁর বড় ভাল লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত কন্যা ও পিতা বসে রইল মুখোমুখি।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। অনেক দূরে বিন্যাস চমকচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়। রহমান সাহেব বললেন, যাও মা গুয়ে পড়ো। শারমিন নড়ল না। যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল।

সাক্ষির এলো আট তারিখে। আগের বার এয়ারপোর্টে তাকে রিসিড করবার জন্যে কেউ ছিল না। এবার অনেকেই এসেছে। সাক্ষিরের মা অসুস্থ, তিনিও এসেছেন। এখান লোকজনের মাঝখানে বিশাল একটা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে শারমিনের অস্বস্তি লাগছিল। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা! এসব পলিটিশিয়ানদের মানায় অন্য কাউকে মানায় না। তাছাড়া তোড়া জিনিসটাই বাজে। একগাদা ফুলকে জরিফ ফিতার বেঁধে রাখা। অসহ্য। এরচে' একটি দু'টি গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভালো। কেনো একটি ছবিতে এমন একটি দৃশ্য শারমিন দেখেছিল। রেলস্টেশনে একগাদা গোলাপ নিয়ে একটি মেয়ে তার প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা। যদি সে না আসে? কত মানুষ নামল কত মানুষ উঠল। কিন্তু ছেলেটির দেখা নেই। মেয়েটি প্রাটফরমের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করছে। হাত থেকে একটি একটি করে ফুল পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটির সেনিকে খেয়াল নেই। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ছেলেটিকে। মেয়েটি সব ফুল ছুড়ে ফেলে জড়িয়ে ধরল তাকে চমৎকার ছবি।

কেমন আছ শারমিন?

ভালো। আপনি কেমন?

খুব ভালো।

এই নিন আপনার ফুল।

ব্যাংক ইউ। ব্যাংক ইউ ফর দি ফ্রাওয়ার্স।

আপনার গায়ে ধবধবে সাদা একটা শার্ট। গাঢ় নীল রঙের একটা টাই। দীর্ঘ
ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই তার চেহারায়ে। কি চমৎকার লাগছে তাকে
। শারমিন ছোট্ট একটি নিশ্বাস গোপন করল।

লাগবে বলল, আমার সঙ্গে চलो শারমিন। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।

কেন?

লাগবে।

আমার এয়ারপোর্টের সকলকে সচকিত করে হেসে উঠল। এবং অত্যন্ত সহজ
শারমিনের হাত ধরল। দৃশ্যটি এতটুকুও বেমানান মনে হলো না। যেন এটাই
সাক্ষির মা একটু পেছনের দিকে সরে গেলেন। কলেজ টলেজে পড়া
কি মেয়ে আছে তার সঙ্গে। তারা মুখ নিচু করে হাসতে লাগল। শারমিনের লজ্জা
লাগল।

আমার খুশি খুশি গলায় বলল, তোমার বাবা এটা কি শুরু করেছেন বলতো?
কি করেছেন?

বিশাল এক বাড়ি ভাড়া করেছেন মা'র জন্যে। তিন মাসের জন্য ভাড়া করা হয়েছে।

উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনরা আসবে। মার চিঠিতে জানলাম সে বাড়ি নাকি
আমাদের মতো। ডুইং রুমটায় নাকি কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।

আমার হুটচিতে হাসতে লাগল। শারমিন কিছু বলল না। সাক্ষির মা'র জন্যে

ভাড়া করা হয়েছে এই তথ্যটা সে জানত না। বাবা এ বিষয়ে তাকে কিছু বলেনি।

বলল, আমি কিন্তু এখন সত্যি সত্যি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। পরে আপনার
কথা হবে।

পরে না, এখনই হবে। তুমি এখন আমার সঙ্গে যাবে। প্রেনে আজ একটা অদ্ভুত
কথা হয়েছে ওটা শুনবে।

সাক্ষির মা বললেন, চলো মা আমাদের সঙ্গে। লজ্জার কিছু নেই। আর সাক্ষির,
এমন হাত ধরে টানাটানি করছিস কেন? হাত ছেড়ে দে।

শারমিনের বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ি রং করার লোকজন
এলেন। এরা বিদায় নিচ্ছে। কিছু অপরিচিতা মহিলাকেও দেখা যাচ্ছে। আত্মীয়-
স্বজনরা আসতে শুরু করেছেন বোধহয়। তারা দূর থেকে কৌতূহলী হয়ে শারমিনকে
লক্ষ্য করে। কাছে এগিয়ে আসছে না। শারমিন হাত ইশারা করে জয়নালাকে ডাকল।

জয়নালা, কেউ কি এসেছিল আমার কাছে?

জি না, আফা।

এফিক সাহেব?

জি না, আসেন নাই।

ঠিক আছে তুমি যাও। ভালো কথা, ঘর ঝাড় করেছ?

জি করছি।

এখন আর নিশ্চয়ই মার্টি সাহেবকে দেখ না?

জয়নাল মৃদু স্বরে বলল, জিঁ দেখি। কাইল রাইতেও দেখছি।

শারমিন কিছু বলল না। অশরীরী মাটি শুধু জয়নালকে দেখা দেবে কেন? তার প্রিয়জনদের কাছে। আসবে তার কাছে। কিন্তু আসছে না। কেন আসা শারমিন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। বড্ড, ক্লান্ত লাগছে। দু'টি বাস্কা ছেলে না এরা শারমিনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

তোমরা কারা?

ছেলে দু'টি জবাব দিল না। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। উপলক্ষে এসেছে নিশ্চয়ই। ছেলে দু'টি ভয় পেয়েছে। সম্ভবত তাদের বলা হা দোতলায় উঠা যাবে না। এত আগে সবাই আসতে শুরু করল কেন?

কি নাম তোমাদের?

ভারা উত্তর না দিয়ে ছুটে নেমে গেল।

শারমিনের ঘর তালাবদ্ধ। আকবরের মা তালার খুলতে খুলতে বলল, বাড়ি হইয়া গেছে মাইনসে। এইটা ধরে ওইটা ছোয়। কিছু কইলে ফুঁস কইরা উঠে। অমুক আখীয়া, তমুক আখীয়া। শারমিন বলল, আমার ঘরের সামনে কাউকে বসিয়ে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে।

জিঁ আইচ্ছা।

শারমিন হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই জয়নাল এসে দিল, রফিক সাহেব এসেছেন।

রফিক হাসি মুখে বলল, বিয়ের দাওয়াত নিতে এলাম। তুমি তো দাওয়াত দি বাধা হয়েছে নিজে থেকে আসা। এর আগেও একদিন এসেছিলাম।

স্ববর পেয়েছি।

এখন বলো, বিয়ের দাওয়াত দিচ্ছ না?

দিচ্ছি। বাসার সবাইকে নিয়ে আসবে। কাউকে বাদ দেবে না। তে চাকরিবাকরি এখনো কিছু হয়নি তাই না?

বুঝলে কি করে?

খট রিডিং। তুমি কিছু খাবে?

ঘরে তৈরি সন্দেশ ছাড়া যে কোনো জিনিস খাব। এ্যাক্স এ ম্যাটার অব ফেক্ট। আমার খাওয়া হয়নি।

কেন?

কেন হয়নি সেটা ইম্পোর্টেন্ট নয়। খাওয়া হয়নি সেটা ইম্পোর্টেন্ট।

শারমিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আচ্ছা রফিক সাহেব যদি তোমার জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করে দেই তুমি করবে?

কি রকম চাকরি?

ভালো চাকরি। বেশ ভালো। মাসে তিন-চার হাজার টাকার মতো পাওয়া এরকম কিছু।

কিন্তু পাঞ্জাবির পকেট থেকে তার সিগারেটের প্যাকেট বের করল। অনেকখানি
সিগারেট খরাল, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, না করব না।

কিন্তু?

তোমার কাছে থেকে সুবিধা নেব এজন্যে আমি কখনো তোমার কাছে আসিনি।

কিন্তু কেনো এসেছি?

কিন্তু কেনো এসেছি তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। জানো না?

পারামিন শুকনো মুখে হাসল। রফিক বলল, আজ বেশিক্ষণ থাকব না। কাজ আছে।

কিন্তু কাজ?

তোমার মানুষেরই কাজ থাকে বেশি। তোমাদের খারণা বেকাররা রাত দিন সিগারেট
চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয় এ খারণা ঠিক না।

তোমার সম্পর্কে আমার কোনো খারণা নেই। আমি আগে কখনো বেকার দেখিনি।

তাকেই শুধু দেখলাম।

কেন না লাগল আমাকে?

পারামিন জবাব দিল না। কিছু প্রশ্ন আছে যার কোনো জবাব দেয়া সম্ভব হয় না।



খবরের কাগজে তিন লাইনের একটা বিজ্ঞাপন উঠেছে। হোসেন সাহেব খুবই
স্বস্তি হলেন যে এটা কারো চোখে পড়ল না। লোকজন কি আজকাল বিজ্ঞাপন পড়ে
রাখবে?

তার খারণা ছিল মেয়েরা বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু খারণাটা সত্যি নয়। নীলু,
মনোয়ারা এরা কেউ এই প্রসঙ্গে কিছু বলল না। মনোয়ারার চোখে না পড়া
হলো। তিনি চান না মনোয়ারা দেখুক কিছু অন্য দু'জন কেন দেখবে না?

বিজ্ঞাপনটা এ রকম,

শেষ চিকিৎসা

দুরারোগ্য পুরনো অসুখের হোমিওপ্যাথি মতে

চিকিৎসা করা হয়। যোগাযোগ করুন।

এম হোসেন

১৩/৩ কল্যাণপুর

ঢাকা।

এক মাসের টাকা দেয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে দু'বার করে এই বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।
খবর বা দাঁড়ালে তাতে মনে হয় না বিজ্ঞাপনে কোন লাভ হবে। কেউতো পড়ছেই
না।

হোসেন সাহেব খবরের কাগজ হাতে রান্না ঘরে ঢুকলেন। নীলু রান্না চড়িয়েছে।
কতকটা দেখে সে বলল, কিছু বলবেন নাকি বাবা?

না তেমন কিছু না। আজকের খবরের কাগজটা কি পড়েছ?
নীলু অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ। কেন?
একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে চোখে পড়ে নাই?
তিনি খবরের কাগজ মেলে ধরলেন।
ভাবলাম একটা দিন্যা যখন শিখলাম কষ্ট করে তখন কাজে লাগানো যাক
বলো?

তাঁ তো ঠিকই।

এটাও এক ধরনের সমাজসেবা, কি বলো না?

তাতো নিশ্চয়ই।

গরিব দুঃখীদের কাছ থেকে পয়সা নেব না ঠিক করেছি। তবে অন্যদের কাছ
নেয়া হবে। বাসায় এলে দশ টাকা আর কল দিয়ে নিয়ে গেলে কুড়ি টাকা। বেশ
গেল নাকি?

না বেশি হয়নি ঠিকই আছে।

হোসেন সাহেব ইতস্তত করে বললেন-বাড়ির সামনে একটা সাইন বোর্ড
হবে। “ডাঃ এম হোসেন হোমিও” কি বলো মা? লোকজন বিজ্ঞাপন দেখে আসবে।
খুঁজে বের করতে হবেতো?

সাইন বোর্ড তো দিতেই হবে। আপনি রফিককে বলে দিন ও সাইন বোর্ড কা
নিয়ে আসবে।

হ্যাঁ বলব। ইয়ে আরেকটা কথা মা।

বলুন।

তোমার শাতড়িকে কিছু না বলাই ভালো। মনে কিছু চিন্তাভাবনা না করেই
যায় তো সে জন্মোই বলছি।

না বাবা আমি কিছু বলব না।

নীলুর কথার মাঝখানেই মনোয়ারা ঢুকলেন। হোসেন সাহেবকে দেখেই
উঠলেন।

রান্নাঘরে ঘুরঘুর করছ কেন? পুরুষ মানুষদের রান্নাঘরে ঘুরঘুর করা আমার প
না। যাও টুনীদের বই নিয়ে বসাও।

অন্যদিন হলে তিনি কিছু বলতেন। রান্নাঘরে পুরুষ মানুষদের থাকা উচিত,
উচিত না এই নিয়ে মোটামুটিভাবে একটা তর্ক বাধিয়ে বসতেন। আজ কিছুই বল
না। টুনী এবং বাবলুকে নিয়ে পড়াতে বসলেন।

মনোয়ারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার স্বত্তরের কাছাকাছি নয় লজ্জায়
দেখানো দায়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেছ? এম. হোসেন দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, ঠিক
দেখে বুঝলাম। তোমাকে বিজ্ঞাপনের কথাই বলছিল বেশি হয়।

জি।

লোকটা যে বোকা তাও না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে। সে এক
ডাক্তার হয়ে গেছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। চিন্তা করো অবস্থা।

নীলু মৃদু স্বরে বলল, কিছু বলার দরকার নেই মা।

না খালে তো আশকারা দেয়া হবে। এ সব জিনিস আশকারা দিতে নেই।

টুনি এবং বাবলু পড়তে বসেছে। এদের পড়ানোর কাজটা হোসেন সাহেব নিজেই করে নিয়েছেন। পড়াশোনা চলছে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। প্রতিদিন একটি করে কবিতা বা গল্প ভাবে শেখানো হচ্ছে। হোসেন সাহেব হিসাব করে দেখেছেন এগারোটি কবিতা শিখতে লাগবে এগারো দিন এবং ব্যঙ্গনবর্ণ শিখতে লাগবে আটত্রিশ দিন। মোট মাত্র উনিশ দিনে প্রতিটি বর্ণ তারা পড়তে এবং লিখতে শিখবে।

যা শেখানো হচ্ছে 'গ'। হোসেন সাহেব প্রকাণ্ড একটা গ লিখে দেয়ালে ঝুলিয়েছেন। গ দিয়ে দু'লাইনের একটি ছড়া তৈরি করা হয়েছে। টুনি এবং বাবলু মাথা ঝুঁকিয়ে ছড়াটি পড়ছে।

গ তে হয় গরু

গা পা দুটি সুরু।

গা-ব শিং বাঁকা

গরু যায় ঢাকা।।

বাবলু এমনিতে কথা বার্তা একেবারেই বলে না কিন্তু ছড়া বলাতে তার একটা গাফিলতি আছে। সে টুনির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর করে ছড়া পড়ছে।

হোসেন সাহেব বললেন, এইবার লেখ। প্রথমে একটা গরুর ছবি আঁক। শিংওয়ালা গরু যে ঢাকার দিকে যাচ্ছে। এবং গরুর পাশে আঁক একটা গ। তারপর তোমাদের ছুটি।

টুনি বলল, না দাদু ছুটি না, ভুমি গল্প বলবে।

আজ আর গল্প না।

উহু। বলতে হবে। শীত-বসন্তের গল্প বলতে হবে।

না আজ আর কোনো গল্প টল হবে না।

বলতেই হবে বলতেই হবে।

গল্প বলায় হোসেন সাহেবের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। গল্প বলতে না চাওয়া হচ্ছে তাঁর দাম বাড়াবার একটা কৌশল। রোজই বেশ খানিকক্ষণ না না করেন এবং শেষ পর্যন্ত লম্বা চণ্ডা একটা গল্প শুরু করেন যেটা শেষ হতে দীর্ঘ সময় নেয়। এক সময় টুনি এবং বাবলু দু'জনের চোখই ঘুমে জড়িয়ে আসে তবু তারা জেগে থাকে।

বাবলু এ বাড়িতে মোটামুটিভাবে সুখেই আছে বলা চলে। কোনো এক বিচিত্র কারণে সফিক বাবলুকে খুবই পছন্দ করে। সে যে আগ্রহ বাবলুর ব্যাপারে দেখায় টুনির ব্যাপারে তা দেখায় না। এটা নীলুকে বেশ পীড়িত করে। এর মধ্যে রহস্য আছে কিনা কে জানে।

অফিস থেকে ফিরেই সফিক ডাকবে, বাবলু সাহেব কোথায়? বাবলু যেখানেই থাকুক গলার স্বর শুনে আসবে উদ্ধার বেগে।

তারপর বাবলু সাহেব কেমন আছেন?

ভালো।

সারাদিন কি কি করলেন?

(একগাল হাসি)

কি কিছুই করা হয়নি?

(না বোধক মাথা নাড়া)

সফিক অফিসের কাগড় ছাড়বে সে দাঁড়িয়ে থাকবে পাশে। সফিক বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে সে দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার পাশে। সফিক অফিস ফেরত চা বাবাকে বসে থাকবে। সেও থাকবে বারান্দায়।

নীলু অনেকবার ধমক দিয়েছে কি সব সময় বড়দের সঙ্গে ঘুরঘুর করা? যাও খেলে যাও।

সফিক প্রশ্নের সুরে বলেছে-আহা থাক না। বিরক্ত করছে না তো।

ছুটির দিনগুলিতে সফিক দুপুরবেলা শুয়ে থাকে। বাবলু ঠিক তখন সফিকের পাশে বসে থাকে। এবং একটা হাত তুলে দেয় সফিকের গায়ে। এতটা বাড়াবাড়ি নীলুর লাগে না। কোনো কিছু বাড়াবাড়িই ভালো না।

নীলু প্রায়ই ভাবে এই প্রসঙ্গে সফিককে সরাসরি একদিন কিছু বলবে। বলা উঠছে না। সফিক আজকাল আগের চেয়েও গম্ভীর। অফিসের কামেলা নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। অফিস সম্পর্কে সফিক কখনো কিছু বলে না কাজেই আসলে কি হচ্ছে জানা উপায় নেই। অবশ্য সে এখন ঘরে ফিরছে সকাল সকাল। টঙ্গী যাচ্ছে না। নীলুর ধারণা ছিল টঙ্গীর কাজ শেষ হয়ে গেছে বলেই যেতে হচ্ছে না। সে ধারণাও ঠিক না। টঙ্গীর কাজ শেষ হয়নি। দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে অন্য একজনকে। কেন কে জানে?

সফিক অফিসে ঢুকেই জানল খাস বিলেতি বড় কর্তা আজ অফিসে আসবেন। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় এসে ঢাকা পৌঁছেছেন। তাঁর নাম মি. টলম্যান। এই জাতীয় নাম বিলেতিদের পক্ষেই সম্ভব। বাঙালি মুসলমান কত বৎসর পর তার ছেলের নাম রাখলেন লম্বা আহমেদ? বা আনৌ এ রকম নাম রাখার মতো সাহস কি তাদের হবে?

সফিক অবাক হয়ে লক্ষ করল নতুন বড় সাহেবের আচার-আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক গবেষণা হয়ে গেছে। এবং জানা গেছে ইনি দারুণ কড়া লোক। অসম্ভব রাগ এবং অসম্ভব কাজের। মালয়েশিয়ার কোম্পানি যখন লাটে উঠার মতো হলো তখন টলম্যানকে পাঠানো হলো। এক মাসের মধ্যে সে সব ঠিকঠাক করে ফেলল।

বিলেতী সাহেব একজন আসবেন জানা ছিল। গতকালই তিনি এসে পৌঁছেছেন এই সফিকের জানা ছিল না। সিদ্দিক সাহেব জানতেন। তিনি খবরটি অন্য কাউকে জানাননি। নিজেই গিয়েছেন এয়ারপোর্টে সাহেবকে এনে প্রথম রাতে নিজের বাসা ডিনার খাইয়েছেন। সিদ্দিক সাহেবের এই ধরনের লুকোচুরির কারণ সফিকের কাছে শোনা হলো না। কানভাসানির কিছু কি আছে তাঁর মনে? সিদ্দিক সাহেব বুদ্ধিমান লোক একজন বুদ্ধিমান লোক এ ধরনের বোকামি করবে না। সিদ্দিক সাহেব এতটা কাঁচা কাজ করবেন এটা ভাবা যায় না।

সিদ্দিক সাহেব খবর নিয়ে এলেন মি. টলম্যান সাড়ে এগারোটায় সময় আসবেন। বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অফিসারদের সঙ্গে খিটিং করবেন। কারখানা দেখতে যাবেন তিনটায়। সাড়ে চারটায় যাবেন জয়দেবপুর। সিদ্দিক সাহেবকে অত্যন্ত উল্লসিত মনে হলো। সফিককে হাসতে হাসতে বললেন, জাত ব্রিটিশ তো একেবারে বাঘের বাচ্চা।

লাগে ঠাণ্ডা গলায় বলল, হালুম হালুম করছিল নাকি?

না এখনো করেনি। তবে করবে। মালয়েশিয়াতে কি কাণ্ডটা করেছে জানেন তো?

স্যাক করেছে জয়েন করবার প্রথম সপ্তাহে। ইউনিয়ন গাই ওই করছিল।

নিয়মে চাইদের ডেকে নিয়ে বলেছে—যদি কোনোরকম গোলমাল হয়, কোম্পানি বন্ধ

দিয়ে সে চলে যাবে। তাকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যে কোম্পানি লস খাচ্ছে

কোম্পানি পোষার কোনো মানে হয় না।

কোনোরকম আমেলা হয়নি?

সলিউটলি নাথিং।

এখানেও কি এরকম কিছু হবে বলে মনে করেন?

হতে পারে। আমি জানি না।

জানবেন না কেন? তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার কথাবার্তা হয়েছে। এয়ারপোর্ট

আনলেন ডিনার খাওয়ালেন।

আপনি কি অন্য কিছু ইঙ্গিত করছেন?

না আমি অন্য কিছুই ইঙ্গিত করছি না। টলম্যানের আসার খবর আপনি চেপে

এটা আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়েছে।

এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই।

না থাকলেই ভালো।

অফিসের সবাই ভেবেছিল নাম যখন টলম্যান তখন নিশ্চয়ই বেঁটেখাটো মানুষ

কিন্তু দেখা গেল মানুষটি তালগাছের মতোই, স্বভাবচরিত্রেও ভয় পাওয়ার মতো

নেই। শান্ত। কথাবার্তা বলে নিচু গলায়। মিনিটে মিনিটে রসিকতা করে। নিজের

স্বাধীনতায় নিজেই হাসে প্রাণ বুকে।

অফিসারদের সঙ্গে মিটিং চমৎকারভাবে শেষ হলো। টলম্যান বললেন, তিনি মনে

করেন এখানে চমৎকার স্টাক আছে যারা ইচ্ছা করলেই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথম শ্রেণীর

প্রতিষ্ঠানে দাঁড়া করিয়ে দিতে পারে। তিনি এসেছেন এই ব্যাপারে তাদের সাহায্য

করতে এর বেশি কিছু নয়। যারা যারা সিগারেট খায় তিনি তাদের সবাইকে নিজের

ক্যাফে থেকে সিগারেট দিলেন এবং হরতাল ও স্ট্রাইক প্রসঙ্গে বিলেতি একটি গল্প বলে

সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। গল্পটি এ রকম, লেবার পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন ক্যামব্রিজ

ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা একবার ঠিক করলেন কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে একদিনের জন্যে

স্ট্রাইক করবেন। ইতিহাসে এ রকম ব্যাপারে আর হয়নি। সবার ধারণা শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক

হবে না। পত্রপত্রিকা এ নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা, চিঠি লেখালেখি।

শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক হলো। অতুত ধরনের স্ট্রাইক। প্রফেসররা স্ট্রাইক ক্লাস নিলেন,

কর্ম করলেন শুধু সেই দিনটির বেতন নিলেন না।

গল্প শেষ করে টলম্যান বললেন, এ ধরনের স্ট্রাইক জাতিদের দেশে চালু করতে

পারলে বেশ হতো তাই না?

মিটিং শেষ করে নিজের ঘরে ফেরার পন্থে মিনিটের মধ্যে সফিক টলম্যানের

কেঁধ থেকে যে চিঠিটা পেল তার সারমর্ম হচ্ছে—তুমি দায়িত্বে থাকা কালীন এ অফিসে

নির্ধারিত অনিয়মগুলি হয়েছে। আমি মনে করি এ দায়িত্ব বহুলাংশে তোমার। এক

সপ্তাহের মধ্যে তুমি প্রতিটি অভিযোগ প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য লিখিতভাবে জমা।
তিনটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পরের পৃষ্ঠায় আছে। বেশ খুঁটিয়ে লেখ।

দুপুর দুটোর দিকে সিদ্ধিক সাহেব এসে বললেন, সফিক সাহেব আপনার।
প্রসঙ্গে আমি কিছুই জানি না আপনি বিশ্বাস করেন। এত ছোট মন আমার না।
জব্দলোকের ছেলে। এই টলম্যান ব্যাটার সঙ্গে আপনার ব্যাপারে আমার কোনো
হয়নি।

সফিক শান্ত স্বরে বলল, আপনার কথা বিশ্বাস করছি। কাগজপত্র সাহেব
অফিস থেকেই তৈরি করে এনেছে।

আমি টলম্যানকে আপনার কথা শুঁড়িয়ে বলব।

না কিছু বলার দরকার নেই।

সফিক অসময়ে বাড়ি ফিরে এলো।

কবির মামা এসেছেন। টেবিলে পা তুলে সোফায় বসে আছেন গম্ভীর হয়ে।
দেখেই মনে হচ্ছে মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। মেজাজ খারাপ হবার মতো কারণ ঘটে
ট্রেনে আসার সময় একটা ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা।
পা তুলে আরাম করে সিটে বসেছিলেন। তেজগাঁ স্টেশনে নামতে গিয়ে দেখেন
জুতো জোড়া নেই। পুরনো চটি এমন কোনো লোভনীয় বস্তু নয়। মানুষ কি দিন
অসৎ হয়ে যাচ্ছে? কোথাও যেতে হলে সারাক্ষণ নিজের জিনিসপত্র কোলের উপর
বসে থাকতে হবে? তাঁকে বাসায় আসতে হয়েছে শালি পায়ে।

সফিক কবির মামাকে দেখে সালাম করবার জন্যে এগিয়ে এল।

কি রে ভালো আছিস?

জি

মুখ এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?

মাথা ধরেছে।

অফিস থেকে চলে এসেছিস?

জি।

সামান্য মাথা ধরাতেই অফিস ছেড়ে চলে এসেছিস বলিস কি?

সফিক কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল। কবির মামা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল
তিনি অসম্ভব বিরক্ত হয়েছেন। সমগ্র জাতির ভেতরই কাজের প্রতি একটি অনীহা
গেছে।

টস্কীতে একজন টিকিট চেকার উঠল। পাঁচ ছ'জন যাত্রীর টিকিট দেখেই সে
ক্লান্ত হয়ে গেল। দু'বার হাই তুলল। কবির সাহেবের কাছে এসে এমন ভঙ্গিতে দাঁ
যেন সে একুশি ঘুমিয়ে পড়বে। তিনি পাজ্রাবির পকেটে হাত দিতেই সে বলল, থাক
লাগবে না। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, লাগবে না কেন দেখেন।

আরে না দেখতে হবে না।

দেখতে হবে না কেন? একশ' বার দেখতে হবে।

টিকিট চেকার এরকম ভাবে তাকাল যেন সে এমন অদ্ভুত কথা এর আগে শুনে
বড়ই আশ্চর্য কাণ্ড।

কবির মামা সোফায় হেলান দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন—কেন দিন দিন জাতি এমন
বড় হয়েছে। কাজে কেউ কেন আনন্দ পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না? এসব প্রশ্নের
জবাব জানেন? সমাজ বিজ্ঞানীরা? জাতি হিসেবে বাঙালি কর্মবিমুখ এটা তিনি
জানেন না। মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি দেখেছেন কি অসম্ভব ঝাটতে পারে না ঝাণ্ডা
জানতেন। তখন পেরেছে এখন কেন পারবে না? এখন কেন জোয়ান বয়সের
মিটিং চেকার তিনটা টিকিটে টিক মার্ক দিয়েই বোয়াল মাছের মতো হাই

জানাবার বললেন, গোসল করে নিন। ডাত দিয়ে দেই।

কবি অপেক্ষা করি। বৃষ্টি আসবে আসবে করছে। বৃষ্টির পানিতে গোসল করব।

কবি পানিতে করবেন কেন? ঘরে কি পানির অভাব?

কবির মামা থেকে থেকে বললেন, বয়স হয়ে যাচ্ছে, বেশি দিন বৃষ্টির পানি গায়ে

পা যাবে না তাই সুযোগ পেলেই লাগিয়ে নেই। সরিষার তেল আছে ঘরে?

আছে।

দিয়ে আসো। তেল মেখে নেই। ঠাণ্ডা লেগে গেলে মুশকিল।

জানোখাবা বসলেন পাশেই। কবির মামা বললেন, তারপর বলো, তোমার খবরাখবর

আমার কোনো খবর নাই।

খবর নাই কেন? মনে হচ্ছে সবার উপর তুমি বিরক্ত।

বিরক্ত হব না কেন? কে আমার জন্যে কি করল খুশি হবার মতো।

কে কি করল সেটা জিজ্ঞেস করবার আগে বলো তুমি অন্যদের জন্যে কি করলে?

জানোখাবা অবাক হয়ে বললেন, কি করলাম মানে। সংসার চালাচ্ছে কে?

তুমি এমন ভাব করছ যেন তুমি না থাকলে সংসার আটকে যাবে।

আটকাবে না?

না আটকাবে না। কারো জন্যই কিছু আটকে যায় না। মুশকিলটা হচ্ছে সবাই মনে

আটকে ছাড়া সংসার অচল। বৃষ্টি নামল বোধ হয়। সাবান দাও, গামছা দাও।

সব আসবে কখন?

জানি না কখন।

কোথায় গিয়েছে বললে?

জানি না কোথায়।

তুমি কি আমার উপর রেগে গেলে নাকি? রাগ হবার মতো কিছু বলিনি।

গামছা সাবান নিয়ে তিনি ছাদে চলে গেলেন। ভালো বৃষ্টি নেমেছে। ছাদে পানি

গেছে। তিনি ঝানিকঙ্কণ শিশুদের মতো সেই ছম্বে থাকা পানিতে লাফালেন। যখন

পাশে কেউ থাকে না তখন সব বয়স্ক মানুষরাই বোধ হয় পানিকটা শিশুর অভিনয়

করে ভালোবাসে।

কবির মামা গায়ে সাবান মাখতে মাখতে লক্ষ্য করলেন ঝাঁচায় দুটি কবুতর চুপচাপ

আনিসের ম্যাজিকের কবুতর। তাঁর বিরক্তির সীমা রইল না। প্রথমত ঝাঁচায়

পাখি আটকনোই একটি অপরাধ। তার চেয়ে বড় অপরাধ বন্দি পাখিগুলি ঋতু
মধ্যে ফেলে রাখা। তিনি আনিসের ঘরে উঁকি দিলেন, আনিস আহ?

আনিস ঘরেই ছিল। সে অবাক হয়ে উঠে এলো।

তোমার কবুতর বৃষ্টিতে ভিজছে। পশুপাখিকে এভাবে কষ্ট দেবার তোমার
রাইট নেই। এটা ঠিক না। অন্যায়।

আপনি বৃষ্টির মধ্যে কি করছেন মামা?

গোসল করছি? আর কি করব?

আপনি কি মামা কবুতর দু'টি ছেড়ে দিতে বলছেন।

তোমার ম্যাজিকের যদি কোনো গুরুতর ক্ষতি না হয় তাহলে ছেড়ে দাও।

আনিস হাসি মুখে বৃষ্টির মধ্যে নেমে এলো। খাঁচা খোলার পর কবুতর দু'টি
গেল না। হাদের রেলিংয়ের উপর বসে রইল। আনিস বলল, দেখলেন মামা
ভিজতে ওদের ভালোই লাগছে।

আনিস হস হস করে ওদের তাড়াতে চেষ্টা করল। ওরা গেল না। উড়ে উঠে
বার রেলিংয়েই বসতে লাগল।

কবির মামা গম্বীর গলায় বললেন-উড়তে ভুলে গেছে।

আনিস বলল-ভুলে গেলও শিখে নেবে। ওদের নিয়ে আপনি চিন্তা করণ
মামা।

তুমি ভিজছে কেন?

আনিস হেসে বলল, ভিজতে ভালোই লাগছে।

তোমার ম্যাজিক কেমন চলছে?

ভালোই।

যে শত্রুটা তৈরিই হয়েছে মানুষকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে সেটা লোকজন এত
করে কেন শিখে বলো তো আমাকে?

আপনি মামা শুধু ফাঁকিটা দেখলেন। ফাঁকির পেছনে বুদ্ধিটা দেখলেন না? আঁ
এই বৃষ্টির ফোঁটা থেকে একটা গোলাপ ফুল এনে দেই আপনার কেমন লাগবে?

বলতে বলতেই আনিস হাত বাড়িয়ে একটি গোলাপ তৈরি করল। কবির
স্তুতি হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কেমন লাগল মামা?

চমৎকার।

শুধু চমৎকার?

অপূর্ব! আমি মুগ্ধ হলাম আনিস।

আপনার কি মামা মনে হয় না যে সত্যিকার ফাঁকিগুলি ভুলে থাকার জন্যে এ
কিছু ফাঁকির দরকার আছে?

তুমি খুব শুছিয়ে কথা বলতে শিখেছ।

আনিস হাসতে লাগল। কবির মামা বললেন, তোমাকে আমি নীলগঞ্জ নিয়ে
গ্রামের লোকজনদের তুমি তোমার খেলা দেখাবে।

দেখাও দেবাব। আপনি যখন বলবেন তখনি যাব। অনেকখণ ধরে ভিজছেন। নিচে
চালা আগে যাবে। ফুলটা নিয়ে যান মামা।
ফুল গোলাপ হাতে নিচে নেমে এলেন।
চালা বেলা তাঁর জ্বর এসে গেল। রফিককে যেতে হলো ডাক্তারের খোজে।
চালা গোলাপ টিপে দিতে বসল।

শাহানা শাড়ি পরেছে। মনোয়ারা কামিজ পরার উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি
করল। দু'দিন পর বিয়ে হচ্ছে যে মেয়ের সে ত্রুটি পরে খেই খেই করবে কেন?

শাহানা শাহানাকে অপূর্ব লাগছে। ঘরে আলো কম। কবির মামার চোখে আলো
কম। এমনি বাতি নেভানো। খোলা দরজা দিয়ে সামান্য কিছু আলো এসে পড়েছে
শাহানা মুখে। কি সুন্দর লাগছে তাকে। যেন একজন কিশোরী দেবী।

শাহানা বলল, এখন কি একটু ভালো লাগছে মামা?
লাগছে। তোর বিয়ের ব্যাপার কতদূর কি হলো?
জানি না।

শাহানা এটা ঝুলিয়ে রেখেছে কেন বুঝলাম না। এসব তো ঝুলিয়ে রাখার জিনিস

১৮

শাহানা কিছু বলল না। কবির মামা বললেন, ছেলেটিকে পছন্দ হয়েছে তো?

শাহানা জবাব দিল না। খুব লজ্জা পেয়ে গেল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, লজ্জা
কেন? একজন মানুষকে পছন্দ হয়েছে কি পছন্দ হয়নি এটা বলার মধ্যে লজ্জার কিছু
কি।

পছন্দ হয়েছে।

ভালো। যে কথাটা মনে আসে সে কথাটা মুখেও আসতে পারে। এবং আসাই

১৯। তোর বরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ভালো ছেলে। সব সময় হাসছে।

সব সময় হাসলেই বুঝি ভালো ছেলে হয়?

হ্যাঁ হয়। কুটিল মনের মানুষ সব সময় হাসতে পারে না। গম্ভীর হয়ে থাকে।

তুমিও তো সব সময় গম্ভীর হয়ে থাকো। তুমি কি কুটিল মনের মানুষ।

গম্ভীর হয়ে থাকি আমি?

হ্যাঁ।

কখনো হাসি না?

না।

কবির মামাকে দেখে মনে হলো তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শাহানা
গাশে তরু করল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করল হাসির বেগ সামলানোর জন্যে সেটা সম্ভব হলো
না। সে ছুটে গেল বারান্দায়। বারান্দায় কিনির কণ্ঠের হাসি দীর্ঘ সময় ধরে শোনা গেল।
২০। যোগ দিল সেই হাসিতে, তারপর বাবলু। পিতরা যাবতীয় সুখের ব্যাপারে অংশ
২১। চায়।



আগামীকাল শারমিনের গায়ে হলুদ।

শারমিন আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছে। আয়নায় নিজেই যাচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছিল বিয়ের ঠিক আগে আগে সব মেয়েই অচেনা হয়ে তাদের চোখ হয় আরো কালো। চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঠাণ্ডা আসে। বিয়ে হবে মেয়েরা বার বার আয়নার নিজেদের দেখে কথাটা আংশিক সত্যি। শ আয়নায় নিজেকে চিনতে পারছে না তবে আয়নার সামনে বসে থাকতে ভালো। না।

জমিলার মা এসে বলল, আপনাকে ডাকে।

কে ডাকে?

বড় সাহেব।

বল আসছি।

শারমিন নড়ল না। যে ভাবে বসেছিল ঠিক সে ভাবেই বসে রইল। বাড়ি মানুষ। কিছুক্ষণ আগেই দুটি মেয়ে বারান্দায় ছুটাছুটি করছিল। শারমিন শেষ বলতে বাধ্য হয়েছে—তোমরা নিচে যাও কিংবা ছাদে যাও আমার মাথা ধরেছে। উপর রাগ লাগছে খানিকটা এক মাস আগে থেকে লোকজন দিয়ে বাড়ি ভর্তি কোনো দরকার ছিল না। এবং এদের কাণ্ড জ্ঞানও নেই এত দিন আগে কেউ অন্যের বাড়ি?

আফা।

শারমিন বিরক্ত মুখে তাকাল। জমিলার মা আবার এসেছে। তার মুখ হাসি ছাড়া টোট লাল টুকটুক করছে। গায়ের লাল পেড়ে সাদা শাড়িটিও নতুন। বিয়ে উপর সবাই নতুন শাড়ি পেয়েছে। দুটি করে শাড়ি। একটি সাধারণ লাল পেড়ে সাদা অন্যটি দামি শাড়ি।

আফা, আপনাকে ডাকে।

বলছিতো যাব।

বড় সাব চা লইয়া বইস্যা আছে।

শারমিন উঠে দাঁড়াল। এমন বিরক্ত লাগছে। শুধু বিরক্তি নয় মাথাও ধরেছে। বাথা। চারটা প্যারাসিটামল খাওয়া হয়েছে ছ'ঘণ্টার মধ্যে। খবুনা ভোঁতা হয়ে এটা কিন্তু তবু মাঝে মাঝে চিলিক দিয়ে উঠছে।

রহমান সাহেব চায়ের পট নিয়ে হাসিমুখে এসে আছেন। শারমিনকে দেখে অ হয়ে বললেন, এমন একটা সাধারণ শাড়ি পরে ঘুরছ কেন মা? শারমিন জবাব দিল

মাথা নাও।

হাতে পেতে হচ্ছে করছে না।

হাতা না করলেও খাও। বাবাকে কোম্পানি দাও। এখন তো আর আগের মতো
কামান্ড পাও না।

পাও। সব সময়ই পাবে। আমি সব সময় তোমার মেয়েই থাকব বাবা।

হাতে বলতে শারমিনের গলা ভারি হয়ে এলো। রহমান সাহেব দেখলেন শারমিন
কান্নাকাতি। তিনি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বাবার কাছে মেয়ের বিয়ে কোনো আনন্দের
কারণ নয়। বিয়ের দিনটি হচ্ছে বাবা-মা'র জীবনের গভীরতম বিষাদের দিন। এই
বিষাদে ভুলবার জন্যেই আনন্দ ও উল্লাসের একটা ভান করা হয়। রহমান সাহেব গাড়ী
থেকে এলেন, মামণি চা খাও।

শারমিন পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেই টুপ করে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল
কাপে। রহমান সাহেব দৃশ্যটি দেখলেন। তাঁর নিজেরো ইচ্ছা করল ছুটে কোথাও পালিয়ে
খাও। মানুষের বেশির ভাগ ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে। ছুটে যেতে ইচ্ছা করলেও ছুটে যাওয়া
পাও না। তাকে বসে থাকতে হবে এখানেই।

শারমিন।

বল বাবা।

তোমাকে না জানিয়ে একটা কাজ করেছি মা।

শারমিন তাকাল।

পুলিশের ব্যাণ্ড পার্টি আনিয়েছি। গ্রাম থেকে অনেকেই এসেছে ওরা খুশি হবে।
ব্যাণ্ড পার্টির অনেক কায়দা কানুন আছে তো। একজন ব্যাণ্ড মাস্টার থাকে সে ক্লো
ক্লো নাটি নাড়াচাড়া করে। আমার নিজেরই দেখতে এমন চমৎকার লাগে।

রহমান সাহেবে হাসলেন। হাসল শারমিনও।

ওরা কখন আসবে?

আজ বিকেলে আসবে। আবার কালও আসবে। কেমন হবে বলো তো মা?

ভালোই হবে।

মোতাসের সাহেব বলছিলেন ব্যাণ্ড না এনে সানাইয়ের ব্যবস্থা করতে। একটা
শেজের মতো থাকবে সেখানে বসে বসে সানাই বাজাবে। কাউকে সে রকম পাওয়া গেল
না। তা ছাড়া সানাই বড় মন খারাপ করিয়ে দেয়। মেয়ে বিয়ে এম্মিতেই বাবা মা'র জন্যে
গাশেট মন খারাপ করার মতো ব্যাপার, সেটা কে আর বাড়ানো ঠিক না, কি বলো মা?

শারমিন জবাব দিল না। রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। কয়েকদিন ধরেই তিনি
শুধু সিগারেট খাচ্ছেন। প্রায় চেইন স্মোকার হয়ে গেছেন।

শারমিন বলল, আমি এখন উঠি বাবা?

এখনই উঠবে কি বস একটু।

ভালো লাগছে না বাবা। জ্বর জ্বর লাগছে।

তিনি মেয়ের হাত ধরলেন। জ্বর নেই গা ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

শারমিন!

কি বাবা?

তিনি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, একটা কথার ঠিক জবাব দাওতো ঃ
তাকাও আমার চোখের দিকে। রহমান সাহেব খেমে খেমে বললেন, সাক্ষিরকে '
তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

পছন্দ হবে না কেন? তাঁকে পছন্দ না করার মতো তো কিছু নেই।

আমিও তাই বলি। জমিলার মা বলল তুমি গতকাল সারারাত ঘুমুওনি। বারান্দা
হাঁটাহাঁটি করছিলে।

ঘুম আসতে একটু দেরি হয়েছে। যা গরম।

আমাকে ডাকলে না কেন?

তোমাকে ডাকলে কি হতো?

দু'জনে মিলে গল্প করতাম।

আজ যদি ঘুম না আসে তোমাকে ডাকব। বাবা, এখন যাই?

আচ্ছা যাও। জমিলার মা বললেন ছেলেপুলেরা নাকি তোমাকে খুব বিরক্ত করেছে
বারান্দায় ছুটাছুটি করছে।

না তেমন কিছু না।

শারমিন নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে গুয়ে রইল। এবং এক সময় ঘুমিয়ে
পড়ল। জমিলার মা তাকে জাগাল না। দুপুরে খাবার সময় রহমান সাহেব বললেন ও
ঘুম ভাঙানোর দরকার নেই ঘুমুক।

পুলিশের ব্যান্ড পার্টি চলে এলো তিনটায়। শারমিনের ঘুম ভাঙল ব্যান্ডের শব্দে।
তারা বাজাস্থে আনন্দের গান, উৎসবের গান। কিন্তু তবু কেন বার বার চোখ ভিজে
উঠছে? কেন বার বার মনে হচ্ছে চারশাশ অসম্ভব ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। কেন এত
কষ্ট হচ্ছে?

দরজায় টুক টুক আওয়াজ হলো। শারমিন ক্লান্ত গলায় বলল, কে?

আফা আমি।

কি চাও?

আপনার সাথে দেখা করতে আইছে।

কে?

ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, রফিক সাব।

শারমিন চুপ করে রইল। তার একবার ইচ্ছা হলো বলে-ওকে চলে যেতে বলো।
কিন্তু সে কিছুই বলল না। জমিলার মা দ্বিতীয়বার ডাকল- ও আফা, আফা। শারমিন
তারও জবাব দিল না। কিন্তু জমিলার মা নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও নিচে নেমে এলো।

ব্যান্ড পার্টির চারদিকে সবাই ভীড় করে আছে। রহমান সাহেবও এতক্ষণ ছিলেন।
একটু আগেই গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন। বলে গেছেন শারমিন ঘুম থেকে উঠেই যেন
কাপড় পরে তৈরি থাকে। সন্ধ্যার পর তাকে নিয়ে বেরবো।

রফিক ব্যান্ড পার্টির বাজনা শুনে খুব উৎসাহ দিয়ে। তার মুখ হাসি হাসি।
শারমিনকে আসতে দেখে সে এগিয়ে গেল।

শারমিন বলো তো কি গান বাজছে?

জানি না।

কাম সেন্টেশ্বর। আমার খুব প্রিয় গান।

৩৩ নাকি?

১। দারুণ মিউজিক। তোমার ভালো লাগছে না?

লাগছে।

২। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলো। আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম।

কি পরিচয় দিলে?

শিখের তো কোনো পরিচয় নেই। তোমার পরিচয়েই পরিচয় দিলাম, বললাম আমি

শারমিন হয়ে শারমিনের সঙ্গে পড়তাম।

শারমিন তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রফিক হাসতে হাসতে বলল, একবার

বললাম বলি আমি শারমিনের বন্ধু।

বললে না কেন?

সাহস হলো না। যদি রেগে যান। উৎসবের দিনে তোমাকে এমন পেল্লীর মতো

কেনে?

পেল্লীর মতো লাগছে?

চুপে চিরুনি পড়েনি। চোখ লাল এবং বেছে বেছে সবচে' ময়লা শাড়িটাই আজ

৩। আল্লা তোমার কি একটাও ভালো শাড়ি নেই?

শারমিন বলল, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শোনো। আমি একুণি আসছি। কাপড়

৪। আসছি। তোমার হাতে কি কোনো কাজ আছে?

না। কেন?

তোমাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়।

কোথায়?

এনছি, বসো তুমি। চা খাবে?

হ্যাঁ বাব। চায়ের সঙ্গে আর কিছু আছে?

দেখি আছে কিনা।

খাল কিছু। নো সুইটস।

শারমিন অতি দ্রুত কাপড় বদলাল। পাতলা একটা চেইন পরল গলার। হালকা নীল

৫। একটা শাড়ি পরল। একটা হ্যান্ড ব্যাগ নিল হাতে।

জমিলার মা বলল, যান কই আফা?

একটা কাজে যাচ্ছি। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো। ইয়াসিন আছে না?

জি আছে।

কোন সময় আইবেন আফা?

শারমিন তার জবাব দিল না। নেমে এলো নিচে। তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। যেন

৬। বড় ধরনের কোনো একটা অসুখ থেকে সে উঠেছে। রফিকের মনে হলো শারমিন

৭। ঠিকমত হাঁটতেও পারছে না।

শারমিন তুমি কি অসুস্থ?

না, আমার শরীর ভালোই আছে। চলো তুমি।

চা খাইনি তো এখনো, চা আসেনি।

চা পরে খাবে।

রফিক অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ব্যাড গার্ল
দলটিকে ঘিরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা হৈ চৈ করছে। ওদের আনন্দের কোনো
পরিসীমা নেই। ইলেকট্রিসিয়ানরা ব্যস্ত আলোকসজ্জা নিয়ে। আলোকসজ্জা শুধু
অজ্ঞ সন্ধ্যা থেকে।

গাড়ি পুরনো ঢাকা ছাড়িয়ে আসার পর পরই রফিক লক্ষ করল শারমিন কাঁদছে।
অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা। কোথায় তারা যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কে জানে। ড্রাইভার নিজে
বেশ কয়েকবার তাকাল পেছনের দিকে। রফিকের সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা কিন্তু
জানি ধরাতেও সাহস হচ্ছে না।

রফিক।

বলো।

কটা বাজে দেখো তো?

চারটা দশ। কোথায় যাচ্ছি আমরা?

শারমিন শান্ত স্বরে বলল, আমি এখন তোমাকে কয়েকটা কথা বলব তুমি শুধু শুধু
যাবে কোনো প্রশ্ন করবে না। ড্রাইভার সাহেব।

জি আপা।

আপনি গাড়ি একটু আস্তে চালান।

জি আচ্ছা।

কথাবার্তা যা শুনবেন নিজের মধ্যে রাখবেন।

জি আচ্ছা।

শারমিন ছোট একটি নিশ্বাস ফেলল। রফিক অপেক্ষা করতে লাগল।

রফিক।

বলো শুনছি।

তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?

রফিক কোনো জবাব দিতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। শারমিন নি
গলায় বলল, আমি খুব বড় ধরনের বনফিউশনে ভুগছি। কি করব কিছু বুঝতে পারা
না।

বনফিউশন হবার কারণ কি?

কারণ কি তুমি ভালো করেই জানো। কেন তুমি বার বার এসেছ আমার কাছে?

বলতে বলতে শারমিন ফুঁপিয়ে উঠল।

সাক্ষির ভাইকে বিয়ে করতে আমি রাজি না এই কথাটা আমি কিছুতেই বাবাকে
বলতে পারব না। আমি আমার বাবাকে যে কি পরিমাণ ভালোবাসি তা একমাত্র আমিই
জানি। অন্য কেউ জানে না।

রাফিক সিগারেটের জন্যে প্যাস্কাবির পকেটে হাত দিল। সিগারেট নেই। হাত পড়ল নল টাকার একটি ময়লা নোটে, এই টাকাটাই তার সম্বল।

শারমিন মৃদু স্বরে বলল-আমাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে যাবার সাহস কি তোমার আছে?

রাফিক শান্ত স্বরে বলল, তোমার বাবাকে গিয়ে সব কিছু খুলে বললে কেমন হয়?
তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তোমাকে বলতে হবে না। আমি বলব।

না।

শারমিন শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে বসে রইল। রাফিক বলল, ড্রাইভার সাহেব, আমাদের কাছে সিগারেট আছে? ড্রাইভার সিগারেট দিল। নিচু গলায় বলল, এখন কোমরদিকে যাইবেন? রাফিক বলল, খুব স্পিডে একটু ঘুরে বেড়ান আমার মাথাটা ঠাণ্ডা হোক। কোথায় যাব এখনো জানি না।

রাফিক আড়চোখে তাকাল শারমিনের দিকে। সে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে বসে আছে চুপচাপ। রাফিকের ইচ্ছা করল আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে, এই মেয়েটিকে শাখারীর কেউ আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। এ একান্তই আমার।



মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন, রাফিক একে বিয়ে করেছে? তুমি এসব কি বলছ বৌমা? নীলু মনোয়ারার হাত ধরল।

মা আপনি আমার সঙ্গে আসুন আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি। আসুন আমার সঙ্গে।

আমাকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি সবই বুঝতে পারছি। রাফিক কোথায়?

ও একটু বাইরে গেছে। আসবে। মা আপনি একটু আসুন আমার সঙ্গে।

তুমি বৌমা আমার হাত ধরে টানাটানি করবে না। আমি এই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব।

শারমিন ভেজা চোখে তাকাল মনোয়ারার দিকে। হোসেন সাহেব বললেন, কথা বলার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? এই মেয়ে তো আর চলে যাবে না। তুমিও যাও বৌমার সঙ্গে।

মনোয়ারা কড়া চোখে তাকালেন। হোসেন সাহেব খতমত খেয়ে খেয়ে গেলেন। মনোয়ারা কড়া গলায় বললেন, বৌমা তুমি সবাইকে নিয়ে এ ঘর থেকে যাও, আমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব। একা কথা বলব।

নীলু সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হোসেন সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, —
ঝামেলা হয়ে গেল তো বৌমা। সফিক এসেছে?

জি না।

বাজে কটা?

আটটা।

কাণ্টা রফিক কি করল?

বাবা আপনি টুনী আর বাবলুকে নিয়ে বসেন।

হ্যাঁ বসছি। তুমি যাও তোমার শাওড়ির কাছে গিয়ে দেখো কিছু করা যায় কিনা —
মেয়েটার জন্য বড় মায়া লাগছে।

হোসেন সাহেব টুনী এবং বাবলুকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। শাহানা শুকলে
মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিসফিস করে বলল, কি হবে ভাবী?

কিছুই হবে না। হবে আবার কি?

মা যে কি করছেন। তুমি লক্ষ করেছ ভাবী, মা রাগে কাঁপছিলেন। রফিক ভাবী
আবার কোথায় গেল?

কি জানি কোথায়?

শাহানা চাপা গলায় বলল, আমার এমন রাগ লাগছে ভাইয়ার উপর। কান্দতে ইচ্ছা
হচ্ছে। শাহানা সত্যি সত্যি কঁদে ফেলল।

মনোয়ারা কড়া গলায় বললেন, তুমি বসো এখানে।

শারমিন বসল। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

তুমি আমাকে বলো তুমি কেমন মেয়ে? বাবা-মাকে কিছুই না বলে বিয়ে করে
ফেললে?

শারমিন নিশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল। পারল না।

চাকরি নেই কিছু নেই এমন একজন অপদার্থকে বিয়ে করে ফেললে। যার নিজের
খাকার জায়গা নেই। তুমি তার মতোই অন্যের ঘাড়ে বসে থাকবে। চক্ষু লজ্জাও তোমার
নেই।

নীলু এসে মনোয়ারাকে প্রায় টেনে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। শারমিন
শুকনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে দিকে। তার মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। চারদিকে কি
ঘটছে না ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না। পরিচিত কেউ নেই যে এসে তার পাশে
দাঁড়াবে। আশা ও সান্ত্বনার কিছু বলবে। জীবন এত কঠিন কেন?

চমৎকার একটি চাঁদ উঠেছে আকাশে। সফিক বারান্দায় বসে সিগারেট টানছে।
নাটকীয় এই সংবাদ সে শুনেছে। সে কোনো কথা বলেনি। রাতে নীলু যখন তাকে খাবার
জন্মে ডাকল সে বলল, আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না নীলু।

শারমিনও কিছু খায়নি। সে রফিকের ঘরে মাথা নিচু করে বসে আছে। রফিক তাকে

শাশু-শশুর চেষ্টা করেছে কোনো কাজ হয়নি। সে একটিও কথা বলেনি। রফিক বলল, আমার জীবনটা শুষ্ক হলো খুব খারাপভাবে। তাই না? শারমিন জবাব দিল না।

তবু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। শারমিন।

গলো।

পূর্ণ সুন্দর জোছনা হয়েছে বাইরে। চলো না একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি।

কি মিথ্যাও। আমার ইচ্ছা করছে না।

শারমিন প্রিজ।

রফিক, আমাকে বিরক্ত করবে না।

এত সুন্দর একটা রাত নষ্ট করব?

শারমিন জবাব দিল না। কিন্তু উঠল। রফিক ছুটে গেল নীলুর কাছে। তার খুব শখ নীলিকে দিয়ে একটা গান যদি গাওয়াতে পারে। অনেকদিন আগে এরকম এক জোছনা গাতে তারা সবাই মিলে ছাদে হাঁটছিল। হঠাৎ কি মনে করে ভাবী গুনগুন করে গোয়েছিল-চাঁদের হাসির দাঁধ ভেঙ্গেছে। ভাবীকে চেপে ধরলে সেকি তাদের নতুন জীবনকে সুস্থ করবার জন্যে একটা গান গাইবে না। ভাবীর পক্ষে কি এতটা নির্দয় হওয়া সম্ভব?

জোছনার ফিনিক ফুটেছে চারদিকে। আকাশ ভেঙে পড়ছে আলোয়। কি উপাল পাখাল জোছনা। ছাদে একটা পাটি পাতা হয়েছে। শারমিন মাথা নিচু করে বসে আছে পাটিতে। শাহানা টি-পট ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। নীলু মৃদু স্বরে বলল, মন খারাপ করো না শারমিন। দেখ কি সুন্দর একটা রাত। এমন চমৎকার জোছনা কখনো দেখেছ?

শারমিন কোন জবাব দিল না।

তাদের অবাক করে দিয়ে নীলু গুনগুন করে উঠল, আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে গলে। তার গলা তেমন কিছু আহামরি নয়।

কিন্তু তবু কি অপূর্বই না শুনাল সেই গান।

অবাক হয়ে চিলেকোঠার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আনিস।

হোসেন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, কে গাইছে? আমাদের বড় বৌমা? বড় মিঠা গলা তো আমার মা'র।

গাইতে গাইতে নীলু শাড়ির আঁচলে তার চোখ মুছল। শারমিনের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। তার মন বলছে আজকের এই চোখের জল জীবনের সমস্ত দুঃখ ও বেদনা ধুয়ে মুছে যাবে। সে হাত বাড়িয়ে রফিককে স্পর্শ করল। ভালোবাসার স্পর্শ, যার জন্যে প্রতিটি পুরুষ হৃদয় তৃপ্ত হয়ে থাকে। রফিক তার হাত আকাশের দিকে। আহা কি চমৎকার জোছনা! এত সুন্দর কেন পৃথিবীটা?



আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে।

হোসেন সাহেবের কাছে এক রুগী এসে উপস্থিত। সাফারি গায়ে লম্বা-চওড়া একজন মানুষ। দরজা খুলতেই জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার সাহেব কি আছেন? হোসেন সাহেব নিজেই দরজা খুলেছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কোন ডাক্তার?

ড. হোসেন, হোমিওপ্যাথ।

হোসেন সাহেবের বিশ্বয়ের সীমা রইল না। কয়েক মিনিট বুঝতেই পারলেন না, কি করবেন কি বলবেন। শেষ পর্যন্ত রুগী এসে পড়েছে। রুগীদের সঙ্গে ডাক্তাররা কি ভাষা বলে কে জানে। খুব বেশি খাতির করতে নেই বোধ হয়। তাতে রুগী মনে করলে পারে ডাক্তারটা কিছু জানে না। আবার খুব গম্ভীর হয়ে থাকলে পরের বার আসবে না।

জ্বি ভাই। আমিই ড. হোসেন বসুন, আরাম করে বসুন। চায়ের কথা বলে আসি। না, না চা লাগবে না।

লাগবে। অবশ্যই লাগবে।

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তিনি চায়ের কথা বলতে গেলেন। ফিরে এলেন হোমিওপ্যাথিক বাল্ব নিয়ে। স্টেবিসকোপ একটা কেনা দরকার। থার্মোমিটারটা নষ্ট। টুনী ভেঙেছে। এইসব যন্ত্রপাতি এখন দরকার। প্রেসার মাপার ঐ জিনিষও কিনতে হবে।

অসুখটা কি ভাই বলুন?

আমার কিছু না। আমার স্ত্রীর গলায় মাছের কাঁটা বিধেছে। সে বলল হোমিওপ্যাথিতে নাকি এর অষুধ আছে। আপনার সাইন বোর্ড দেখলাম। ভাবলাম.....

ভালো করেছেন, খুব ভালো করেছেন। এক্ষুনি অষুধ দিয়ে দিচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই। মাছের কাঁটা পালাবার পথ পাবে না। কি মাছ?

কৈ মাছ।

ও আচ্ছা কৈ মাছ। ছোট কৈ না বড় কৈ?

ভদ্রলোক বিম্বিত হয়ে বললেন, এসবও কি অষুধ দিতে লাগে?

হ্যাঁ লাগে। হোমিওপ্যাথি খুবই জটিল চিকিৎসা। মনে হয় সোজা। সোজা মোটেই না।

ভদ্রলোক অষুধ নিয়ে যাবার সময় অষুধের দাম এবং ভিক্সট বাবদ দু'টি চকচকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে গেলেন। বিশ্বয়ের উপর বিশ্বয় হোসেন সাহেব হড়বড় করে বললেন, গলার কাঁটাটা গেল কি না একটু খবর দিয়ে যাবেন। না গেলে কড়া ডোজের আরেকটা অষুধ দেব।

হোসেন সাহেব লক্ষ করলেন জীবনের প্রথম বেতন পেয়ে যেমন আনন্দ হয়েছিল

কাজে চেয়েও অনেক বেশি আনন্দ হচ্ছে। চোঁচিয়ে সবাইকে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু
কোনো বোমা বাসায় কেউ নেই। বড় বৌমা অফিসে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। শাহানা
কোন বান্ধবীর বাড়ি। ছোট বৌমা এবং রফিকও নেই। হোসেন সাহেব নোট
নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

খোয়ায়ারার মেজাজ আজ অন্য দিনের চেয়েও খারাপ। দাঁতের ব্যথা শুরু হয়েছে।
কাজে গিয়ে জেনেছেন ঘরে লবণ নেই। রহিমার মা'কে লবণ আনতে পাঠিয়ে তিনি
সঙ্গে বসে আছেন। হোসেন সাহেবকে ঢুকতে দেখে চট করে জুলে উঠলেন।

এখানে কি চাও?

না কিছু চাই না।

নাও রান্নাঘর থেকে যাও। পুরুষ মানুষকে রান্নাঘরে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত
পায়।

হোসেন সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, মাথায় রক্ত তো তোমার উঠেই আছে নতুন
আর কি উঠবে। বলেই তিনি অপেক্ষা করলেন না অত্যন্ত দ্রুত বসার ঘরে চলে
গেলেন। এরকম একটা সুসংবাদ কাউকে দিতে না পারার কষ্ট তাঁর মন খারাপ হয়ে
গেল। অবশিষ্ট বাড়িওয়ালার বাসা থেকে বৌমার অফিসে টেলিফোন করা যায়। সেটাই
হয় সবচেয়ে নিরাপদ।

নীল মেয়েটি বড় ভালো। দেখতে পেয়েই বলল, টেলিফোন করতে এসেছেন তাই
না চাচা?

হ্যাঁ, কি করে বুঝলে?

আপনি যখন লজ্জা লজ্জা মুখে আসেন তখনই বুঝতে পারি।

নীল হাসতে লাগল। হোসেন সাহেব গলা নিচু করে বললেন, আমার এখন একটা
টেলিফোন নিতে হবে। রুগী টুগী আসছে। ওরা খোঁজ খবর করে।

কিসের রুগী?

হোসেন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, হোমিওপ্যাথি করছি তো। জানো না তুমি?
সাইন বোর্ড দেখনি—এম. হোসেন। গলিটায় ঢুকতেই সাইন বোর্ড। নারকেল গাছে
লাগানো।

টেলিফোনে নীলকে পাওয়া গেল। নীল উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, কোনো খারাপ খবর নাকি
খাণ্ডা?

না, না খবর সব ভালো। এম্মি টেলিফোন করলাম। তুমি ভালো তো মা?

জিঁ ভালো।

কাজের চাপ খুব বেশি নাকি?

না খুব বেশি না।

আসার পথে একটা থার্মোমিটার নিয়ে এসো তো। থার্মোমিটার ছাড়া বড্ড অসুবিধা
হচ্ছে। রুগী পত্র আসতে শুরু করেছে। আজ একজন এসে কুড়ি টাকা ডিজিট দিল।

কুড়ি টাকা ডিজিট, বলেন কি বাবা।

না মানে কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিল আমি দশ টাকা রাখলাম। এরচে' বেশি রাখলে
শুধুম হয়ে যায়, কি বলো মা?

হ্যাঁ, তা তো হয়ই।

ডাক্তার হয়েছি বলে তো আর রুগীর চামড়া খুলে নিতে পারি না। কি বলো জি তাতো ঠিকই।

আর শোনো মা, ঐ সাইন বোর্ডটা বদলে একটা বড় সাইনবোর্ড করাতে হবে। ছোট, অনেকের চোখে পড়ে না। বীণা তো দেখেই নাই।

হ্যাঁ, তাতো করাতেই হবে।

হোসেন সাহেব প্রায় পনেরো মিনিট কথা বললেন। বীণা এর মধ্যে চা এবং মাখনো টোস্ট বিসকিট নিয়ে এসেছে। চা খেতে খেতে বীণার সঙ্গেও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথা বললেন। হোমিওপ্যাথি জিনিসটা যে অসম্ভব জটিল সেটা জলের বুঝিয়ে দিলেন। পাওয়ার ২০ এবং পাওয়ার ২০০ এর পার্থক্যটা কি তাও বললেন। আজ বড় আনন্দ হচ্ছে। এই আনন্দ পৃথিবীর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলে হত। তা করা যাচ্ছে না। হাতের কাছে যে ক'জনকে পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকেই আপাতত বলা যাক।

তিনি সারা দুপুর ভাবলেন প্রথম রোজগারের টাকাটা দিয়ে কি করবেন। সবাইকে একটা কিছু কিনে দিতে পারলে ভালো হত। সেটা বোধ হয় সম্ভব নয় তবু বিকেল একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে দেখা যেতে পারে। তিনি সাধারণত দুপুরে খানিকটা ঘুমাতে। আজ মানসিক উত্তেজনায় ঘুমাতেও পারলেন না। শুয়ে শুয়ে বিকাল পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি বইয়ে লক্ষণ বিচার চ্যাপ্টারটা দু'বার পড়লেন। সন্ধ্যাবেলা নিউ মার্কেট থেকে সব জিনিস একটা করে কাঠ পেনসিল কিনে আনলেন।

মনোয়ারা ভিত্তি গলায় বললেন, পেনসিল দিয়ে আমি কি করব?

লিখবে। আর কি করবে?

লেখালেখির কোন কাজটা আমি করি?

বেশতো লিখতে না চাও কান চুলকাবে।

মনোয়ারা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন ঠিক তাঁর মতো একটি পেনসিল রহিমার মা' পেয়েছে। সে বটিতে তার পেনসিলটা চাঁচতো চেঁচা করছে।

হোসেন সাহেব অনেক রাত পর্যন্ত বসার ঘরে বসে রইলেন। ঐ ভদ্রলোক যদি খবর দিতে আসেন। সেটা শোনা দরকার। অশুধ দিয়েই কর্তব্য শেষ এরকম ডাক্তার তিনি হতে চান না।

শাহানা একমনে কি একটা বই পড়ছে। এত মনোযোগ দিয়ে যখন পড়ছে নিশ্চয়ই গল্পের বই। মাঝে মাঝে আবার চোখ মুছছে। চোখ মুছার দৃশ্যগুলি দেখতে হোসেন সাহেবের বড় ভালো লাগছে। এত সুন্দর হয়েছে মেয়েটা। মনেই হয় শীতের মেয়ে, যেন অচিন দেশের কোনো এক রাজকন্যা পথ ভুলে এ বাড়িতে এসে পড়েছে। টাসাইলের সাধারণ একটি সূতি শাড়ি পরে বসে আছে তাঁর সামনে। আবার যেন কিছুক্ষণ পরই চলে যাবে।

ও শাহানা।

কি বাবা।

এত মন দিয়ে কি পড়ছিস? গল্পের বই?

৬।

নত পড়তে পড়তে কেউ এত কাঁদে? গল্পটা কি রে?

শাহানা বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, একটা মেয়ে একই সঙ্গে দু'টি ছেলেকে
হোসেন সাহেব যখন কাঁদে যায় তাকেই ভালো লাগে। এই নিয়ে গল্প।

হোসেন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, একি অসম্ভব কথা। একই সঙ্গে দু'টি ছেলেকে
কখনও বলে কি ভাবে। আজ্ঞেবাজে একটা কিছু লিখলেই হলো?

শাহানা কপাল কুঁচকে বলল, বিরক্ত করো না তো বাবা, পড়ছি দেখছ না।

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন।

দেয়াল ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা পড়ল তার মানে এখন বাজছে এগারোটা। ঘড়িতে
একটা ঘণ্টা কম পড়ে। রাত যখন ১টা হয় তখন আবার ঘণ্টা পড়ে বারোটা।

পামাকা বসে আছ কেন বাবা শুয়ে পড় না।

এসি খানিকক্ষণ। তাকে তো বিরক্ত করছি না।

কতক্ষণ বসে থাকবে?

তোর পড়া শেষ হোক তারপর যাব।

আমি তো বাবা বই শেষ না করে উঠব না।

না উঠলে না উঠবি আমি কি উঠতে বলছি?

এইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এবার বর্ষা অনেক দেরিতে শুরু
হলো আজ আষাঢ়ের মাঝামাঝি, বর্ষণ হচ্ছে এই প্রথম।

শাহানা।

কি?

তোর বিয়ে যেন কবে বিশে আষাঢ় না একুশে?

জানি না বাবা।

সে কি নিজের বিয়ের তারিখ নিজে জানিস না?

তুমিও তো নিজের মেয়ের বিয়ের তারিখ জানো না আর একটি কথাও বলবে না
শাহানা প্রিজ।

আজ্ঞা বলব না, কত পাতা বাকি?

এই তো আবার কথা বলছ।

আর বলব না। জানালাটা বন্ধ করে দে বৃষ্টির ছাট আসছে।

তুমি বন্ধ করে দাও না কেন? তুমি তো আর কিছু করছ না। বসেই আছ।

হোসেন সাহেব উঠে জানালা বন্ধ করলেন। ইঠাৎ তাঁর মনে হলো সোফায় পিঠ
দিয়ে বসে থাকা এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটি একদিন বুড়ি হয়ে যাবে। চুলে পাক
দাবে। চোখের কালো রঙ হবে ঘোলাটে। কি প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা। তবু মনটা অসম্ভব খারাপ
হয়ে গেল। তিনি দেখলেন শাহানা আবার চোখ মুছেছে।

ও শাহানা!

কি।

শব্দ করে পড় না। আমিও শুনি কি লিখেছে।

তোমার ভালো লাগবে না বাবা। এটা আমাদের গল্প। তোমাদের না।

ঠিক ঠিক খুব ঠিক। সময় আলাদা করে রেখেছে তাদের দু'জনকে। চেঁচা হয়তো একে-অনাকে ছুঁতে পারবে না। ঢালা বর্ষণ হচ্ছে বাইরে। ক্ষণে ক্ষণে চমকাসে। বড় বৌমার ঘরে টুনী জেগে উঠেছে। বাথরুম করবে হয়তো। শোবার ভালামত বাথরুম করিয়ে নিলে রাত দুপুরে কামেলা করতে হয় না।

নীলু টুনীকে কোলে করে বের হলো। অবাক হয়ে বলল, রাত দুপুরে কি ক বাবা?

কিছু না, এই বসে আছি। বৃষ্টির নমুনা দেখেছ মা? ভাসিয়ে দেবে। তুমি কি মা কষ্ট করে-

হোসেন সাহেব কথা শেষ করলেন না। নীলু শান্ত স্বরে বলল, দিচ্ছি। চায়ের আর কিছু দেব?

এক ব্লাইস কুটি দিতে পার যদি থাকে। মাখন দিও না। এই বয়সে মাখনটা সহ্য হয় না।

নীলু মুহূর্তের মধ্যেই চা-কুটি নিয়ে এলো। মুখে একটি বিরক্তির রেখাও পড়ল ঠোট বাঁকল না। পরের ঘরের একটি মেয়ে কত যত্নই না করল। এই ঝগ তো ক শোধ হবে না। পরের বাড়ির একটি মেয়ের কাছে আকাশ প্রমাণ ঝগ রেখে তাঁকে মা হবে।

বৌমা, একটু বসো না। এই দু'মিনিট।

নীলু বসল। হোসেন সাহেব হাসি মুখে বলতে লাগলেন, গ্রামের বাড়িতে গ্রা বর্ষণে কত মাছ মেরেছি। প্রথম বর্ষণে কি হয় জানো? মাছগুলি সব মাথা খারাপের ম হয়ে যায়। পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে আসে, স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতারায়। কত কি করে।

শাহানা কান্দো কান্দো গলায় বললো, আবার বক বক শুরু করলে বাবা।

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। বৃষ্টিতে ঢাকা শহর আজ হয়তো ডুবে যাবে এখন আবার বাতাস দিচ্ছে।

এক রাতের বৃষ্টিতে বাড়ির সামনে হাঁটু পানি জমে গেছে। আরেকটু হলে ঘরে পা ঢুকতো। শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি দেখছে। নীলু অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বাইরে এসে আঁধারে উঠল। ভীত গলায় বলল, বন্যার পানি নাকি শাহানা? সমুদ্রের মধ্যে লাগছে।

শাহানা হাসি মুখে বলল, আজ আর অফিসে যেতে পারছ না। শাভি হাঁটু পর্যন্ত যাঁ তুলতে পারো তাহলে অবশ্যি ভিন্ন কথা। কিংবা একটা রিকশা যদি বাঁধা পর্যন্ত আন যায়।

কে আনবে রিকশা?

সেটা একটা সমস্যা। রফিককে বলা যাবে না। সে এখনো ঘুমচ্ছে। না ঘুমলেও পানি ভেঙে রিকশা আনার পাত্র সে নয়। শাহানা কিশল, তোমার কি যাওয়াটা খুব দরকার ভাবী?

ইঁ।

আনিস ভাইকে বলি একটা রিকশা এনে দিক।

আনিস প্রজ্ঞা দেখে সে আছে কি না।

আনিস নেই। বাজার করতে গিয়েছে। এক ঘণ্টার উপর হয়েছে এসে পড়বে। এলেই আনিস আনতে পাঠাব।

আনিসে শাহানা।

আনিস ভেতরে ঢুকে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারী একটা বাজারের ব্যাগ হাতে আনিস আসতে দেখা গেল। লাউয়ের মাথা পুঁই শাক বের হয়ে আছে। অন্য হাতে আনিস এত বাজারটাকার আনিসের নিশ্চয়ই নয়। বীণাদের বাজার। আনিসের আনিস করে হাঁটু পর্যন্ত তোলা। কি কুৎসিতই না দেখাচ্ছে। আনিস হাসি মুখে বলল, আনিস শাহানা তুমি এখনো বারান্দায়।

আনিসে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

আনিসে না আমার অসুবিধা কি? আমার বরং সুবিধাই হলো। তোমার মুখ দেখে যাত্রা আনিসে বলে কুড়ি টাকায় হাঁস পেয়ে গেলাম। এই বৃষ্টিবাদলার দিনে এই হাঁসের দাম আনিসে কমে কমে চল্লিশ।

আনিসে শুধু শুধু কথা বলেন? কে আপনার এইসব কথা শুনতে চায়? আপনি চট করে একটা রিকশা ডেকে দিন তো আনিস ভাই। ভাবী অফিসে যাবে। আর প্যান্টটা নামান, সে বিশ্রী দেখাচ্ছে।

আনিস অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। শাহানা বলল, খামকা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাজার নিয়ে রিকশা নিয়ে আসুন।

আনিস বাজারের থলি নামিয়ে রেখে প্যান্টের ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল, দু'দিন পর আনিসে হয়ে যাবে এখনো তুমি এত বেগে বেগে কথা বলো। পরে অসুবিধা হবে।

কি অসুবিধা হবে?

তোমার নিজেরই খারাপ লাগবে। মনে হবে লোকটা তো ভালোই ছিল, কেন যে খারাপ ব্যবহার করেছে।

শাহানা একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে ঘরে ঢুকে গেল। আবার যদি বের হয় এই আশায় আনিস বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শাহানা এলো না। আনিসকে আবার প্যান্ট খুলতে হলো। রিকশা আনতে যেতে হবে। তারপর যাবে পুরনো ঢাকায়। আজ শরাফ আলি ভাইকে বাড়িতে পাওয়ার সম্ভাবনা। গতরাতেই খুম বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই প্রাণ ভরে আনিস টেনেছে। এবং যদি টেনে থাকে তাহলে এখনো ঘুমে। দড়ির একটা কৌশল যদি আনিস করা যায়।

আলির সামনে আনিসকে খমকে দাঁড়াতে হলো। নর্দমা উপচে উঠেছে। পুঁতিগন্ধময় পানি ঢুকছে গলিতে নাড়ি উল্টে আসার মতো দুর্গন্ধ। সুস্থ মাথায় কেউ এই পানিতে পানি দিয়ে গলিতে ঢুকবে না। আনিসের অবশিষ্ট ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আজ গেলেই শরাফ আলিকে পাওয়া যাবে। বড় কিছু পেতে হলে কষ্ট করতাই হয়। সে প্রায় চোখ বন্ধ করে গলিতে ঢুকে পড়ল।

পানিবিড়ির দোকানের ঝাপ খোলা। বুড়ো লোকটি কৌতূহলী হয়ে আনিসকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই বলল, শরাফ আলির যোজ্ঞে যান?

জি।

আইজ পাইবেন। বাড়িত আছে। একটু আগে পাঁচটা স্টার সিগ্রেট কিনল।

আনিস বলল, আমাকে এক প্যাকেট ভালো সিগারেট দিন। সিগারেট দেখান।
হবে।

বুড়ো বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। যার অর্থ খুশি হবার লোক শরাফ আলি নয়।

দরজা খুলল রেশমা। বলমলে একটা শাড়ি গায়ে পঁচানো। মুখটি করুণ ও বিকৃত।
ভারী চোখ, মনে হচ্ছে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। আনিস ভয়ে ভয়ে বলল,
ডাই আছেন?

হুঁ আছেন।

মেয়েটি দরজা ধরে আছে, ভেতরে ঢুকতে দেবার ইচ্ছা নেই হয়তো। আনিস
ভেতরে এসে বসব? রেশমা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

পা খোয়া দরকার একটু পানি দেবেন?

পা খোয়ার দরকার নাই। এটা মসজিদ না।

আনিস ঘরে ঢুকল। মেয়েটি কটু গলায় বলল, দুই দিন পরে পরে ক্যান আনিস
কি চান আপনে?

আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। এত স্নিগ্ধ মুখ মেয়েটির অথচ কি কঠিন
কথা বলছে।

কি কথা কন না কেনে ভদ্রলোকের ছেইলা।

ম্যাজিক শিখতে আসি। পামিং শিখি।

আসল ম্যাজিক আমার কাছে আছে শিখবেন?

মেয়েটির চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা
দরজার কপাটে। অন্য হাত কোমরে। যেন প্রচণ্ড একটা ঝগড়ার প্রস্তুতি। অথচ মুখ
হাসি হাসি।

কি দেখবেন ম্যাজিক?

বলতে বলতে মেয়েটি এক হাতে শাড়ি ঘোমটার মতো মাথায় দিয়ে নরম পাল
বলল, এই দেখেন এখন আমি উদ্দর লোকের মাইয়া। দেখলেন?

আনিস কিছু বুঝবার আগেই রেশমা বুক থেকে শাড়ি সরিয়ে ফেলল। ব্লাউজ বা
কিছুই নেই। সাদা শব্দের মতো মেয়েটির সুগঠিত বুক ঝলমল করছে। আনিসের।
ঝিমঝিম করতে লাগল। রেশমা শান্ত গলায় বলল, একটু আগে ছিলাম ভাঙা মাইন
ঝি এখন হইলাম, নটি বেটি। এরে কয় ম্যাজিক। আপনরে একটা কথা কই-আপ
ভালো মাইনমের পুলা খারাপ জায়গায় ঘুরাঘুরি করেন ক্যান? এই খানের বাতাসে পো
আছে। খারাপ বাতাস শইলে লাগব। যান বাড়িতে যান।

আনিস নিঃশব্দে বের হয়ে এলো। আকাশ আঁধার হয়ে মেঘ করেছে। প
নামতেই বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল। পানও মালা হাসি মুখে বলল, দেখা হইছে শরা
ডাইয়ের সাথে?

আনিস জবাব দিল না।



কবির মাষ্টারের শরীরটা ভালো না।

কয়েকদিন আগে পা পিছলে পুকুর পাড়ে পড়ে গিয়েছিলেন তখন কিছু হয়নি কিন্তু বেশে লানান দিচ্ছে। গত রাতে কোমর ব্যথায় ঘুমুতে পারেননি। সেক দিতে গিয়ে কোমর আওন-গরম কাপড় কোমরে ধরেছে নির্ঘাৎ ফোসকা পড়েছে। এখন টনটনে বসে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে আছেন। চোখ দুটি ভেজা জোছনা। রাত তেমন হয়নি কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। সুনসান ঘুম। এতক্ষণ ঝি ঝি ডাকছিল এখন তাও ডাকছে না। তবে মশার পিন পিন হচ্ছে। শওকত কিছুক্ষণ বসে থাকলে মনে হয় গা খুবলে নিয়ে যাবে। শওকত মালশায় ধূপ পায়ের কাছে রেখে দিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, সেক লাগব স্যার?

কবির মাষ্টার হংকার দিয়ে উঠলেন, সাবধান সেকের কথা মুখে আনবি না। কবির আশু পোড়া করেছিস খেয়াল নাই। সাহস কত আবার সেক দিতে চায়। দূর হোক থেকে।

শওকত সরে গেল তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে উঠানে দেখা গেল। সাজসজ্জা পরিধান। পায়ে গাম বুট, হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। কবির মাষ্টার প্রথমমে গলায় বললেন, কোথায়?

মাহ মারতে যাই।

গাম বুট পেলি কোথায়?

শওকত জবাব দিল না। কবির সাহস তরী গলায় বললেন, অসুখে একটা মানুষকে কলে চলে যাচ্ছিস ব্যাটা তুই মানুষ না অন্য কিছু?

কবির মাষ্টারের কথা শওকতের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করল বলে মনে হলো না। সে টর্চ ফেলে তার কোঁচ পরীক্ষা করল। এবং গাম বুটে মচমচ শব্দ করে বের হয়ে গেল। কবির মাষ্টার বিড়বিড় করে কি সব বললেন। তাঁর কোমরের ব্যথা বেড়েছে। কানো পিপাসা হচ্ছে। কিন্তু উঠে গিয়ে পানি খাবার উৎসাহ বোধ করছেন না। সারা শরীরে সীমাহীন আলস্য। এর নাম বয়স। বেলা শেষ হয়েছে। অজানত দেশে যাবার কথা। তেমন নেই। একা যখন থাকেন ভয় ভয় লাগে। এক দিকে শয়ান অন্যদিকে ভয়। সুন্দর এই জায়গা ছেড়ে যেতে মায়া লাগছে। প্রিয়জন কেউ নেই তবু যখন মনে হয় এই শওকতের সঙ্গে আর দেখা হবে না। দেখা হবে বাস্তবিক রফিকের সঙ্গে তখন কেউ ভেতর চাপ ব্যথা অনুভব করেন। তিনি গৃহী মানুষ তঁারই যখন এমন অবস্থা এখন গৃহী মানুষের অবস্থাটা কি ভাবাই যায় না।

কবির মাষ্টার লক্ষ করলেন তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। তিনি লজ্জিত বোধ

করলেন। আশেপাশে দেবার কেউ নেই তবু কেন জানি মনে হয় কে যেন দেখে যে দেখেছে সে যেন একটি তরুণী মেয়ে। দেখেই চট করে পর্দার আড়ালে সরে হাসছে। মেয়েটির মুখ শাহানার মতো। সরল স্নিগ্ধ একটি মুখ। যে মুখ দেখলে এক ধরনের পবিত্র ভাব হয়।

শাহানার বিয়ে খুব শিগগিরই হবার কথা কিন্তু কেউ এখনো কোনো চিঠিপত্র না। হয়তো ভুলে গেছে। তাঁর কথা বিশেষ করে কারোর মনে থাকে না। মানুষদের তালিকা যখন তৈরি হয় তখন কেমন করে যেন তাঁর নামটা বাদ পড়ে কেউ ইচ্ছা করে করে না তিনি তা জানেন। হয়ে যায়। ভুল ধরা পড়লে খুব লজ্জা। অসংখ্যবার ভাবে এই ভুল আর হবে না। কিন্তু আবার হয়। কেন হয় কে জানে। বড় রহস্যময় প্রাণী। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকার যে রহস্য মানুষের রহস্য তারচে' কথা তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘমালা এগিয়ে আসছে। চাঁদ প্রায় ঢাকা বসেছে। কি সুন্দরই না লাগছে। কোমরের ব্যথা তাঁর আর মনে রইল না। তিনি ধ্যানশু হয়ে পড়লেন। শওকত খালি হাতে ফিরে এসেছে এটিও লক্ষ করলেন। শওকত যখন বলল, ঘুমাইছেন? তখনই শুধু চমকে উঠলেন।

কিরে মাছ পাস নাই?

না। যাই নাই।

এত মাছ মাছ করে আবার খালি হাতে ফিরে এলি।

জমির মিয়ার সাথে যাওয়ার কথা ছিল, তারে ভূতে ধরছে।

কি বললি?

নিয়ামত ঋর বাড়ির সামনে যে তেঁতুল গাছ আছে হেইখানে ভূতে ধরল। হইছে দুই জনে। জমির মিয়া খুব ডয় পাইছে। শইল দিয়া বিজল বাইর হইতেছে কি পাগলের মতো কথা বলছিস। ভূতে ধরবে কি?

এরলে আমি কি করমু কেন আমারে জিগাইয়া তো ধরে নাই।

গা জ্বলে যাওয়ার মতো কথা। ভূতের সঙ্গে কুন্তি করেছে একজন, অন্যজন বিশ্বাস করে বসে আছে। কবে এদের বুদ্ধি হবে? কবে এরা সাদা চোখে পৃথিবী দেখে শিখবে?

বিছানা করছি যান শুইয়া পড়েন। চাটা কিছু খাইবেন?

না। তুই আবার যাস কই?

জমির মিয়ার বাড়িতে। লোকটা বাঁচত না। তওবা করতে চায়। মৌলবী আর লোক গেছে।

কি বলছিস তুই?

সারা শইল দিয়া বিজল বাইর হইতেছে।

কবির মাষ্টার উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, ঘরে তালো দে তারপর। মূর্খটাকে দেখে আসি। কুন্তি যে জায়গায় হয়েছে সেখানটায় আগে নিয়ে যায়।

এই অসুখ শইলে যাইবেন? দিনের অবস্যও দোশা না।

কথা বলিস না। তাদের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।

যে তেঁতুল তলায় ভূতের সঙ্গে কুন্তি হয়েছে সে জায়গাটার মস্তাধস্তির ছাপ সখি

মাছে। কবির মাষ্টার টর্চ ফেলে ফেলে উবু হয়ে অনেক্ষণ দেখলেন। শওকত
গলায় বলল, এখন বিশ্বাস হয় স্যার? জায়গাটা খারাপ। আসেন যাই গিয়া।

শেষ ভয় লাগছে?

শওকত জবাব দিল না। তার সত্যি সত্যি ভয় লাগছে। ভয় কাটানোর জন্যে সে
লোকটি নিড়ি ধরিয়েছে। হাতে আগুন থাকলে এরা কাছে আসতে পারে না। জ্বলন্ত বিড়ি
মাষ্টার নজর থেকে লুকিয়ে রাখাও এক সমস্যা।

সার চলেন যাই। দিনের অবস্থা খারাপ।

মাষ্টার মাষ্টার উঠে পড়লেন।

জমির মিয়ার বাড়িতে রাজ্যের লোক এসে জুড় হয়েছে। তিন চারটা হারিকেন
জ্বলছে। মালশায় ধূপ এবং লোহা পুড়তে দেয়া হয়েছে। জমির মিয়া বারান্দায় চাটাইয়ে
কাপা ছুটফট করছে। ভূতে পাওয়া মানুষকে ঘরে ঢুকানো যায় না। কবির মাষ্টারকে
শেষেই জমির শব্দ করে কেঁদে উঠল।

দিন শেষগো মাষ্টার সাব। ভূতে কামড় দিছে।

কবির মাষ্টারের বিশ্বাসের সীমা রইল না। লোকটি সত্যিই মৃত্যুশয্যায়। চোখ ডেবে
গেছে। গা দিয়ে হলুদ রঙের পিচ্ছিল ঘাম বেরুচ্ছে। বাঁ হাত রক্তাক্ত। কবির মাষ্টারের
নিজেকে সামলাতে সময় লাগল।

জমির মিয়া ভূমি যে গিয়েছিলে তেঁতুল তলায় তোমার পায়ে জুতা ছিল?

জ্বি না।

তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শোন। তোমার সঙ্গে যে কুত্তি করেছে তার পায়ে ছিল
জুতার জুতা। জুতার ছাপ আছে মাটিতে। ভূত কি আর জুতা পায় দেব বলো দেখি?

জমির মিয়ার কোনো ভাবান্তর হলো না। টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে লাগল। মৌলানা
গাহেব আসবার আগেই ডাক্তার এসে পড়ল। নিমতলির সোবাহান ডাক্তার। নেত্রকোনায়
এক সময় কম্পাউভারি করত এখন পুরো ডাক্তার। কুগীকে ভূতে ধরেছে শুনেই সে তার
মালো ব্যাগ খুলে সিরিজ বের করে ফেলল। কবির মাষ্টার বললেন, কিসের ইনজেকশান
দিচ্ছে ডাক্তার সোবাহান হাসি মুখে বলল, কোরামিন সুইয়ের এক গৌতায় দেখবেন কুগী
দোড়ার মতো লাফ দিয়ে উঠেছে। শুশুধ তো না আগুন।

সেই আগুন ইনজেকশনেও কাজ হলো না। কুগী আরো ঝিমিয়ে পড়ল। সোবাহান
ডাক্তারকে তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হলো না। সে নিচু গলায় পাশের মেজ্জটিকে
বলল, একটা পান দিতে বল তো। মুখটা মিষ্টি হয়ে আছে।

কবির মাষ্টার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। কি অবস্থা। আশেপাশে কোথাও একজন পাস
এরা ডাক্তার পর্যন্ত নেই যে জানবে কি হচ্ছে, সমস্যা কোথায়। মৃত্যু নামক কুৎসিত
জিনিসটির সঙ্গে যে প্রাণপণ যুদ্ধ করবে। ঠাণ্ডা গলায় বলবে, কীমা যুদ্ধে নাহি দেব সূচগ্র
মেদিনী। এই লোকটির মতো বিরস মুখে পান চিবাবেন না।

সোবাহান ডাক্তারের জন্যে জলচৌকি এসেছে। সে জলচৌকি প্রত্যাখ্যান করল।
তার আরেক জায়গায় যেতে হবে। জরুরি কল। তার অপেক্ষা ভিজিটের জন্যে। টাকা

আসছে না বলে যেতেও পারছে না। পাশের লোকটিকে বানিকটা আড়ালে টেনে দিঃ
গুজুগুজু করে আবার কি সব বলছে। সম্ভবত ভিজিটের কথা।

মৌলানা সাহেব এসে পড়েছেন। অনেক আয়োজন করে তিনি তওবা পড়ালেন।
তার কিছুক্ষণ পরই জমির মিয়া মারা গেল। তার অল্প বয়স্ক বউটি গড়াগড়ি করে কাঁদছে।

এত অল্প সময়ে এত বড় একটি ঘটনা ঘটে যেতে পারে? মৃত্যু ব্যাপারটা কি এতই
সহজ? কবির মাষ্টার হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো এ রকম কিছু বোধ
ঘটেনি। এটা তাঁর কল্পনা।

শওকত।

জি স্যার।

চল বাড়ি যাই।

শওকত বিস্মিত হলো। এ অবস্থায় মাষ্টার সাহেব বাড়ি চলে যেতে চাইবেন এটা
বিশ্বাস করা কঠিন। সে কথা বাড়াল না। রাস্তায় নেমে এলো।

শওকত।

জি।

চল তো তেঁতুল তলায় আরেকবার যাই।

আবার যাওয়ার দরকার কি?

ভূতের কথাটা ঠিক না। ভূত রবারের জুতা পায়ে দেয় না।

যা হওয়ার হইছে স্যার। এখন ভূত হইলেইবা কি না হইলেইবা কি। বৃষ্টিতে ডিজা
লাভ নাই চলেন যাই গিয়া।

কবির মাষ্টার আর আপত্তি করলেন না। রাতে তাঁর চেপে জ্বর এলো। বিছানা
ছটফট করতে লাগলেন। শেষ রাতের দিকে চোখ লেপে এসেছিল তখন অদ্ভুত অদ্ভুত
সব স্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি মারা গেছেন। তাঁর বাবা মা এসেছেন তাঁকে কোথায় যে
নিয়ে যেতে। তাঁদের মুখ বিষণ্ণ। চোখে জল টলমল করছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন মাথা
নীচু করে। কবির মাষ্টার খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন আপনারা? বসুন।

তাঁরা বসলেন না। দু'জনেই কাঁদতে শুরু করলেন।

বপু এই পর্যন্তই। কবির মাষ্টার জেগে উঠলেন। ঘামে গা ভিজ গিয়েছে। ক্লান্ত
বরে ডাকলেন, শওকত ও শওকত।

শওকত উঠল না। পাশ ফিরে আবার নাক ডাকতে লাগল। শেষ রাতের দিকে তার
ভালো ঘুম হয়।



শাহানার গায়ে হলুদের দিন তারিখ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

প্রথম ঠিক হলো সোমবার সকালে। বরের কাড়ি থেকে ঠিক নটায় মেয়েরা আসবে।
দশটার ভেতর বিদেয় করে দিতে হবে। বিয়ে শুক্রবারে, গায়ে হলুদ এত আগে আগে

কথা শুনেদের পর কিছু নিয়মকানুন পালন করতে হয়। ঘর থেকে হলুদ দেয়া মেয়ে
কথা শুনবে না। ছেলেদের দিকে তাকাতে পারে না। বর পক্ষের কেউ কিছু শুনলেন
না। মনে একটাই কথা সোমবারই হবে। এবং নটার সময়ই হবে।

যাত্রার ব্যাপার হচ্ছে সোমবার খুব ভোরে তাঁরা জানালেন একটা বিশেষ ঝামেলা
হবে মঙ্গলবার বিকেলে। ঠিক তিনটার সময় তাঁরা আসবেন চাবটার মধ্যে
কিছু দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সেই দিনও বদলাল। ঠিক হলো বুধবার সকাল।

নীলু খুব বিরক্ত হলো। বরের চাচাকে বলেই ফেলল, আপনার মন ঠিক করুন।
আপনার মনে হলো এই কথায় খুব অপমানিত বোধ করলেন। গলার স্বর চট করে
ফেলে বললেন, অসুবিধা আছে বলেই তো বদলানো হচ্ছে। শব্দ করে নিশ্চয়ই
লগানো না।

এলোক মুখ অন্ধকার করে রইলেন। চা নাস্তা কিছুই মুখে দিলেন না। যাবার সময়
এতদূর বিদায়ও পর্যন্ত নিলেন না। নীলু খুব অপ্রস্তুত বোধ করল।

মনোয়ারা ভীষণ গলায় বললেন, ক্যাট ক্যাট করে এ কথাগুলি না বললে হতো না
বীমা।

এবার ইচ্ছা ছিল না মা। মুখ ফসকে বলে ফেলেছি। এমন কিছু অনায়াস কথাও কিন্তু
বলি নি।

আমাকে ন্যায়-অন্যায় শিখাতে এসো না। বয়স কম হয়নি। ন্যায় অন্যায় চিনি।
মনোয়া সবাই চাও বিয়েটা নিয়ে একটা ঝামেলা হোক। ভালোয় ভালোয় এটা পার করি
না চাও না।

নীলু চুপ করে গেল। মনোয়ারা চুপ করলেন না। তাঁর স্বভাব মতো কথা বলতেই
লাগলেন। শেষের দিকে তাঁর কথায় মনে হতে লাগল যেন নীলু আগের থেকে সব
শিখাক করে বর পক্ষীয়দের সঙ্গে এই ঝামেলাটা বাধিয়েছে। এক পর্যায়ে শাহানা কড়া
গলায় বলল, তুমি যদি এই মুহূর্তে চুপ না করো তাহলে কিন্তু আমি একটা কাণ্ড করব।

কি কাণ্ড করবি?

সেটা যখন করব তখন বুঝবে। এখন বল চুপ করবে কি না। শুধু শুধু ক্যাচক্যাচ
করে বাড়ি সুদ্ধ সবার মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

মনোয়ারার রক্ত চড়ে গেল। তিনি নিতান্তই অবান্তর সব কথা বলতে লাগলেন। যার
মধ্যে একটি হচ্ছে নীলুদের পরিবার হচ্ছে ছোটলোকের পরিবার। তিন বছর পর যা
মোয়েকে দেখতে এসেছিল খালি হাতে। একটা বিস্কিটের প্যাকেট পর্যন্ত ছিল না।
পরিবারের আছর যাবে কোথায়? মার যেমন ছোট মন মেয়েরও হেসেই হয়েছে।
মানুষের ভালো দেখতে পারে না। ইত্যাদি।

এইসব কথাবার্তার কোনোরকম জবাব দেয়া অর্থহীন। নীলু রান্না চড়িয়ে দিয়ে
পাণপণে ভাবতে লাগল সে এখন কিছুই শুনছে না। কিন্তু মনোয়ারা নীলুর একটি দুর্বল
জায়গায় আঘাত করেছেন। যা তিনি প্রায়ই করেন। নীলুর মা খালি হাতে মেয়েকে
দেখতে এসেছিলেন। এই কথা নীলুকে অতীতে লক্ষ বার শুনতে হয়েছে। বাকি জীবনে
তো আরো আরো কয়েক লক্ষ বার শুনতে হবে।

হোসেন সাহেব নিঃশব্দে রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। নিচু গলায় ডাকলেন, বৌমা।

নীলু স্বাভাবিক স্বরে বলল, চা লাগবে বাবা?

না মা চা-টা কিছু না। তোমার শাওড়ি কি সব গুরু করেছে। কিছু মনে করো? গো লক্ষী ময়না।

আমি কিছু মনে করিনি।

যে সব সে বলছে ওগুলি তার মনের কথা না।

নীলু জবাব দিল না। তার চোখে পানি এসে গিয়েছে। এই স্নেহময় অসংখ্যবার তার চোখে পানি এনে দিয়েছেন। এই ভালোবাসার তেমন কোনো প্রতিদান নীলু কি দিতে পেরেছে?

তোমার শাওড়ি হচ্ছে তোমার মেয়ের মতো বুকলে মা। মেয়ের উপর কি আর করা যায় বলো? কথা বলছ না কেন? রাগ করা যায়?

না যায় না। আপনাকে চা করে দেই?

নাও।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় সফিক হাই তুলে বলল, মা'র সঙ্গে নাকি তুমুল ঝগড়া করলে?

হ্যাঁ করলাম। খবরটা তোমাকে দিল কে?

টুনী দিয়েছে। বাতি নেভাও। শোনো মা'র সঙ্গে আর একটু মানিয়ে চলতে পারো না? বুড়ো মানুষ, কিছু একটা বললেই যদি কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করে তাহলে মুশকিল।

নীলু বাতি নিভিয়ে দিল।

গা ঘামে চট চট করছিল অনেকখানি সময় নিয়ে গোসল করল। চুল ভেজাবে ভেজাবে না করেও চুল ভেজাল। নির্মাণ ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু বাথরুম থেকে বেরুতে ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা করছে শাওয়ারের নিচে স্নানরাত মাথা ধরে রাখতে। যাতে মনের গ্লানি জলধারার সঙ্গে ধুয়েমুছে যায়। কিন্তু তা কি আর যায়? যায় না। গ্লানি থেকেই যায়।

শাহানার ঘরে বাতি জ্বলছে। আজকাল অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে বাতি জ্বলে। সে কি ইচ্ছে করেই জেগে থাকে না তার ঘুম আসে না? বিয়ে ঠিক হওয়া মেয়েকে একা ঘুমুতে দিতে নেই। কিন্তু শাহানাকে দিতে হচ্ছে। সে তার মা'র সঙ্গে ঘুমুতে রাখে না।

অবশ্য তার ঘরের একটি চৌকিতে বাবলু ঘুমায়। তাকে কি মানুষের মধ্যে গণ্য করা যায়? বোধহয় যায় না। সে বাস করে ছায়ায় মতো। ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছে কিন্তু একটি কথাও কাউকে বলেনি। সফিক প্রথম লক্ষ করল এবং বেশ কিছু কড়া কড়া কথা শোনাল। সে সব কথার সারমর্ম হচ্ছে—এই ছেলেটা কোনো আসক্তিমাত্র না। এও একটা মানুষ।

বাতি জ্বলছে রান্নাঘরেও। রফিক ফিরেছে বোধহয়। ঘুমুবার আগে সে এক কাপ চা খায়। এতে নাকি তার সুন্দ্রা হয়। নীলু এতদূর রান্নাঘরের দিকে। চিরকাল সে শুনে এসেছে চা খেলে ঘুম কমে যায়, রফিকের বেলার উন্টো।

রান্নাঘরে রফিককেই পাওয়া গেল। চা নয়, প্রেটে ভাত নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

৭।৩। ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত। বড় বড় নলা ঘেঁষে মুখে দিচ্ছে। নিশ্চয়ই প্রচুর ক্ষিধে।
৭।৪। দেখে রফিক অপ্ৰতুষ্টের ভঙ্গিতে হাসল।

৭।৫। কেমন খাওয়ার নমুনা রফিক? শারমিনকে বললেই সে গরম-টরম করে দিত।

৭।৬। ঘুমুচ্ছে। বেকার মানুষ বউকে রাত দুপুরে ঘুম ভাঙাই কি করে?

আমাকে ডাকতে। যাও টেবিলে গিয়ে বসো। আমি গরম করে আনছি।

আমার খাওয়া শেষ, কাজেই তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ঘুমুতে যাও।

এত রাত পর্যন্ত বাইরে কি করছিলে?

নাথিং। তুমি আবার এখন উপদেশ দিতে শুরু করলে ঝামেলা হয়ে যাবে। যা বলছ

৭।৭। করো, ঘুমুতে যাও।

চলো একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

আমার দেয়ি হবে। চা খাব।

রফিক চায়ের পানি বসাল। এঁটো থালা-বাসন পরিষ্কার করল। নীলু তাকিয়ে আছে।

৭।৮। মজা লাগছে তার।

ড্যাভ ড্যাভ করে কি দেখছ ভাবী?

তোমার ঘরকন্না দেখছি। এক হাতে প্লেট পরিষ্কার করার এই কায়দা কোথায়

শিখলে?

সব কিছু কি ভাবী শিখতে হয়! কিছু বিনা মানুষ সঙ্গে নিয়েই জন্মায়। তুমিও কি

৭।৯। খাবে?

না।

আমি কিন্তু দু'জনের পানি দিয়েছি।

তুমি নিজেই দু'কাপ খাও। ভালো ঘুম হবে।

৭।১০। রফিক চা বানাতে পারল না। ঘরে চায়ের পাতা নেই। নীলুর খুবই খারাপ লাগতে
লাগল। বেচারি এত কষ্ট করে পানিটানি গরম করেছে।

সারি রফিক। আমি খেয়াল করিনি।

সারি হবার কোনোই কারণ নেই ভাবী। আজকের দিনটিই আমার জন্য খারাপ। যে

৭।১১। ৭টা কাজ করতে গিয়েছি প্রতিটি ভুল হয়েছে।

মোড়ের চায়ের দোকানটা খোলা আছে না? ওখান থেকে খেয়ে আসো।

দরজা খুলে দেবে কে?

আমি জোগে থাকব।

৭।১২। রফিক সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো। তার মুখ হাসি হাসি। নীলু রুমের ঘরে অপেক্ষা
করতে লাগল। একবার যখন বের হয়েছে এত সহজে ফিরবে না। সাহানার ঘরে এখনো
পানি জ্বলছে। একবার উঁকি দিয়ে দেখলে হয়। কিন্তু কেমন জ্বলসী লাগছে। উঠতে ইচ্ছা
করছে না।

৭।১৩। হাফে মাঝে এমন অলসেমী লাগে। কোনো কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। তারও
কি বয়স হয়ে যাচ্ছে? হচ্ছে তো নিশ্চয়ই কিন্তু কেন জানি তা মনে নিতে ইচ্ছা করে না।
মায়নায় নিজেকে দেখলে মনে হয় কই বয়স তো কিছুই বাড়েনি। সুন্দর একটি মায়ভরা

মুখ। ঘন কালো চোখ। এই চোখ নিয়ে কত কাণ্ড। তাদের কলেজের ইংরেজিগার শাস্ত্র আফতাব উদ্দিনের কাছে গিয়েছে পার্সেন্টেজ দিতে। ক্লাসে দেরি করে এসেছিল সেখানে দেয়া হয়নি। আফতাব স্যার রেজিস্ট্রার খাতা খুলে বললেন, তোমার কটা পার্সেন্টেজ দরকার বলো তো? মোটে একটা? নীলু বিস্মিত হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, ৭৭। তোমার চোখ তো ভারি সুন্দর! ভালো করে তাকাও আমার দিকে। এই বলেই ৭৭ বুঝবার আগেই গালে হাত দিয়ে নীলুর মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন বিস্ময় হয়ে গেছে। কখন ক্রমে একটি মানুষ নেই। আফতাব স্যার তাকাচ্ছেন অদ্ভুত চোখে। কি সর্বনাশা কাণ্ড! প্রতিটি মেয়ের জীবনেই এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটে যা ভিরকাল গোপন রাখতে হয়। কেথায় এখন আফতাব স্যার কে জানে। কি সুন্দর ভরাট গলা! শেগুনগীয়ার পড়াতেন। এখনো কানে বাজে।

Tell them that God bid's us do goods for evil.

And thus I clothe my naked villainity

With odd old ends stol'n forth of holy writ.

And seem a saint when most I play the devil.

কিং রিচার্ড দ্য থার্ড। আচ্ছা তার যদি আফতাব স্যারের সঙ্গে বিয়ে হতো তাহলে কেমন হত? জীবনটা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অন্য রকম হতো। টুনী জন্মাত না। অন্য কোমো মেয়ে জন্মাত কিংবা কোনো ছেলে। এখন সে যেমন টুনীকে ভালোবাসে সেই ছেলে বা মেয়েটিকে সে তেমনই ভালোবাসত। বাসত না?

ভাবী। একা একা বসে আছ কেন?

শাহানা বের হয়ে এসেছে। একটা সাদা চাদর এমনভাবে গায়ে জড়িয়েছে যে অদ্ভুত লাগছে দেখতে।

কথা বলছ না কেন ভাবী?

রফিকের জন্যে বসে আছি। রফিক দোকানে চা খেতে গিয়েছে। ঘরে চা ছিল না।

ছিল না তবু খেতেই হবে? ছেলে হবার কত মজা দেখলে ভাবী। একটা ছেলে যা চাইবে সবাই তাকে তা করতে দেবে। কিন্তু একটা মেয়েকে দেবে না।

আমি দেব। তুমি যদি এখন বাইরে চা খেতে যেতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই যেতে পারো।

শাহানা গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল। নীলু হাসল। শাহানা বলল, তুমি শুয়ে পড়ো আমি দরজা খুলে দেব। আমার ঘুম আসবে না। রাতে আমি প্রায় জেগেই থাকি। দিনে ঘুমাই।

অভোসটা ভালো, বিয়ের পর তাহলে আর খুব কষ্ট হবে না।

কষ্ট হবে না কেন?

বিয়ের পর অনেক দিন পর্যন্ত স্বামী নামক জিনিসটি রুমের রাতে ঘুমতে দেয় না।

শাহানা কিছু বলল না। নীলু লক্ষ করল মেয়েটির চোখের গাল টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কথাগুলি বলা ঠিক হয়নি। নীলুর লক্ষ্য ক্রমাগত লাগল। এত বাচ্চা মেয়ে। জীবন সম্পর্কে কোনো বোধ পর্যন্ত জন্মায়নি। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা ঠিক হয়নি।

দাঁড়িয়ে আছ কেন শাহানা, বোসো।

শাহানা বসল না। দাঁড়িয়েই রইল। রফিক এখনো আসছে না। এক ঘণ্টার মতো
বসে গেল। কি যে সে করে।



বাহানুটি কার্ড বাহানু রকম।

দর্শকরা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করবেন। তারপর ফিরিয়ে দেবেন ম্যাজিশিয়ানকে।
ম্যাজিশিয়ানের হাতে নয়, টেবিলে রাখা একটি চারকোনা বাস্কে। ম্যাজিশিয়ান দূর থেকে
খপ পড়বেন। ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড দুলাবেন ওল্লি বাহানুটি তাস হয়ে যাবে বাহানুটি সাহেব।
খেলার আসল মজাটা হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান একবারও হাত দিয়ে তাস ছুঁবেন না। তিনি
দাঁড়িয়ে থাকবেন দূরে। কাজেই দর্শকরা একবারও ভাববে না এর মধ্যে হাত সাফাইয়ের
কিছু আছে। অসাধারণ একটি খেলা তবে পুরোপুরি যান্ত্রিক। ম্যাজিশিয়ানের করবার কিছু
নেই। যা করবার শিশু লাগানো কাঠের বাস্কেটাই করবে। তাসের প্যাকেট রাখা মাত্র তা
হলে যাবে লুকানো একটি খোপে। উপরে উঠে আসবে আগে থেকে রাখা এক প্যাকেট
তাস। তাসের বদলে অন্য কিছুও উঠে আসতে পারে। একটি ডিম উঠে আসতে পারে।
খোট্ট চড়ুই ছানা উঠে আসতে পারে। কিন্তু তা করা ঠিক হবে না। তাহলে দর্শকরা
ভাববে কাঠের বাস্কেট কিছু একটা আছে। তখন তারা বাস্কেট পরীক্ষা করতে চাইবে।
তাসের বদলে যদি তাস আসে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। দর্শকরা ভাববে
গণগোলটি তাসে। তারা ব্যস্ত থাকবে তাস পরীক্ষায়। ম্যাজিক হচ্ছে মনস্তত্ত্বের খেলা।

আনিস শিশু দেয়া বাস্কেট নিজেই বানিয়েছে কিন্তু ঠিকমত কাজ করছে না। ডালা
নামে আসার সময় খপ করে শব্দ হচ্ছে। শুধু তাই নয় সব সময় নামছেও না। শিশুটা
আরো শব্দ করে সেই ক্রটি দূর করা যায় কিন্তু তাতে খপ শব্দ আরো বেড়ে যায়। এই
মুহুর্তে সেই শব্দ সমস্যার কোন সমাধান মনে আসছে না।

শাহানা অনেকক্ষণ থেকেই ছাদে হাঁটছে। আনিসকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু আনিস
একবারও তাকাচ্ছে না। কেউ একজন যে ছাদে আছে এই বোধটুকুও সম্ভবত জন্ম নেই।
শাহানা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। হাঙ্কা গলায় ডাকল, আনিস ভাই।

আনিস অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার অসময়ে?

অসময়ে মানে? আপনার এখানে কি পঞ্জিকা দেখে আসছে হবে?

না তা হবে না। ভেতরে আসব?

আসতে বললে হয়তো আসব। আগে বলুন।

আসো। ভেতরে আস।

আপনি বাস্কেট হাতে নিয়ে কি করছেন? ধ্যান করছেন নাকি? অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য

করছি। একবার দেখি বিভ্রিড় করে কথা বলছেন। কার সঙ্গে কথা বলছেন? বা।
সঙ্গে?

দাঁড়াও তোমাকে ব্যাপারটা বলি। এই বাস্তবটাকে বলে টু ওয়ে বাস্তব।
কম্পার্টমেন্ট আছে। একটা দেখা যায় অন্যটা দেখা যায় না।

আনিস দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। শ্রিষ্টা কিভাবে কাজ করে সেটা সেখ
বর্তমানে কি সমস্যা হচ্ছে সেটা বুঝাতে চেষ্টা করল। শাহানা গভীর মনোযোগে তাঁ
আছে। যেন সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারছে। আনিস বলল, কত সহজ টেকা।
কেমন চমৎকার একটা কৌশল দেখলে?

হ্যাঁ দেখলাম। আপনি কথা বলার সময় আমি একটা কথাও বলিনি, চুপ।
গুনেছি। এখন আমি কিছুক্ষণ কথা বলব আপনি চুপ করে গুনবেন। আমার কথা
না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলবেন না। হঁ হঁ কিছুই বলবেন না।

আনিস অবাক হয়ে তাকাল। শাহানার চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখ রক্তাভ। গ
ধর গাড়। ব্যাপারটা কি?

আনিস ভাই।

বলো।

গুরুবারে আমার বিয়ে আপনি তো জানেন। আপনাকে কার্ড দেয়া হয়েছে না?
হয়েছে।

এখন আপনি যদি মনে করেন আপনার সাহস আছে তাহলে আমি আপনার সা
অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কোর্টে কিভাবে নাকি বিয়ে করে আমি তো কিছু জা
না, আপনিই ব্যবস্থা করবেন। আমার কাছে চারশ টাক্স আছে।

আনিস হতভম্ব হয়ে গেল। কি বলছে শাহানা? সুস্থ মাথায় বলছে না অন্য কিছু?

আনিস ভাই আমি একটা স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছি। আপনি আপনার দরকা
জিনিসগুলি গুছিয়ে নিন।

এসব তুমি কি বলছ শাহানা?

আপনি কি চান না আমি সারাজীবন আপনার সঙ্গে থাকি?

চাইলেই কি সব হয়? আমি তোমাকে নিয়ে যাব কোথায়? কি বাওয়াব তোমাকে?

শাহানা উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, আনিস ভাই আমি যাচ্ছি।

শাহানা শোনো, একটা কথা শোনো।

শাহানা দাঁড়াল না। সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত নেমে গেল। আনিস সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর ঘরে
বসে রইল। সন্ধ্যা মেলাবার পর নিচে নেমে এলো। বারান্দায় নীচু কি যেন করছে।
আনিসকে দেখেই বলল, তোমার কি শরীর খারাপ নাকি আনিস?

হুঁ না।

চোখ-মুখ বসে গিয়েছে।

মনটা ভালো নেই ভাবী। বারান্দায় কি করছেন?

কিছু করছি না। তুমি আমাকে দুটা মেম্বারি এনে দিতে পারবে? আমাদের
বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই।

খানস মোমবাতি আনতে গেল। মোমবাতি এনে দেখল ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে।
 । বাড়ি আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। একটি রিকশায় করে কারা যেন এসেছে,
 ৩ : নীলু ভাবীর মা। বিয়ে বাড়ির লোকজন আসতে শুরু করেছে। করাই তো
 ৪ : মানিস মন্থর পায়ে দোতলায় উঠে এলো।

তখন কোনো খামেলা ছাড়াই শাহানার বিয়ে হয়ে গেল। বড় সমস্যা ছিল বিয়ের
 সমস্যা। তার সমাধান হলো অদ্ভুতভাবে। হোসেন সাহেব, কবির মাষ্টারকে সঙ্গে
 নিয়েছিলেন রফিকের স্বত্তর রহমান সাহেবকে দাওয়াত দিতে। দু'জনই ভেবে
 ছিলেন পরিচয় পর্ব খুব সুখকর হবে না। হোসেন সাহেব আসতে চাননি। তিনি বার
 বদলিলেন, ছোট বৌমা আগে যাক বাবার সঙ্গে বগড়া মিটিয়ে আসুক তারপর আমি
 । মনোয়ারা বিরক্তিতে মুখ কঁচকেছেন, ছোট বৌমা যেতে চাচ্ছে না তাকে জোর করে
 পাঠায়।

তাকে জোর করে পাঠাবে না তাহলে আমাকে জোর করে পাঠাচ্ছে কেন?
 বাজে কথা বলবে না। তৈরি হও, কবির ভাই যাবে তোমার সাথে। কথাবার্তা যা
 চলার সেই বলবে, তুমি চুপ করে থাকবে।

তাহলে আমার যাবার আর দরকারইবা কি?

আবার বাজে কথা?

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। দাওয়াতের চিঠি হাতে এমনভাবে বের হলেন
 শেন ফাঁসিকাঠে কুলবার জন্যে যাচ্ছেন। ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা ফেললেন।
 জামাতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন। দোয়ার কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই
 হোক রফিকের স্বত্তর হোসেন সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন। আন্তরিক স্বরে বললেন,
 আমার এত সৌভাগ্য এত বড় মেহমান আমার ঘরে। আদর-যত্নের চূড়ান্ত করলেন
 প্রলোক। নিজের মেয়ের কথা একবারও জিজ্ঞেস করলেন না। কবির মাষ্টার সে প্রসঙ্গ
 তুলতেই তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার মেয়ের সঙ্গে যা বোঝাপড়া তা
 আমাকেই করতে দিন। এটা বাদ থাক। আপনি আপনার নীলগঞ্জের ব্যাপারটি বলুন।
 এই বয়সে একটা শক্ত কাজ হাতে নিলেন।

যখন বয়স কম ছিল তখন এইসব চিন্তা মাথায় আসেনি। এখন এসেছে। এখন কি
 বয়সের কারণে ঐ চিন্তা বাদ দেয়া ঠিক হবে?

মোটাই ঠিক হবে না। বয়স কোনো ব্যাপার নয়।

আপনি আমার মনের কথাটা বলেছেন বেয়াই সাহেব।

একদিন যাব আপনার নীলগঞ্জ দেখতে।

ইনশাআল্লাহ। বড় খুশি হলাম বেয়াই সাহেব। বড় খুশি হলাম।

শাহানার বিয়েতে তিনি থাকতে পারবেন না বলে খুব দুঃখ করলেন কারণ কখনো সম্ভাব্য তাঁকে ব্যাংকক যেতে হচ্ছে। কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।

বুঝলেন যেসাই সাহেব, একদিন আগে জানতে পারলেও ব্যাংককের পক্ষে কানসেল করতাম। এখন তো সম্ভব না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

তাঁরা উঠে আসবার সময় রহমান সাহেব বেশ বিব্রত মুখেই একটি খাম এঁকি দিলেন। নরম স্বরে বললেন, এটা দিতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। নিজের হাতে কোনো একটা গিফট দেয়া দরকার ছিল। এত অল্প সময়ে কিছু কেনা সম্ভব নয়। আপনার মেয়েকে বলবেন সে যেন নিজের পছন্দমত ভালো একটা কিছু কেনে।

বাড়ি ফেরার পথেই খাম খোলা হলো। দশ হাজার টাকার একটা ক্রসড অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হোসেন সাহেব ভেবেছিলেন চেক দেখে মনোয়ারা রেগে যাবে। ক্যাট ক্যাট করে বলবেন, এত বড় সাহস আমাকে টাকা দেখাচ্ছে! টাকার গরম আছে।

আচর্যের ব্যাপার-সে রকম কিছু হলো না। মনোয়ারা একটি কথাও বললেন না। ঐ টাকায় শাহানাকে কিছু কিনে দেয়া হলো না। পুরোটাই খরচ হলো বিয়েতে। আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হল। খাবারের মেনুতে আগে টিকিয়া ছিল না এখন টিকিয়া এবং দৈ-মিষ্টি যোগ হলো। ছেলেকে যে আংটি আগে দেবার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো একটা আংটি কেনা হলো। মনোয়ারার ইচ্ছা ছিল স্যুটের কাপড় আরেকটু ভালো দেয়। কিন্তু আগেই কাপড় কিনে দরজির দোকানে দিয়ে দেয়া হয়েছে বলে সেটা সম্ভব হলো না।

শাহানা বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব সহজভাবেই পার করল। মনোয়ারা ভেবেছিলেন মেয়ে কেঁদেকেটে বিশ্রী একটা কাণ্ড করবে। সে রকম কিছু হলো না। শাহানার আচরণ সহজ এবং স্বাভাবিক। একবার শুধু নীলুকে বলল, ভাবী আনিস তাইলে একটু ডেকে আনবে, কথা বলব।

নীলু বিরক্ত স্বরে বলল, এখন ওর সঙ্গে কথা বলবে মানে? কি কথা?

তেমন কিছু না। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করেছে কি না।

ঐ সব নিয়ে ভোমাকে ভাবতে হবে না।

আচ্ছা যাও ভাবব না।

শাহানা মিষ্টি করে হাসল। বিয়ের সাজে আজ তাকে তেমন সুন্দর লাগছে না। কেমন যেন জ্বরজ্বং দেখাচ্ছে। গা ভর্তি গয়না। ফুলে-ফেঁপে আছে জমকালো শাড়ি। ঠোটে কালচে রঙের লিপস্টিক। একেবারেই মানাচ্ছে না। একদল মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। এরা অকারণে হাসছে। এদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে শাহানা। এক একবার হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। দৃশ্যটি কেমন যেন ভালো লাগে না। নীলু এক সময়ে শাহানাকে একে পাশে নিয়ে নিচু গলায় বলল, এত হাসছে কেন?

হাসির গল্পগুজব হচ্ছে তাই হাসছি। কেন ভাবছি আমার হাসায় কোনো বাধা আছে?

শাহানার গলার স্বরও যেন অন্য রকম। কঠিন এবং কিছু পরিমাণে কর্কশ। নীলু আর কিছু বলল না। শাহানা ফিরে গিয়ে আরো শব্দ করে হাসল।



দিয়ের প্রথম কিছুদিন ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। অনেকগুলি ঘটনা একসঙ্গে এবং দ্রুত ঘটে। অনেকটা বপু দৃশ্যের মতো। নিজের জীবনেই ঘটছে অথচ যেন নিজের জীবনে ঘটছে না। এটা যেন অন্য কারো জীবন।

দিয়ের রাতটি নিয়ে শাহানার অনেক রকম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। না জানি কি হয়, না জানি কি ঘটে। বাসররাত নিয়ে কত রকম গল্প সে বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছে। কিছু কিছু জটিল মিষ্টি। বার বার শুনেই ইচ্ছে করে। গল্পের বইয়েও এই রাতের কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। অপরাধিতায় কি সুন্দর বর্ণনা। অপূর সঙ্গে তার স্ত্রীর প্রথম দেখা। ছোট ছোট কথা বলছে দু'জনে। কত দ্রুত বন্ধুত্ব হচ্ছে দু'জনের মধ্যে। আবার সম্পূর্ণ অন্য জীবনের গল্পও আছে। নারী জীবনের চরম অবমাননার গল্প। গ্রানি ও পরাজয়ের গল্প। লম্বা লম্বা ভালোবাসা নেই অন্য কিছু আছে।

শাহানার বেলায় এর কোনোটাই হলো না। জহির এলো রাত একটার দিকে। তার খুব কাছে মনে হল সে খুব বিবক্ত। জহিরের বড় বোনের গলা শোনা যাচ্ছে। খুব চোঁচিয়ে উঠছে কি যেন বলছে অন্য সবাই তাকে সামলাতে চেষ্টা করছে। বড় বরকমের কগড়া হচ্ছে। শাহানার একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি কি নিয়ে ঝগড়া? সে অবশি জিজ্ঞেস করল না। ঝাটে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার ঘুম পাচ্ছিল। আবার একই সঙ্গে মাথায় ব্যথা হচ্ছিল। ভোঁতা ধরনের ব্যথা। সারা দুপুর ঘুমুলে যেমন ব্যথা হয় তেমন।

জহির নিজে কিছু বলল না। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুতে লাগল। এই সময় বাইরের হেঁটে আরো বেড়ে গেল, মোটা পুরুখালী গলায় কে একজন বলছে, এসব খামি টলারেট করব না। যথেষ্ট টলারেট করেছি। তার পরপরই ঝনঝন করে কি যেন গাঙল। জহির বাথরুম থেকে বের হয়ে এসেছে। সে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিছু বলবে না বলবে না করেও শাহানা বলল, কি হয়েছে?

একটা পুরানো পারিবারিক ঝগড়া। উৎসবটুংসবের দিনে এই ঝগড়াগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আজ এসব শুনে দরকার নেই। পরে শুনব। তুমি থাকো কিছুক্ষণ একা, খামি এক্ষুনি সব মিটিয়ে দিয়ে আসছি। স্যারি এবাউট ইট।

অপেক্ষা করতে করতে কখন যে শাহানা ঘুমিয়ে পড়েছিল সে নিজেই জানে না। তাকে আর জাগায়নি। বিয়ের প্রথম রাতটি সে ঘুমিয়ে শর করে দিল। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। ভোরবেলা জেগে উঠে দেখে জহির পাশের টাচেরোয়ে বসে। অঘুম জনিত কারণে তার চোখ ঝলঝল করছে। জহির বলল, ঘুম ভালো হয়েছে শাহানা?

শাহানা জবাব দিল না।

তুমি এত ভক্তি করে ঘুমুছিলে যে জাগাতে মন চাইল না।

শাহানার খুব ইচ্ছে করল জিজ্ঞেস করে আপনি ঘুমুননি? জিজ্ঞেস করতে পা
লজ্জা লাগল।

জহিরের বড় বোনের নাম আসমানী। কাল রাতে যে মেয়ে এত কাণ্ড করে
ভোরে তাকে দেখে তা কে বলবে। খুব হাসিখুশি। যেন কিছুই হয়নি। শাহান
ধরে বাড়ি দেখাচ্ছে। হড়বড় করে কত কথা বলছে—

কত বড় বারান্দা দেখলে শাহানা? ফুটবল খেলা যায় তাই না? অনেকেই বলে
বড় বারান্দা একটা গুয়েটেজ। আমার তা মনে হয় না। ছোট বারান্দার বাড়ি
আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। তোমার আসে না?

না। আমার জীবন কেটেছে ছোট বারান্দার বাড়িতে।

এখানে কিছুদিন থাকলে আর ছোট বারান্দার বাড়িতে থাকতে পারবে না।
বন্ধ হয়ে আসবে। এসো শাহানা লাইব্রেরি ঘরটা তোমাকে দেখাই। তোমার তো
গল্পের বইয়ে খুব নেশা।

কে বলল আপনাকে?

কেউ বলেনি। একবার তোমাদের বাসায় গিয়ে দেখি বই পড়ছ আর চোখে আঁচল
শাহানা কিছু বলল না। আসমানী হাসতে হাসতে বলল, গল্প-উপন্যাসের
নাথিকাদের সুখ-দুঃখে যারা কাতর তারা সাধারণত নিজেদের সুখ-দুঃখের ব্যা
উদাসীন হয়। এ রকম হয়ো না। নিজের সুখ নিজে আদায় করে নেবে। বুঝতে পা
পারছি।

জহির অবশি খুবই ভালো ছেলে সুখ তুমি পাবে। যথেষ্টই পাবে এ নিয়ে স্বে
সঙ্গে এক লক্ষ টাকা বাজি রাখতে পারি। রাখবে বাজি?

শাহানা হেসে ফেলল। আসমানী প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, কাল রাতে বড় রকমের এ
ঝগড়া হয়েছে তুমি কিছু কিছু বোধহয় শুনেছ। জহির কি কিছু বলেছে?

না।

সত্যি বলেনি?

না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ও আচ্ছা। তুমি কি শুনতে চাও?

জি না আমি শুনতে চাই না।

আসমানী অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহজ স্বরে বলল, শুনতে
চাইলেও তুমি শুনবে। অন্য কারো কাছ থেকে শোনার চাইতে আমার কাছ থেকে
শোনো-ঝামেলাটা বাড়ি নিয়ে। এই বাড়ি আমি চাই কিন্তু বাবা আমাকে দিতে রাজি
টাকায় বাবার আরো দু'টি বাড়ি আছে, সে দু'টি বাবা জহিরকে দিয়ে দিক। তা
না। বাবা আমার কোনো কথাই শুনতে চাচ্ছে না। জহির যেমন তাঁর ছেলে আ
তেমন তাঁর মেয়ে। আমি তো নদীর পানিতে ভেসে আসিনি। তাই না শাহানা?

তা তো ঠিকই।

শোনো শাহানা, তোমার কাছে অনুরোধ পারিবারিক এই ঝামেলায় তুমি নিরপেক্ষ
থাকবে। এবং আমার মন খুব ছোট এইসব ভাববে না। আমার মন ছোট না। তবে আ

শাহানার ছেড়ে দেবার মেয়েও না। আই উইল কাইট টু দি লাস্ট। এসো তোমাকে শাহানার দেখাই। খুব সুন্দর বাগান।

বাগান সত্যিই খুব সুন্দর। দু'টি গোলাপ ঝাড় বাগান আলো করে আছে। শাহানা গুলি গুলি বলল, বাহ কি সুন্দর! আসমানী চাপা গলায় বলল, এই বাগানের প্রতিটি গোলাপ চারা আমার লাগানো। কোনটিতে করে ফুল ফুটল সব আমার ডাইয়েরিতে লাগানো আছে। এ বাড়িতে কারো বাগানের শখ ছিল না। এই শখ আমার। চল হাদে যাই, শাহানা কত ধরনের অর্কিড আছে। কত কষ্ট করে একেকটা জোগাড় করেছি। একবার শাহানা অনিতে গিয়ে দু'টি খারাপ লোকের পাশায় পড়েছিলাম। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি।

আসমানী ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। শাহানার খুব ভালো লাগল মেয়েটিকে। কথা বলল কি সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গি।

হাত ধরে ধরে হাঁটছে। যেন কত দিনকার পুরানো বন্ধু। অথচ এই মেয়েই কি কখনো গলায় কাল রাত্রে বগড়া করছিল। আজও হয়তো করবে। একজন মানুষের অনেকগুলি চেহারা থাকে। একটি চেহারার সঙ্গে অন্য চেহারার কিছু মাত্র মিল থাকে না।

শাহানা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল নতুন বাড়িতে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে। স্রোতের মতো লোকজন আসছে। সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলতে হচ্ছে। খানচরের ব্যাপার, যারা আসছে সবাই বিস্তবান। কেউ বিলেত ঘুরে এসেছে। কেউ এই সময়েরে আমেরিকা যাবে। একজন শাহানাকে বলল শাহানা যদি শপিং-এর জন্যে কোলকাতা যেতে চায় তাহলে যেন তাকে খবর দেয়। সেও সঙ্গে যাবে। কোলকাতা যাওয়া এখন যেন বাইতুল মুকাররাম বাজার করতে যাওয়া। শাহানা ধাঁধায় পড়ে গেল। বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করতে লাগল। সবচে' বিরক্ত করল দাড়ি-গোঁফওয়ালা বৃষক এক প্রৌঢ়। সে শাহানাকে ডাকছে আন্টি করে এবং বেশ উঁচু স্বরেই বলছে তার নেপ্সট ছবিতে আন্টিকে একটা রোল করতেই হবে। এরকম সুন্দর একটা চেহারা অথচ বাংলাদেশের লোক সেটা দেখবে না তা হতেই পারে না। যদি হয় তাহলে সেটা হবে ক্রাইম। ক্ষমার অযোগ্য একটা অপরাধ। কি কুখ্যাত লোকটির বলার ভঙ্গি অথচ কেউ রাগ করছে না। বরং মজা পেয়ে হাসছে। ঝুশি ঝুশি গলায় বলছে-দাও একটা রোল শাহানাকে। মনে হয় ভালোই করবে। সে ভাবে হাস করছে তাতে ভার্জিন ভিলেজ গার্ল হিসেবে চমৎকার ইওয়ারই কথা।

কোথায় ছিল শাহানা আর আজ সে কোথায়? পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনও বোধহয় বদলে যায়। এত ভালোবাসত গল্পের বই অথচ এখন বই নিয়ে বসার কথা মনেই হয় না। তবুও অচিন রাগিনী নামের একটা বই সে বের করেছে। পড়ছে কিন্তু মন লাগছে না। আগে একটি বই পড়া শুরু করলেই মনে হতো গল্পের নায়িকা আসক্ত সে। এ সব তার জীবনের ঘটনা। এখন মনে হচ্ছে না। উপন্যাসের নায়িকার জীবন এবং তার জীবন খালি। এত তাড়াতাড়ি মানুষ এত বদলে যায়। এই বাড়িতে কত মানুষ অথচ কেউ এর পরিবর্তন লক্ষ্য করছে না কেন? যে মানুষটি সবচে' কাছের ইওয়া উচিত সেই কেমন দূরে দূরে আছে। কি একটা মামলা নিয়ে ব্যস্ত। তাকে স্মৃতি চিটাগাং যেতে হবে। না গেলেই নয়। গত রাতে সে খুব আগ্রহ নিয়ে মামলার কথা বলল,

বুঝলে শাহানা, মামলাটা সম্পত্তি নিয়ে। হাজি নুরুল ইসলাম নামে এক বিরাট ধনী ব্যক্তি চিটাগাং-এ থাকেন। জন্মসূত্রে বাড়ি হচ্ছে ঢাকার বিক্রমপুর। মদ্রলোক অভ্যন্ত

ধার্মিক। এতিমখানা, হুল, কলেজ, মসজিদে বহু টাকা দেন। শুধু তাই না, তিনি একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ বাবা। ভদ্রলোক মারা যাবার পর একটা সমস্যা দেখা গেল চিটাগাংয়ের খারাপ পাড়ার এক মেয়ে তাঁর সম্পত্তির বিরাট এক অংশ দাবি করে যাচাকরুজু করে দিল। ভদ্রলোক নাকি তাকে দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। কাগজপত্র আছে, কেলেকারি অবস্থা। কেমন ইন্টারেস্টিং না?

হ্যাঁ।

তুমি কিন্তু তেমন ইন্টারেস্ট পাওনি। কেমন করে বুঝলাম বলো তো?

শাহানা চুপ করে রইল। জহির হাসতে হাসতে বলল, তুমি জানতে চাওনি আমি কোন পক্ষের হয়ে মামলায় নেমেছি। তা থেকেই বুঝলাম।

জহির শুরু করে হাসতে লাগল। কাউকে হাসতে দেখলেই হাসতে ইচ্ছে করে। শাহানাও হেসে ফেলল। জহির অবাক হওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলল, তুমি আবার হাসতেও জানো নাকি? অবাক করলে তো। আমি এক মেয়েকে জানতাম সে কিছুতেই হাসত না। যত হাসির কথা বলা হোক সে গম্ভীর হয়ে থাকত। শেষটায় রহস্য জানা গেল।

কি রহস্য?

হাসলে মেয়েটাকে খুব বাজে দেখাত।

সত্যি?

হ্যাঁ কাউকে কাউকে বাজে দেখায়। আগ্না শোনো শাহানা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? তুমিও আমার সঙ্গে চিটাগাং চলো।

আমি?

হ্যাঁ তুমি। চিটাগাং-এর কাজ শেষ করে তোমাকে নিয়ে নেপাল থেকে ঘুরে আসব। এই সময়টা নেপালে যাবার জন্যে ভালো নয়। তবু খারাপ লাগবে না। আমি কয়েকবার গিয়েছি। যাবে?

যাব।

তোমাদের বাসায় এখন কিছু জ্ঞানানোর দরকার নেই। নেপাল পৌঁছে সবার নামে একটা করে ভিউ কার্ড পাঠিয়ে দেবে। আইডিয়াটা কেমন? ভালো না?

হ্যাঁ ভালো।

এমন শুকনো মুখে বলছ কেন? হাসি মুখে বলো।

শাহানা হাসল। জহিরের সঙ্গে কথা বলতে তার বেশ ভালোই লাগছে। কে জানে এই লোকটির সঙ্গে তার জীবন হয়তো খুব খারাপ কাটবে না।

টেলম্যান, সফিককে ডেকে পাঠিয়েছে।

বেয়ারা দিয়ে ডেকে পাঠানো নয়-একটা মেটি নিয়েছে যার অর্থ দুপুর এগারোটায় আমার সঙ্গে দেখা করবে। জরুরি।

স্বাক্ষর কিছু তো মনে হচ্ছে না। সাধারণ কিছু হলে নোট পাঠাত না। নিজেই উঠে এসে পলত, সফিক আমার ঘরে এসো একসঙ্গে চা খাব। টি ব্রেক।

গতই দিন যাচ্ছে লোকটিকে সফিকের ততই পছন্দ হচ্ছে। ভীষণ বুদ্ধি। অফিস ম্যানজমেন্ট সম্পর্কে জলের মতো স্বচ্ছ ধারণা। শুধু অফিস ম্যানজমেন্ট নয় ম্যানুয়ালিইঞ্জিং, পাবলিক রিলেশন সবই তার নখদর্পণে। শুধু একটি সমস্যা, কারোই কাজ করার কোনো স্বাধীনতা নেই, সব কাজ সে একাই করছে। বিভাগীয় প্রধানদের এমন আর কিছু করার নেই।

শ্রমিক সমস্যা সে মোটামুটি ধামাচাপা দিয়েছে। পদ্ধতিটিও চমৎকার। শ্রমিকদের লগান নাবি ছিল-দু'টি ইন্দ বোনাস, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ি ভাড়া।

সে দু'টির জায়গায় তিনটি বোনাস দিয়ে দিল। যাতায়াত ভাতা দেয়া হলো না। ঠিক হলো বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে গাড়ি ওদের নিয়ে আসবে এবং দিয়ে আসবে। ওদের দানি ছিল মাসে পঞ্চাশ টাকা চিকিৎসা ভাতা, সেটাকে করা হলো পঁচাত্তর। মূল বেতনের বিশ ভাগ বাড়ি ভাড়া দেয়া হলো এবং ঘোষণা দেয়া হলো এক বৎসরের মধ্যে প্রতিটি শ্রমিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রমিকদের জন্যে অপ্রত্যাশিত বিজয়। তারা আন্দোলনের সাতজন মূল নেতাকে গলায় মালা দিয়ে কাঁধে করে নাচতে লাগল। তাদের বিজয় উল্লাসে বারবার শোনা গেল-শ্রমিক বন্ধু টলম্যান, জিন্দাবাদ। উৎসাহের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর পর দেখা গেল টলম্যান সাতজন শ্রমিক নেতাকে বরখাস্ত করেছে।

টলম্যান নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আমার আদেশের কোনোরকম নড়চড় হবে না। তোমাদের কথা আমি মেনে নিয়েছি। তোমরা আমার কথা মানবে। যদি না মানো, কারখানা বন্ধ করে চলে যাব। এই ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়েছে। একদিনের ছুটি তোমাদের দেয়া হলো। তোমরা চিন্তাভাবনা করো। একদিন কারখানা বন্ধ থাকবে। মন ঠিক করো, কাজ করবে কি করবে না। যে একদিন ছুটি দেয়া হলো সেই একদিন একটু কষ্ট করে খোঁজ নেবে অন্য কারখানায় শ্রমিকরা কি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। আচ্ছা এখন যেতে পারো।

পরব্ত সকাল নটায় যারা কাজে যোগ দেবে না তাদের চাকুরী বাতিল ধরা হবে। পদবর্তী সময়ে এই নিয়ে কোনো রকম দেন-দরবার চলবে না।

টলম্যান বাংলা জানে না। সে কথা বলল ইংরেজিতে। সফিককে অনুবাদ করে দিতে হলো। শ্রমিকরাও কথা বলছিল। সফিক তার ইংরেজি করে দিতে গেল টলম্যান ওকনো গলায় বলল, ওরা কি বলছে তা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমিই নেই। আমি কি বলছি তুমি শুধু সেটাই ওদের কাছে পৌছে দেবে।

আমার মনে হয় ওদের কথাও জানা থাকা ভালো।

শুধু তোমার মনে হলে তো হবে না আমারো মনে হতে হবে। আমার সে রকম মনে হচ্ছে না।

অফিসের রামেশ্বর বাবুরও চাকরি চলে গেল। এমন যে ঘটবে কেউ কল্পনাও করেনি। রামেশ্বর বাবু নিরীহ নির্বিরোধী মানুষ। কারো সাত-পাঁচে নেই। পানের কৌটা

নিয়ে অফিসে আসেন। একটু পর পর পান খান। শায়ের কাছে পিকদানিতে।
ফেলেন। একদিন টলম্যান তাঁকে ডেকে পাঠান। হাসিমুখে বলল, ভালো আছেন?

জি স্যার।

দু'দিনের ক্যাজুয়েল নিয়েছিলেন অসুখ সেরেছে?

জি স্যার।

কি অসুখ?

আমার বড় নাভনির আমাশা হয়েছিল।

ও আচ্ছা। নাভনির অসুখ, আপনার নিজের কিছু না?

জি না স্যার।

আপনি দু'দিনের ছুটি নিয়েছিলেন কিন্তু এসেছেন চারদিন পর। বাড়তি দু'দি
ব্যাপারে কিছুই করেননি। মনে হয় ভুলে গিয়েছিলেন।

জি স্যার।

অফিস নটার সময় শুরু হয় কিন্তু আপনি কোনোদিন সাড়ে দশটার আগে আসে
পারেন না।

অনেক দূরে থাকি স্যার, রামপুরা।

এখন তো অফিসের বাস যায়। দূরে থাকলেও অসুবিধা হবার কথা নয়।

এত সকালে ভাত রান্না হয় না স্যার।

আপনি বাড়ি যান খুব সকাল সকাল। ঠিক না?

রামেশ্বর বাবু কোন জবাব দিলেন না। প্রচুর ঘামতে লাগলেন। টলম্যান বললেন
গত এক মাসে আপনি কখন অফিসে এসেছেন কখন গিয়েছেন সব লিখে রেখেছি। এ
কাগজে আছে। নিন পড়ে দেখুন।

রামেশ্বর বাবু কাগজের উপরে চোখ বুলিয়ে গেলেন। কিছু পড়লেন বলে বলে হলো
না।

ঠিক আছে এখন যেতে পারেন।

তিনি নিজের চেয়ারে এসে পানের কৌটা খোলামাত্র টলম্যানের চিঠি চলে এলো
যার বক্তব্য হচ্ছে এই অফিস মনে করছে তোমার চাকরি অফিসের কল্যাণে আসছে না।
সম্ভবত অফিসের কাজে তোমার মন বসছে না। কাজেই ...। সার কথা চাকরি শেষ।

রামেশ্বর বাবুর জন্যে সুপারিশ নিয়ে অনেকেই গিয়েছিল টলম্যানের কাছে। সেই
অনেকের একজন হচ্ছে সফিক। টলম্যান হাসিমুখে বলেছে-দয়া দেখাবার কথা তুমি
বলছ কেন? দয়া দেখাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি। এটা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়।
আমরা এ দেশে টাকা কামাতে এসেছি। এই সহজ সাধারণ সত্যটি তোমরা যত
তাড়াতাড়ি বুঝতে পারো ততই ভালো।

রামেশ্বর বাবু অনেকদিন এই কোম্পানির জন্যে কাজ করেছেন। কোম্পানির তাঁর
প্রতি দায়িত্ব আছে।

উনি বিনা বেতনে চাকরি করেননি। কাজেই কোম্পানির দায়িত্বের প্রশ্নটা কেন
আসছে? এই ব্যাপারটি নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না। তুমি অন্য কোন প্রসঙ্গ
নিয়ে আলাপ করলে করতে পার। তোমাদের দেশের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা কোনটি
বলতো? সুন্দরবনের কথা খুব শুনি। কিভাবে যাওয়া যায়?

টলম্যানের নোটটি সফিকের সামনে। এগারোটা বাজতে এখনো দশ মিনিট সফিক
কাজে। তার মধ্যে এক ঘরনের অস্বস্তি কাজ করছে। যার কোন কারণ নেই। সে চা
না বললেও হতো। টলম্যানের কাছে যাওয়া মানেই প্রথম এক কাপ চা
এই চা সে নিজে বানায়। পানি গরম করা থেকে দুধ-চিনি মেশানো পর্যন্ত সে
করে। অধস্তন যে মানুষটির জন্যে চা বানানো হচ্ছে সে অস্বস্তি বোধ করে।
এই বোধ হয় অফিস ম্যানেজমেন্টের একটা অঙ্গ।

‘এই টলম্যান চায়ের কথা বলল না। ফুর্তিবাজের তসিতে বলল, দুপুরে আজ তুমি
কাগজ সঙ্গে লাঞ্চ করবে। অসুবিধা আছে?’

না স্যার।

কোনো একটা ভালো রেস্তোরাঁয় যাই চলো। তুমি কি মদ পান করো?

না।

ম্মিও করি না তবে কোনো স্পেশাল অকেশন হলে বানিকটা করি।

আজ কি কোন স্পেশাল অকেশন?

না। স্পেশাল কিছু না। আর দশটা দিনের মতো সাধারণ একটা দিন। ভালো
কি আছে এখানে? মেক্সিকান ফুড পাওয়া যায়?

না। তবে বড় হোটেলগুলি মাঝে মাঝে মেক্সিকান নাইট, স্পেনিশ নাইট এইসব
করা তখন পাওয়া যায়।

চলো ভালো একটা চায়নিজ রেস্তোরাঁতে যাওয়া যাক।

আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

হ্যাঁ বলব। যেতে যেতে বলব।

যেতে যেতে যে কথাগুলি টলম্যান বলল, সফিক তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

প্রায় দু’বছর আগে আগস্ট ফিফটিস্থ এক ব্যাচ অমুখ তৈরি হয়েছিল যা নষ্ট হয়ে
মাওয়ার কারণে বাতিল করে দেয়া হয়। তোমার মনে আছে?

মনে নেই। কাগজপত্র দেখতে হবে।

কাগজপত্র আমার সঙ্গে আছে তুমি দেখতে পারো। তুমি ছিলে প্রোডাকশন
সুপারভাইজার, তোমার সই আছে।

সই থাকলে ঠিক আছে।

না ঠিক নেই। কারণ কারখানার লগ বুক ঐ দিন ঐ তারিখে কোনো অমুখ তৈরির
কথা নেই। ঐ দিন কোনো অমুখ তৈরি হয়নি। নষ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।

সফিক তাকিয়ে রইল। টলম্যান ঠাণ্ডা গলায় বলল, তার তিন মাস পরে তুমি আশি
মাসের টাকার একটা চেক ইস্যু করেছ স্টোরের দু’টি এয়ার কুলার কেনার জন্যে। সেই
এয়ার কুলার কেনা হয়নি চেক কিন্তু ভাঙানো হয়েছে।

সফিক কিছু বলল না। টলম্যান বলল, ঐ মাসেই আরমিস দশকের ভেতর ‘মর্ডনা
নামের এক এজেন্সিকে গাড়ি কেনা বাবদ অগ্রিম এক লক্ষ টাকা দেয়া হয় ফরেন
কন্সলিডেট-ই হাজার ডলার। মর্ডনা কার বলে কেমনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। যে
টাকানা দেয়া হয়েছে ঐ ঠিকানারও কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি কিছু বলবে?

না।

কাগজপত্র সব নিয়ে এসেছি দেখতে পারো। প্রয়োজন বোধ করলে আমায় ক-
ডিসকাস করতে পারো। তুমি কি দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাও?

না। অস্বীকার করার পথ কোথায়?

দ্যাটস রাইট, অস্বীকার করবার পথ নেই। এটা একটা জটিল চক্রান্ত। স্বাভা-
ধারণা তোমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। চিংড়ি মাছটা খাও, ভালো বানিয়েছে। এফ-
স্পাইসি না করলেও পারত। আমার তো জীব পুড়ে গেছে।

টলম্যান ক্রমালে মুখ মুহল। চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা কোটের পকেট থেকে মুখ ব-
একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল সফিকের দিকে। সহজ গলায় বলল, সার্ভার। জ-
হ্যাত টু বি ক্রুয়েল ওনলি টু বি কাইড। তোমাকে আপাতত সাসপেন্ড করা হলো। প-
তদন্ত হবে। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো তদন্ত হবে নিরপেক্ষ। চিঠিটা খুলে পড়ো। প-
নিয়ে বসে আছ কেন?

সফিক চিঠি খুলল, মূল সাসপেনসন অর্ডারের সঙ্গে পেনসিলে টলম্যানের সেক-
একটা নোট। নোটের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি খুবই দুঃখিত। এই ব্যাপারটা সহজভাবে বি-
চেষ্টা করো।

সফিক অসময়ে বাড়ি ফিরেছে। নীলুও সকাল সকাল এসেছে। তার শরীর ভাঙে-
লাগছিল না-ছুটি নিয়ে এসেছে। সফিককে দেখে হঠাৎ তার মনটা ভালো হয়ে পেল।
সে খুশি খুশি গলায় বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল বাসায় গিয়ে তোমাকে দেখব।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আচ্ছা চলো না একটা কাজ করি। কোথাও বেড়াতে যাই, যাবে?

নীলুকে অবাক করে দিয়ে সফিক বলল, চলো যাই। কোথায় যেতে চাও?

সভিা যাবে?

হ্যাঁ যাব।

নীলু তৎক্ষণাৎ চুল বাঁধতে বসল। সফিক যাতে মত বদলাবার সময় না পায়। আলো-
এরকম হয়েছে, বেড়াতে যাবার জন্যে রাজি হয়ে শেষ মুহূর্তে বলেছে আজ না গেলে বা-
না? শরীরটা কেমন যেন ম্যাক্সমাজ করছে।

সফিক পা ঝুলিয়ে খাটে বসেছে। তার মুখ দেখে মনের আঁচ পাওয়া যায় না। ত-
নীলুর মনে হলো সফিক কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত। নীলু বলল, শাহানার কাণ্ড শুনেছ?

না। কি কাণ্ড?

আজ জহিরকে নিয়ে কাঠমাতু চলে গিয়েছে। কাউকে কিছু বলেনি। সফিক, টুনী
আর বাবলুকে নিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে শুনে কিছুক্ষণ আগে এয়ারপোর্ট রওনা হয়েছে।

ভালোই তো।

আমাদের কাউকে কিছু জানান না কেন কে জানে। আসক জহির শুকে ধরব শত
করে।

টুনী, বাবলু ওরা কেথায়?

ছাদে। এখন ওদের ডাকাডাকি করবে না। কিছুক্ষণ দেখলে আর রক্ষা থাকবে না,
সঙ্গে যাবার জন্যে হেঁচো শুরু করবে। তুমি কি এক কাপ চা খাবে?

না।

খান্না শোনো তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত নাকি? কেমন যেন অন্য বকম
খান্না তোমাকে?

না চিন্তিত না।

খান্না শাড়িতে কি আমাকে ভালো দেখাচ্ছে?

হ্যাঁ দেখাচ্ছে। কোথায় যাবে কিছু ঠিক করবেছ?

আমার এক বান্ধবীর বাসা আছে নয়া পল্টনে, যাবে?

চলো যাই।

খান্না পল্টনের বাসায় নীলুর বান্ধবীকে পাওয়া গেল না। তারা ঘর ভালা দিয়ে
খান্না ঘন গিয়েছে। নীলুর অসম্ভব মন খারাপ হলো। সফিক বলল, অন্য কোথাও
খান্না। তোমার আরো বান্ধবী আছে নিশ্চয়ই।

খান্না এমনি চলো রাস্তায় একটু হাঁটি।

সফিক তাতেও রাজি। তারা কিছুক্ষণ হাঁটল। নীলু একটি মিষ্টি পান কিনল। রাস্তায়
নীলু করে বেলি ফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে। নীলুর একটি কিনতে ইচ্ছা হচ্ছে আবার
একটি লজ্জাও লাগছে। আশ্চর্য কাণ্ড নীলুকে অবাক করে দিয়ে সফিক বেলি ফুলওয়ালার
দিকে এগিয়ে গেল। কত সামান্য ব্যাপার অথচ এতেই নীলুর হৃদয় আবেগে পূর্ণ হলো।
তখন মনে হতে লাগল এই পৃথিবীতে তার মতো সুখী মেয়ে আর একটিও নেই। তার
ইচ্ছা করছে সফিকের হাত ধরে হাঁটতে। আজকাল ছেলেমেয়েরা কেমন সুন্দর হাত
ধরাধরি করে হাঁটে। দেখতে ভালো লাগে। দিন বদলে যাচ্ছে। নতুন দিনের সবই যে
খান্না তা না কিন্তু কিছু কিছু জিনিস ভালো।

সফিক বলল, আরো হাঁটবে?

তোমার হাঁটতে ভালো লাগছে না?

লাগছে।

জানো আজ শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে সকাল সকাল চলে এসেছিলাম, এখন
এত চমৎকার লাগছে।

সফিক হাসল।

হাসলে এই গম্ভীর মানুষটাকে এত সুন্দর লাগে। অথচ এই লোকটি একেবারেই
হাসে না।

নীলু নরম সুরে বলল, আমার একটা কথা শুনবে?

হ্যাঁ শুনব।

চলো না আজ আমরা বাইরে কোথাও যাই। কোনো নিরিবিলা রেষ্টুরেন্টে যাবে?

চলো যাওয়া যাক।

তোমার মন থেকে ইচ্ছে না করলে থাক।

সফিক হেসে বলল, আমার ইচ্ছে করছে। টাকা আছে তো তোমার কাছে? আমার
মানিব্যাগ ফাঁকা।

টাকা আছে। বেশি কিছু তো আর খাব না।

রেস্টুরেন্টে বসে নীলুর একটু খারাপ লাগল; বেচারি টুনীকে ফেলে একা একা

খাওয়া। সে হয়তো না খেয়ে বাবা-মায়ের জন্য বসে থাকবে। নীল বলল, কিছু খাবার নেই, চলো বাসায় চলে যাই। বরং দু'টা কোন্ড্রিংকের অর্ডার দাও নতুন আবার কি ভাববে।

সফিক মেনু দেখে দেখে একগাদা খাবারের অর্ডার দিল। নীল বলল, এত কিছু টুর্নী খাবে। প্যাকেটে করে বাসায় নিয়ে যাব।

এটা ভালোই করেছে, টাকায় শর্ট পড়বে না তো? আমার কাছে তিনশ টাকাও শর্ট পড়লে কোট খুলে রেখে দেব।

বলতে বলতে সফিক শব্দ করে হাসল। খাবারগুলি চমৎকার। কিংবা কে। অনেকদিন পর বাইরে খেতে এসেছে বলেই হয়তো এত ভালো লাগছে। মাঝে। এমন এলে হয়। তা কি আর সম্ভব হবে। কতগুলি টাকা আজ দিতে হবে। হিসে টাকা।

সফিক বলল, চূপচাপ খাচ্ছ কেন কথা বলো।

কি বলব?

মজার মজার কিছু গল্প বলো।

মজার গল্প বুঝি আমি জানি? তুমি বরং একটা গল্প বলো।

সফিক কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। ক্রমাল দিয়ে মুখ মুছে অন্যমনস্ক ভঙ্গি বলল, খেতে ইচ্ছা করছে না।

কেন?

জানি না। শরীরটা বোধহয় খারাপ।

শরীর খারাপ তাহলে এলে কেন?

তোমার সঙ্গে কখনো আসা হয় না। সুযোগ হলো একটা।

নীল দেখল সফিক আবার হাসছে। কি চমৎকারই না তাকে লাগছে। যে কালারে এই কোর্টটায় কি সুন্দর মনিয়েছে। নীলুর খুব ইচ্ছা করছে সফিকের কোলে একটা হা রাখে। মজার কোনো একটা গল্প বলে সফিককে আবার হাসিয়ে দেয়। তার চোখ ভিলে উঠতে শুরু করেছে।

শাহানার এই প্রথম প্রেনে চড়া।

আকাশে উড়বার মতো বিরাট একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে কিন্তু তার জন্যে যতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত ততটা উত্তেজিত সে হচ্ছে না। অথচ প্রথম ট্রেনে চড়ার উল্লাস তার এখনো মনে আছে।

প্রথম প্রেনে চড়া সেই বকমই তো হওয়া উচিত। তা না কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে। তার সবচেয়ে মনে খারাপ হলো প্রেনের সাইজ দেখে। এত ছোট? সত্যি সত্যি পাখির মতো লাগছে। শাহানা বলেই ফেলল, প্রেন এত ছোট হয়।

হাসতে হাসতে বলল, ছোট কোথায় দু'শ ত্রিশ জন যাত্রী যেতে পারে। বেশ

দেকে দেখছ তো তাই এরকম লাগছে।

দু'খ থেকে তারা দেখছে না। বসে আছে ডিপারচার লাউঞ্জ। কি একটা সমস্যা

। পেন ছাড়তে এক ঘণ্টা দেরি হবে। সময় কাটানোর জন্যে চা-টা খাচ্ছে যাত্রীরা।

বলল, কিছু খাচ্ছ না কেন শাহানা?

লাগছে না। টোক গিলতে পারছি না।

টেক টেনসিলাইটিস নাকি?

না। কাঠমন্ডু না গেলে কেমন হয় বলো তো? আমার একটুও যেতে ইচ্ছে

না।

এখন পৌছে দেবো ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না। তোমার কি পেনে চড়তে ভয়

হয়?

হ্যাঁ।

ওটা কাটতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে। পেনে ভ্রমণ হচ্ছে পৃথিবীতে সবচে'

লম্ব ভ্রমণ।

শাহানা বলল, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।

দু'টা প্যারাসিটামল খাও। ব্যাগে আছে না? আমি পানি এনে দিচ্ছি।

তুমি পানি না, জহির একটা পানও নিয়ে এসেছে। মাইকে বলা হচ্ছে ফ্লাইট নাথার

১০৭, কাঠমন্ডুগামী যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে....অদ্ভুত এক ধরনের উচ্চারণ।

অর্ধেক যাত্রী একজন মানুষ কথা বলছে। শাহানার মনে হলো এই কথাগুলি সহজ

আবদিকভাবে বলা যায় না?

তোমরা গ্যাস তো বেশ গরম মনে হচ্ছে শাহানা?

হ্যাঁ আসছে বোধহয়।

তোমার খুব বেশি খারাপ লাগলে না হয় বাদ দেয়া যাক। এখন টিকিট ক্যানসেল

হলে অবশিষ্ট পয়সাকড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না।

শাহানা যন্ত্রের মতো বলল, ক্যানসেল করতে হবে না। চলো যাই।

শাহানা বসেছে জানালার পাশে কিন্তু একবারও জানালা দিয়ে তাকাতে ইচ্ছা করছে

না। তার কেবলি ভয় এই বুঝি সে বমি করে ফেলবে। বমি আসার আগে আগে মুখে

কম টক টক স্বাদ চলে আসে সে রকম চলে এসেছে। তার সামনের এক ভদ্রলোক

শাহানাটিকে ধরিয়েছেন, কি কুৎসিত কটু গন্ধ। শাহানার ইচ্ছে করছে এই টেকো শৌকটোর

পাশে ঠাস করে একটা চড় মারতে।

জহির বলল, খুব বেশি খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ।

প্রায় এসে গেছি। পেন নামতে শুরু করেছে। কান ভেঙে যাচ্ছে না?

হ্যাঁ করছে।

টোক গিল, কমে যাবে।

টোক গিলতে পারছি না।

তাকাও জানালা দিয়ে। দ্যাখো পেনের চাকা নামছে। তুমি তো কিছুই দেখে
শাহানা ক্লাস্ত গলায় বলল, পানি খাব।

জহির হাত ইশারায় একজন এয়ার হোটেসকে ডাকল। কোনো লাভ
এক্ষুনি পেন নামবে। ওরা তাই নিয়েই ব্যস্ত। নো স্মোকিং সাইন বারবার জুলা
তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সমানে সিগারেট টানছে। জহির এয়ার সেইফট
একটি প্রবন্ধ পড়েছিল। নিউজ উইকে। সেখানে বলা হয়েছে-এশিয়া মহাদেশে
যাত্রীরা বিমান ভ্রমণের আইনকানুন ভঙ্গ করে এক ধরনের মজা পায়। যে সা
বেন্ট বাধার কথা সে সময় সিট বেন্ট খুলে ফেলে। নো স্মোকিং সাইন দেখলে
সিগারেটের পিপাসা পেয়ে যায়। তারা সবচে' পছন্দ করে বিমানের করিডোরে
যেন এটা পেন নয় বাস।

পেন বেশ বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে ভূমি স্পর্শ করল। জহির হাসিমুখে বলল
গেছি শাহানা। হোটেলে পৌছেই ডাক্তার ডাকব।

বড় হোটেলের নিয়মকানুনগুলি বেশ চমৎকার। দশ মিনিটের মাথায় ডাক্তার
উপস্থিত। কুড়ি মিনিটের মাথায় এলেন খোদ হোটেলের ম্যানেজার। পরনে হা
কড়া লাল রঙের স্পোর্টস শার্ট। মুখ ভর্তি হাসি। সে হাসিমুখে যে কথা বলল
জহিরের মুখ শুকিয়ে গেল। ঝগিনীকে হোটেলে রাখা যাবে না। হাসপাতালে
করাতে হবে। জহির বলল, পেশেন্টকে হোটেলে রেখে চিকিৎসা হবে না?

না।

কেন?

কারণ হোটেল কোনো হাসপাতাল নয়।

তাহলে আমি অন্য কোনো হোটেলে চেষ্টা করতে চাই যেখানে আমাকে আমার
সঙ্গে থাকতে দেবে।

নতুন বিয়ে?

হ্যাঁ।

হানিমুন?

হ্যাঁ বলতে পারো। লেট হানিমুন।

আমার সমস্ত সহানুভূতি তোমার জন্যে। কিন্তু আমার উপদেশ শোনো। আমি
ব্যবস্থা নিচ্ছি তা আমাকে নিতে দাও। বিশ্বাস করো আমি অভ্যস্ত বুদ্ধিমান স্বাক্ষর।
যত ঠাণ্ডা মাথায় একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারি কোনো রাষ্ট্রপ্রধানও পারেন।
এ্যাবলুপ এসে গেছে, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যাও, তাকে ভর্তি করিয়ে ফিরে এসে।

জহির চুপ করে রইল। ম্যানেজার হাসিমুখে বলল, কি আমার কথায় আপসেট
নাকি? আমার পরামর্শ কিন্তু চমৎকার। স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে ফিরে এসে একটা
শাওয়ার নাও। এবং দুটি বিয়ার খাও।

জহিরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। শাহানা প্রায় অচেতন। জ্বর একশ
পয়েন্ট পাঁচ। জহির শুকনো গলায় বলল, খুব বেশি খারাপ লাগছে? শাহানা কাতর গলা
বলল, খুব খারাপ লাগছে।

হাসপাতালটির অবস্থা খুবই মলিন। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, ফিনাইলের
বুনায়ে কেমন একটা টক গন্ধ। একটা ভেডবডি পড়ে আছে বারান্দায়। কেউ তার
দেবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। নীল রঙের ডুমো মাছি মৃত মানুষটির উপর
হামাগু উড়ছে। জহিরের অন্তরাখা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। ডাক্তার উদ্দলোক হেসে
বললেন, অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

না। কিছু ঘাবড়ে গেছি তো বটেই।

বাংলাদেশের হাসপাতালগুলি কি এর চেয়ে ভালো?

হ্যাঁ ভালো, অনেক ভালো।

খানি যখন ছিলাম তখন কিন্তু ভালো ছিল না।

আপনি বাংলাদেশে ছিলেন?

হ্যাঁ। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছি। আমাদের দেশে মেডিকেল
পড়ানো নেই। ডাক্তারী পড়তে হলে আমাদের বাইরে যেতে হয়।

কী ভর্তির ব্যাপারটি অতি দ্রুত শেষ হলো। শাহনাকে নিয়ে যাওয়া হলো
কলকাতা। জহির বলল, আমি কি ঐ কেবিনে রাতটা কাটাতে পারি?

না। পারেন না।

হাসপাতালে কোথাও অপেক্ষা করতে পারি?

না নিশ্চয়ই পারেন। আমার এই ঘরেই বসতে পারেন। তার কি কোনো প্রয়োজন
হবে? আপনার কষ্ট হবে। প্রচণ্ড মশা।

না আমার কষ্ট হবে না।

আপনার রাতের খাওয়া কি হয়েছে?

না হয়নি।

আমি কিছুক্ষণ পর পাশের একটি হোটেলে যেতে যাব। পাশেই একটা ভালো
হোটেল আছে। ইস্কে করলে আপনি আসতে পারেন।

জহির বলল, তার আগে জানতে চাই আমার স্ত্রীর চিকিৎসা কি শুরু হয়েছে?

এখনো শুরু হয়নি, হবে। স্ট্রোট কালচার করা হচ্ছে। হানিমুনে এসেছেন তাই না?
হ্যাঁ।

আপনার মনে ভয় ঢুকে গেছে যে হয়তোবা আপনাকে একা ফিরতে হবে। তাই না?
হ্যাঁ তাই।

ভয় পাবেন না, খুবই সামান্য ব্যাপার।

ডাক্তার ডান হাতে জহিরের কাঁধ স্পর্শ করলেন। জহিরের মনে যে ভয় ভয় ভাব
হলো তা পুরোপুরি কেটে গেল। সে ভৎসনাৎ সিদ্ধান্ত নিল—সারারাত এখানে বসে মশার
কাণ্ডে খাওয়ার কোন মানে হয় না। হোটেলে ফিরে একটা শাওয়ার নেয়া যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট যাওয়া হলো না। জহির রাতটা হাসপাতালেই কাটিয়ে দিল।
চায়ের একটি হোটেলের খোঁজ ডাক্তার সাহেবই করেছিলেন। প্রচুর দুধ ও গরম মসলা
দেওয়া অদ্ভুত ধরনের চা। ঝাঁঝালো খানিকটা তেজস্বী পানের স্বাদ। যেতে ভালোই লাগে।

শাহনাকে দেখতে গেল ভোর নটায়। জুব্বকমে গেছে। তবে এক রাতেই কেমন

রোগা লাগছে শাহানাকে। গালের হাড় বেরিয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি।
কি অবস্থা?

শাহানা হাসল।

এখন কি একটু ভালো লাগছে?

লাগছে।

একটু ভালো না অনেক ভালো?

অনেক ভালো।

তাহলে একটু হ'সো আমি দেখি।

শাহানা হাসল। জহির পাশেই চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, আমি।
হাসপাতালেই ছিলাম।

জানি।

কিভাবে জানলে? কেউ বলেছে?

না কেউ বলেনি। আমার মনে হয়েছে।

এখন আমি চলে যাব আবার বিকেলে আসব।

আচ্ছা।

তোমার জন্যে কিছু ভিউকার্ড নিয়ে এসেছি। শরীরটা যদি ভালো লাগে।
কার্ডগুলিতে নাম-ঠিকানা লিখে রেখো বিকেলে আমি পোষ্ট করে দেব।

আচ্ছা।

অসুখের কথা কিছু লেখার দরকার নেই। সবাই চিন্তা করবে। অবশ্যি অসুখ
কিছু হয় নি। প্রোট ইনফেকশন। ডাক্তার সাহেব বললেন পরশুর মধ্যে রিলিজ করে
পারবেন। পরশু পর্যন্ত একটু কষ্ট করো।

আমার কষ্ট হচ্ছে না।

তোমার এখন থেকে হিমালয় দেখা যায়। উঠে বসে জানালা দিয়ে তা
হিমালয় দেখবে।

আমার হিমালয় দেখতে ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছা না করলেও দেখো। এসো তোমাকে হাত ধরে দাঁড়া করাই-এ যে
দেখছে না? ওর নাম অনুপূর্ণা। সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর।

তুমি সুস্থ হয়ে উঠলেই তোমাকে পোখরা বলে একটা জায়গায় নিয়ে যাব।
মতে পোখরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে' সুন্দর জায়গা।

শাহানা হাই তুলল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল।

তোমরা ঘুম পাচ্ছে শাহানা?

হ্যাঁ পাচ্ছে।

তাহলে ঘুমাও। ইন্টারেস্টিং একটা এ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে গেল তাই না?

হ্যাঁ।

ঢাকায় গিয়ে গল্প করতে পারবে। তুমি ঘুমাও আমি পাশে বসে আছি।

তোমাকে বসতে হবে না, তুমিও বিশ্রাম করো। রাত জেগে যা বিশ্রী তে
দেখাচ্ছে।

গুণ বিপ্রী?

৷ খুব বিপ্রী।

শাহানা মিষ্টি করে হাসল। হাসপাতালের ধবধবে সাদা বেডে কি সুন্দর তাকে
জাগতে। মুখের উপর তেহরা করে রোদের আলো এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে এটি স্বপ্নে
দেখা একটি ছবি। বন্দি রাজকন্যা হয়ে আছে। একুণি জেগে উঠবে।

গতকাল দিন জহির ঘুমিয়ে কাটল। দুপুরে উঠে দুটি স্যান্ডউইচ মুখে দিয়ে আবার
ঘুম। সেই ঘুম ডাঙল সন্ধ্যায়। তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বেচারি শাহানা। অপেক্ষা
করে আছে নিশ্চয়ই। খুবই অন্যায় হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ঘুমিয়ে পড়াটা উচিত হয়নি।
সন্ধ্যার পর এরা ফিমেল ওয়ার্ডে পুরুষদের যেতে দেয় না। নিয়মটি হয়তো বিদেশিদের
জানো। কারণ কাল বেশ কিছু পুরুষদের সে চুকতে দেখেছে। এরা সবাই যে
হাসপাতালের কর্মচারী তাও মনে হয়নি।

গতকালের ডাক্তার ভদ্রলোকের নাম জানা হয়নি। আজ হয়তো তার ভিউটি নেই।
গতকাল দু'রাত নাইট ডিউটি না থাকারই কথা। আজ হয়তো আছে বদমেজাজি কোনো
ডাক্তার যে কোনো কথাই বলবে না।

আগের ডাক্তারকেই পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি রুগিনীর কাছে যাবার কোনো ব্যবস্থা
করতে পারলেন না। কয়েক দিন আগে ফিমেল ওয়ার্ড নিয়ে লেখা নানান কেজ্জাকাহিনী
কোন এক কাগজে ছাপা হয়েছে তারপর থেকে এই কড়াকড়ি। ডাক্তার সাহেব বললেন,
“আপনি বসুন আমি খবর এনে দিচ্ছি। তবে আপনার স্ত্রী বেশ সুস্থ এইটুকু বলতে পারি।
আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনি বসুন। আমি আসছি।”

ভদ্রলোক মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এলেন। হাসি মুখে বললেন, কাল সন্ধ্যায়
আপনার স্ত্রীকে বিলিঙ্গ দেয়া হতে পারে। জ্বর রেমিশন হয়েছে।

থ্যাংক ইউ।

এই ভিউকার্ডগুলি তিনি দিলেন। আপনাকে পোস্ট করতে বলেছেন।

চারটা ভিউকার্ড। প্রতিটিতেই কয়েক লাইনের চিঠি। নীলুর জন্যে একটি,
শারমিনের জন্যে একটি। বাবা ও মায়ের জন্যে একটি এবং চতুর্থটি আনিসের জন্যে।
চোখের বিন্দিত হয়ে আনিসের ভিউকার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে গোটা গোটা
লেখা—“আনিস ভাই, আমার খুব অসুখ করেছে।”

লম্বা একটা মানুষ বসার ঘরে।

কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। গায়ের হলুদ রঙের চাদর। কাঁধে একটা
শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। লোকটা বসে আছে মূর্তির মতো। যেন সে আসলেই একটা মূর্তি,
মানুষ নয়।

টুনী অনেকক্ষণ ধরেই লোকটিকে দেখছে। একবার তার চোখের উপর ও
পড়ল। তবু লোকটা নড়ল না। টুনী সাহসে ডর করে বলল, আপনি কে?
লোকটি হেসে ফেলল। হাত ইশারা করে কাছে ডাকল। টুনী পর্দার আড়াল থেকে
বেরুল না। তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। লোকটি বলল, তোমার নাম টুনী?

হ্যাঁ। আপনার নাম কি?

আমার নাম সোবাহান। তোমাদের বাসায় বাবলু থাকে?

হ্যাঁ থাকে।

তাকে ডেকে আনতে পারবে?

না পারব না। বাবলু ছাদে। আমি ছাদে যাই না।

যাও না কেন? ছাদে কি ভূত আছে?

অছে। দিনের বেলা থাকে না। রাতে আসে।

তাই নাকি?

হঁ। রাতের বেলা এরা ছাদে লাফালাফি করে।

তুমি শুনেছ?

হঁ।

ভেতর থেকে নীলু বলল, কার সঙ্গে কথা বলিস রে? টুনী বলল, সোবাহানের সঙ্গে।
এই কথায় লোকটি শব্দ করে হেসে উঠল। নীলু পর্দার ফাঁক দিয়ে বসার ঘরের দিকে
তাকাল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। সে কঠিন গলায় বলল, আপনি কি মনে করে?

তোমাদের দেখতে এলাম। ভালো আছ নীলু?

আমাদের দেখতে এসেছেন?

হ্যাঁ।

দুলাভাই আপনার অসীম দয়া। আমরা ধন্য হলাম।

কেন ঠাট্টা করছ নীলু?

ঠাট্টা? ঠাট্টা করব কেন? আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করবার মতো সাহস কি আমার আছে।
আপনি হচ্ছেন মহাপুরুষ ব্যক্তি। সাধারণ প্রেম-ভালোবাসা আপনাকে আকর্ষণ করে না।
আপনার ছেলে কোথায় আছে কি করছে তা জানারও আপনার অগ্রহ নেই। আপনার
মতো মহাপুরুষকে ঠাট্টা করব?

বসো নীলু। বসো আমার সামনে।

নীলু বসল না। তার রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। সোবাহান বলল, একসঙ্গে
অনেকগুলি কথা বলে মনে হয় হাঁপিয়ে গেছ।

চা খাবেন?

যদি দাও তাহলে খাব।

নীলু রান্নাঘরে আসতে আসতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। এই লোকটির সঙ্গে রাগারাগি
করা অর্থহীন। রান্নাঘরের সামনে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। সে কৌতূহলী গলায় বলল, কার
সঙ্গে কথা বলছিলে ভাবী?

কারো সঙ্গে না।

স্বগত ভাষণ? কিন্তু আমি যেন পুরুষের গলা শুনলাম।

আমার বড় দুলাভাই।

গাংলু সাহেবের গ্রেট ফাদার?

হ্যাঁ।

আমি কি উনার সঙ্গে কথা বলতে পারি? মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।

হ্যাঁ। আবার কি ধরনের কথা রফিক? তোমার কথা বলতে হচ্ছে করলে তুমি কথা

বলো।

মোজাজ মনে হচ্ছে নট গুড।

গাংলু রান্নাঘরে ঢুকল। শুধু চা দিতে হচ্ছে করছে না অথচ ঘরে কিছু নেই। বিকিটের

মাথ খানা বিকিট, সেখানে পিঁপড়া ধরেছে। অথচ দুলাভাইকে শুধু চা দিতে ইচ্ছা

না। নীলু আনিসের বোঁজ দোতলায় গেল। আনিস নেই। বাবলু ছাদে একা একা

দেখ করছে। হাত-পা নাড়ছে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে।

গাবলু।

নিঃ?

কত বার বলেছি জ্বি বলবে। একটি জিনিস ক'বার বলতে হয়? যাও নিচে যাও।

আমার আকা এসেছে। এফুগি নিচে যাও। এই শার্টটা বদলে একটা ভালো শার্ট পরে

কো।

একটা মানুষ নেই যাকে পাঠিয়ে দোকান থেকে কিছু আনাবে। ঐক দিন পর এসেছে

গাংলুটা শুধু চা বাবে? নিজে গিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়? রফিক বাসায় নেই। নয়তো

আমাকে বলা যেত। দুলাভাইয়ের সঙ্গে একটু আগেই খুব কড়া কড়া কথা সে বলেছে।

কিন্তু এই জনোই বেশি খারাপ লাগছে। এই দুঃখী মানুষটিকে সে খুব পছন্দ করে।

বসার ঘরে রফিক খুব জমিয়ে গল্প করছে। সোবাহান কিছু বলছে না। তবে তার

মুখে হাসি হাসি। রফিক বলল,

তারপর ভাই কিছু না করলে আপনার চলে কি করে? আপনি কি সন্ধ্যাসী? অবশি

সন্ধ্যাসীরাও তো কিছু একটি করেন। ভিক্ষা করেন।

আমি মানুষের হাত দেখে ভাগ্য বলি।

ভাগ্য বলেন?

হ্যাঁ। আপনি একজন পামিষ্ট?

জ্বি।

বিশ্বাস করেন এসব?

জ্বি না। বিশ্বাস না করেও তো আমরা অনেকে কিছু করি।

উদাহরণ দিন।

দেশের কিছু হবে না এই জেনেও আমরা দেশের জন্যে জীবন দিয়ে দেই। দেই না?

গুড। আপনি তো ভাই ফিলসফার কিসিমের মানুষ। আমি আমার হাত দেখে নিন।

আজ থাক। আরেকদিন দেখব।

অসম্ভব আজই দেখতে হবে। হাত দেখে শুধু বলুন-টাকা-পয়সা হবে কি না। আর

কিছু জানতে চাই না। সুখটুকু কিছু আমার দরকার নেই, টাকা থাকলেই হলো।

সোবাহান রফিকের হাতের দিকে তাকাল। মৃদু স্বরে বলল, বুধের ক্ষেত্র এখন শুভ। মঙ্গলে আছে ত্রিভুজ চিহ্ন। আপনি অভ্যন্তর ধনবান হবেন। তবে তা নিশ্চিত হবে না। হৃদয় রেখা থেকে একটি রেখা ভাগ্য রেখাকে স্পর্শ করেছে। কারণেই ধনবান হবেন স্ত্রী ভাগ্যে।

বেইজুতি কথা বলছেন ভাই। স্ত্রী ভাগ্যে ধন?

হ্যাঁ তাই।

একটু আগে বললেন আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন না কিন্তু এখন এত সন্তোষে কথা বলছেন কেন?

জোর দিয়ে বলারই নিয়ম। যে হাত দেখাতে আসে সে এতে মনে করে এই বড় জ্যোতিষী।

তার মানে এটা হচ্ছে আপনার একটা ব্যবসায়িক চাল?

হ্যাঁ তাই।

তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি যে নিজের ভাগ্যেও আমি বড়লোক হতে না। পারবেন না। আপনার যা হবার তা হবে স্ত্রী ভাগ্যে।

আরে আপনাকে নিয়ে তো মহামুশকিল।

হাতে যেমন দেখছি তেমন বলছি।

এক মিনিট দাঁড়ান আমার স্ত্রীর হাতটা দেখে দিন। পালিয়ে যাবেন না যেন।

রফিক সাহেব আজ থাক।

অসম্ভব। আজই দেখবেন। একুশি নিয়ে আসছি। যাব আর আসব। এক মিনিট।

শারমিন ভেতরের বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে। গতকাল সকালে সে একটি পেয়েছে। আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছে সাক্ষির। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে নতুন কেমন লাগছে তাই জানতে চাওয়া। এবং সে যে সুইডেনে একটি চাকরি পেয়েছে ববর জানানো। চিঠি পাওয়ার পর থেকে শারমিন অস্বাভাবিক গম্ভীর। বাতে রফিক সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। রফিক একবার হাত ধরতেই ঝঁকি নিয়ে হাত ছাড়িয়ে বলেছে—হাত ধরবে না।

রফিক বিস্ময়িত হয়ে বলল, হাত ধরবে না কেন? এই হাত কি আমেরিকায় বন্ধক কি কুৎসিত কথা। এর জবাব দিতে ইচ্ছা করেনি। আজ বারান্দায় একা একা তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। কান্দতে পারলে মন হালকা হতো কিন্তু বাড়িটা এত যে কান্দবার জন্যে গোপন জায়গাও নেই।

এই যে শারমিন এখানে বসে আছে? আসো আমার সঙ্গে।

কোথায় যাব?

এক গ্রেট পামিস্ট এসেছে। ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব কিছু ফুটিয়ে দেয় তাকে হাত দেখাবে।

আমাকে বিরক্ত করবে না। একা থাকতে নাও।

সে কি? তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জানতে চাও না?

জানতে চাও না স্বামীর সঙ্গে জীবন কেমন কাটবে?

। এমন কাটবে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তার জন্যে জ্যোতিষীকে হাত দেখাতে
না।

। আমার হয়েছে কি বলো তো?

। কিছুই হয়নি।

। তা সত্যি বললে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমেরিকার চিঠি আসার
। পক্ষেই মেজাজ ফেটি নাইন।

। আরমিন কড়া গলায় বলল, কি হয়েছে সত্যি জানতে চাও?

। চাই।

। তাহলে এসো আমার সঙ্গে, ঘরে এসো। এখানে বলব না।

। এমন কথা যে মন্দিরের ভেতর গিয়ে বলতে হবে। চলো যাই।

। আরমিন দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলল, বসো এখানে।

। রফিক বসল। তার বেশ মজা লাগছে। শারমিনের প্রচণ্ড রাগের কারণটা ধরতে
। না। রাগে শারমিনের মুখ লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।

। তুমি আমেরিকার চিঠিটা গতকাল আমাকে দিয়েছ।

। হ্যাঁ।

। কিন্তু তার আগে খাম খুলে তুমি চিঠি পড়েছ।

। মুখবন্ধ খামই তোমাকে দিয়েছি।

। তা দিয়েছ। কিন্তু খাম খুলে চিঠি পড়ে তারপর আবার মুখ বন্ধ করেছ।

। এ রকম সন্দেহ হবার কারণ?

। কারণ খামের মুখ ভাঙ দিয়ে বন্ধ করা ছিল। আমেরিকা থেকে কেউ ভাঙ দিয়ে মুখ
। করে খাম পাঠায় না।

। রফিক চুপ করে রইল। কথা সত্যি। শারমিন বলল, আমার চিঠি তুমি কেন পড়লে?

। হাসবেত তার স্বীর চিঠি পড়তে পারবে না?

। নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু হুরি করে না।

। আমার ভুল হয়েছে এরকম আর হবে না।

। শারমিন ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। শোকের এমন তীব্র প্রকাশ রফিক আগে
। দেখেনি। তার লজ্জার সীমা রইল না। সে নরম স্বরে বলল, শোনো শারমিন, এই যে
। থাকাও আমার দিকে।

। প্রিজ আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

। কথা না বলে আমি থাকতে পারি না।

। শারমিন জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেল।

। বাবলুকে কোথাও পাওয়া গেল না। ছাদে ছিল এখন নেই। আশেপাশের কোনো
। বাড়িতেও নেই। টুনী খুঁজে এসেছে।

। সোবাহান তার কুলির ভেতরে হাত দিয়ে পুস্তিকের সস্তা ধরনের একটা খেলনা
। বের করে এগিয়ে দিল টুনীর দিকে। নীল বলল, টুনীকে দিতে হবে না দুলাভাই। বাবলুর
। জন্যে এনেছেন রেখে দিন বাবলুকেই দেবেন।

সোবাহান হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, এইখানে তুমি একটা নীলু। এটা আমি টুনীর জন্যেই এনেছি। দেখো এটা একটা পুতুল। মেয়ের খেল। বাবলুর জন্যে আমি একটা পিস্তল এনেছি। নাও এটা ওকে দিও।

নীলু বেশ লজ্জা পেল। সোবাহান হাসছে। নীলুর এই লজ্জা সে যেন করছে।

যাই নীলু।

আমার কথায় কিছু মনে করবেন না দুলাভাই।

যাদের আমি পছন্দ করি তাদের খুব কড়া কথাও আমার ভালো লাগে।

সোবাহান রাস্তায় নেমে গেল। নীলু অনেকক্ষণ ব্যারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। খাড়াপ লাগছে। শুধু শুধু এতগুলি কঠিন কথা বলা হলো। সে কিছুতেই নিজেই করতে পারছে না। ভেতর থেকে মনোয়ারা ডাকছেন, বৌমা ও বৌমা।

কোন বৌকে ডাকছেন কে জানে। দুই ছেলের বৌকেই তিনি বৌমা ডাকেন- বা ছোট বৌমা নয়। কিন্তু একজনের জায়গায় অন্যজন এলে রেগে আশুন হন। গলায় বলেন-তোমাকে তো ডাকিনি বৌমা। তুমি এসেছ কেন?

এখন তিনি কাকে ডাকছেন কে জানে। নীলু ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকল। মনে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর মুখ খমখম করছে।

আমাকে ডেকেছেন মা?

হ্যাঁ। কে এসেছিল?

আমার বড় দুলাভাই, বাবলুর বাবা।

আমাকে ডাকলে না কেন? আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না যে? নাকি আম তোমরা মানুষ বলে মনে করো না!

আপনি শুয়েছিলেন তাই।

তয়েছিলাম, মরে ভো যাইনি? নাকি তোমার ধারণা মরে গিয়েছি?

ছিঃ মা কি বলছেন এসব।

আত্মীয়-স্বজন এলে দেখা-সাক্ষাতের একটা ব্যাপার আছে।

তা তো আছেই।

ঠিক আছে মা তুমি যাও। বেশি দিন বেঁচে থাকার এইটাই সমস্যা। কেউ মানুষ মরে না। মনে করে ঘরের আসবাবপত্র। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। দাঁড়িয়ে আছ কেন যাও।

মনোয়ারা রাগ করে রাতের বেলা ভাত খেলেন না।



রক্তিকের আজ হঠাৎ করে তিনশ টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। বায়োডাটা দিয়ে চাকরির দরখাস্ত করবে জাপানের এক ফার্মে। দরখাস্তের সঙ্গে ওদের দশ ডলার পাঠাতে হবে। দশ ডলার কেনার জন্যেই টাকাটা দরকার। ব্যাপারটা হয়তো পুরোপুরি ভাঁওতা।

১১.৭.১৯৭১ সাল পানিটা বিদেশি। বিদেশিরা এতটা চামার নাও হতে পারে। হয়তো সত্যি সত্যি
কিছু নেই।

দশকিল হচ্ছে তিনশ' টাকার জোগাড় এখনো হয়নি। নীলুর কাছে চেয়েছিল। নীলু
কিন্তু পারেনি। পঞ্চাশ টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে-বেতন পেলে বাকিটা
কিন। টাকা আমার কাছে কিছু ছিল-বাবা নিয়ে নিয়েছেন। রফিক বিবর্ত হয়ে
কিন্তু বাবার আবার টাকার দরকার কি?

তোমার দরকার থাকলে তাঁরও থাকতে পারে।

তাঁর তো পেনশনই আছে।

পেনশনের টাকার সবটা তো মাকে দিয়ে দিতে হয়।

রফিক রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেল। শারমিনের কাছে হয়তো কিছু টাকা আছে।
কিন্তু এখন চাওয়া যাবে না। কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ। সামান্য এক চিঠি নিয়ে এই কাণ্ড।
কিন্তু এখন এরকম চলবে কে জানে। রফিকের মাঝে মাঝে মনে হয় এরকম আবেগ-প্রবণ
একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে বোধ হয় ভুল করেছে। তার জন্যে দরকার ছিল হাসি-
খুশি ধরনের একটি মেয়ে, যে খুব রাগ করবে আবার পরমুহূর্তেই সব কিছু ভুলে হেসে
গেলে। রাত একটার সময় ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে যার কোনো আপত্তি থাকবে না।
কিন্তু শারমিন মোটেই সে রকম নয়।

রফিক শেষ পর্যন্ত ঠিক করল সফিকের অফিসেই যাবে। ভাইয়ার অফিসে গিয়ে
চাওয়ার একটা সুবিধা আছে। ভাইয়া কখনো না বলবে না। সঙ্গে টাকা না থাকলে
একটা ঘন্টা খানিক পরে আয়। এই এক ঘন্টা কোনো না কোনোভাবে সে ম্যানেজ
করবেই।

রফিকের জন্যে বড় রকমের বিষয় অপেক্ষা করছিল। সফিক অফিসে নেই। যে
প্রত্যয় বসতো সেখানে অপরিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি বিরক্ত মুখে
বলেন, কাকে চাই?

সফিক সাহেবকে, এখানে বসতেন।

তাঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার?

উনি আমার বড় ভাই।

ও আচ্ছা আচ্ছা আসুন আসুন, বসুন এখানে।

ভদ্রলোক অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সফিক গলায় বললেন, আপনার
ভাইয়ের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ নেই?

যোগাযোগ থাকবে না কেন? আমরা তো একসঙ্গেই থাকি।

ও আচ্ছা।

ভদ্রলোক খুবই অদাক হলেন। তারপর যা বললেন তা সফিকের মাথা ঘুরতে
লাগল। কি সর্বনাশের কথা। শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না।

ভাইয়াকে সাসপেন্ড করা হয়েছে?

জি।

তিনি অফিসে আসেন না?

জি না। আপনারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না?

জি না। এই প্রথম জানলাম। ভাইয়া খুব চাপা স্বভাবের মানুষ।

আমার বোধ হয় এটা আপনাকে বলা ঠিক হলো না। অফিসের আমন্ত্রণ
ব্যাপারটার খুব আপসেট।

উনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?

বেশ কিছু অভিযোগ আছে।

আমার বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে। কোনোরকম অন্যায় করার ক্ষমতাই
নেই। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে।

তা তো হচ্ছেই। অভিযুক্ত হবার জন্যে সবসময় কিছু অন্যায় করতে হয় না।
সিগারেট নিন। চা খাবেন?

জি না। চা-সিগারেট কিছুই খাব না। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠাণ্ডা এক
পানি খাওয়াতে পারেন?

নিশ্চয়ই পারি।

ভদ্রলোক কোন্ড ড্রিংক আনালেন। রফিক দীর্ঘ সময় ভদ্রলোকের সামনে
রইল। উঠে যাবার মতো শক্তিও তার নেই। এই বিশাল সমস্যার কি সমাধান হবে

সে সেখান থেকে সরাসরি নীলুর অফিসে চলে গেল। নীলু কি একটা ফাইল
খুব ব্যস্ত। চোখে চশমা। এই চশমা সে বাসায় পরে না। অফিসে এলে চোখে দেয়
তাকে একেবারেই অন্য রকম লাগে। নীলু হাসি মুখে বলল, কি খবর রফিক?

কোনো খবর নেই ভাবী। আমি যখনই আসি তখনই দেখি তুমি ব্যস্ত। একটা
দেখলাম না তুমি কলিগদের নিয়ে জমিয়ে গল্প করছ।

কি করব তুমি বেছে বেছে কাজের দিনগুলোতেই শুধু আসো। আজ কি ব্যাপার
তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে ভাবী। চলো তোমাদের ক্যান্টিনে যাই
এখানে বলা যাবে না?

না।

ক্যান্টিন পুরো ফাঁকা। চা পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ আওয়ার
হবে। এখানে লাঞ্চ আওয়ারে চা হয় না। নীলু বলল, কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো। জরুরি
কথার নাম দিয়ে তুমি যা বলো সেটা কখনো জরুরি হয় না।

এবারেরটা হবে।

বলো শুধু শুধু দেরি করবে না।

তার আগে একটা হাসির গল্প শুনো নাও ভাবী। এতে খারাপ খবর সহ্য করা সহজ
হবে। গল্পটা হচ্ছে—এক লোক এল্লিডেন্ট করেছে। গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেছে। ট্রাকের
সার্জন বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেলে ব্যাপারটা কি...

নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি কি বলতে এসেছ বলে চলে যাও।

ভাইয়াকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে তেমনটা কমিটি বসেছে তদন্ত
হচ্ছে। গত এক সপ্তাহ ভাইয়া অফিসে যায়নি। ঘর থেকে বের হয়ে পার্কটার্কে কোথাও
বসে সময় কাটাচ্ছে হয়তো।

নীলু হতভম্ব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না।

যা বলছ ঠিক বলছ?

৭৭। প্রিন্স নিয়ে কি ভাবী রসিকতা করা যায়।

৭৮। বড় একটা ঘটনা সে আমাকে বলবে না?

৭৯। করবে বলো স্বভাব।

৮০। টাভার কিছু না, এতদিন হয়েছে আমাদের বিয়ের এখনো সে আমাকে দূরে রেখেছে। কেন আমি কি এতই তুচ্ছ, এতই ফেলনা?

৮১। বরষার করে কেঁদে ফেলল। ক্যান্টিনের বয়গুলি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

৮২। বিরক্ত হয়ে বলল, কি শুরু করলে এসব? তোমাদের এই জিনিসটা দু'চোখে দেখা পাবি না। এটার মধ্যে কেঁদে ফেলবার কি আছে?

৮৩। চোখ মুছে বলল, না কান্দবার তো কিছুই নেই। খুব আনন্দের সংবাদ। মনিপুরী গান গায় করলে তুমি বোধ হয় খুলি হও।

৮৪। ফিক হেসে ফেলল। লাঞ্চের আগেই নীলু ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এলো। সফিক না। হোসেন সাহেব মনোয়ারাকে নিয়ে খিলগাঁয়ে গিয়েছেন। টুনি, বাবলু স্কুল থেকে ফেরেনি। বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। বিকেল পর্যন্ত নীলু বিছানায় শুয়ে রইল। মাঝখানে শারমিন একবার এসে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি শরীর খারাপ ভাবী?

নীলু সে কথাই জবাব দিল না। তার আজ কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না। শারমিন আবার বলল, কি হয়েছে ভাবী? নীলু তিক্ত গলায় বলল, পুজু আমাকে বিরক্ত করবে না। ৭৫ মাথা ধরেছে।

ও স্যরি। তোমার কার্ডটা নাও।

কিসের কার্ড?

শাহানা পাঠিয়েছে। ভিউকার্ড।

টেবিলের উপর রেখে দাও।

শারমিন চলে যেতে গিয়ে আরেক বার জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে বলো? এসো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

ডাক্তারের কাছে নেয়ার মতো কিছু হয়নি।

এ বাড়িতে শরীর খারাপ অজুহাতে বেশিক্ষণ ভয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। হোসেন সাহেব তার হোমিওপ্যাথিক বাস্তু নিয়ে এসে পড়লেন।

মা দেখি উঠে বসো তো।

আমার তেমন কিছু হয়নি বাবা। মনটা শুধু খারাপ। হোসেন সাহেব বিজ্ঞান হাঙ্গামে হাসলেন।

মন খারাপও একটা অসুখ। সব অসুখের মূলে হচ্ছে এই অসুখ। ইংরেজিতে একে বলে ম্যালান্কেলি। মন খারাপ সারাতে পারলে সব অসুখই সারানো যায়। মাঝাঝাঝা আছে?

আছে অল্প।

চাপা ব্যথা নাকি সুচের মতো ব্যথা?

চাপা ব্যথা।

দেখি মা জিভ দেখি। হজমেরও অসুবিধা হচ্ছে। হাতের তালু কি খুব ঘামে?

একটু একটু ঘামে।

যা ভেবেছি তাই। তোমার কি মৃত্যু চিন্তা হয়? চট করে উত্তর দিও না, ভালো ভেবে বলো।

এত দুঃখও নীলু হেসে ফেলল। হোসেন সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, বিচারটাই হচ্ছে আসল। ঠিকমত লক্ষণ বিচার করে একটা ডোজ দিতে পারলেই ফতে। এই যে দেখো তোমার শাওড়ির মেজাজ। এরও অমুখ আছে। তিনটা ডোজ পারলে মেজাজ কন্ট্রোল হয়ে যাবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে।

দিল্লেন না কেন তিনটা ডোজ?

দিলেই কি সে খাবে? তাকে চিনো না তুমি? সকাল থেকে হেঁটে করছে। দুঃখ কিছু খায়নি।

কেন?

জানি না কেন। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো তো মা। আঃ এই ফাঁকে তো অসুখটা নিয়ে একটু ভাবি। এটা তো আর এ্যালোপ্যাথি না যে চোখ বন্ধ করে স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিব। লক্ষণ বিচার করতেই দুই-তিন ঘণ্টা লাগে বইপত্র দেখতে হবে। বড় কঠিন জিনিস মা হোমিওপ্যাথি। বড় কঠিন।

মনোয়ারার আজকের রাগের কারণ হচ্ছে-শাহানা সবাইকে কার্ড পাঠিয়েছে পাঠায়নি। নিজের পেটের মেয়ে এই কাণ্ড কি করে করল? তিনি কি তাকে অন্যদের থেকে কম ভালোবাসেন? সবাই তাঁকে অপছন্দ করে কেন? অপছন্দ করার মতো কি আছে মথো?

নীলু দরজার কাছে এসে বলল,

মা আসব?

আসতে হচ্ছে হলে আসো।

আপনি নাকি দুপুরে কিছু খাননি?

তাতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়েছে? আমি খেলেই কি না খেলেই কি খাবার গরম করে টেবিলে দিয়েছি মা।

খামাখা আগবাড়িয়ে কাজ করতে যাও কেন? কে তোমাকে টেবিলে খাবার দিচ্ছে?

নীলু বেশ কড়া করে বলল, আপনি মা শুধু শুধু অশান্তি করেন। সবাইকে বিরক্ত করেন।

মনোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়ে তাঁর মুখের উপর এসব বলছে। এত সাহস এই মেয়ে পেল কোথায়? তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, নীলু এই ঘর থেকে বের হয়ে যাও।

এই প্রথম তিনি বৌমা না বলে নীলু বললেন। তাঁর মনে হলো তাঁর চারপাশে ঘরবাড়ি খরখর করে কাঁপছে। চোখে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নীলু ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। হোসেন সাহেব ডাক্তার আনতে ছুটলেন। ডাক্তার বলল, প্রেসার খুবই হাই। একবার সোইরাওয়াদীতে নিয়ে যাওয়া উচিত।

সোইরাওয়াদী হাসপাতালে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করিয়ে নিল। এতগুলি ঘটনা

৭৮ নং খুব দ্রুত। নীলু বলল, বাবা রাতে আমি থাকব হাসপাতালে, আপনি শারমিনকে নিয়ে চলে যান। ডাক্তার তো বলেছেন ভয়ের কিছু নেই।

হোসেন সাহেব বিভ্রিড় করে বললেন, এত বড় একটা ঝামেলা রফিক-সফিকের জন্যে খোঁজ নেই, রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে মা।

ওরা বোধহয় এতক্ষণে এসে পড়েছে। ওদের গিয়ে খবর দিন।

গাচ্ছি। তোমার একা একা খারাপ লাগবেনা তো?

একা কোথায়? মা আছেন। তাছাড়া হাসপাতাল তর্তি রুগী।

রাতে তুমি ঘুমুবে কোথায়?

এক রাত না ঘুমুলে কিছু হবে না। বাবা আপনারা একটা বেবিট্যান্সি নিয়ে চলে গান।

মনোয়ারা বেশ খুশি, তাকে নিয়ে যে এত বড় একটা হৈচৈ হচ্ছে এই আনন্দে তিনি ঝুঁকল। নীলুকে ডেকে একবার বললেন, আত্মীয়স্বজন সবাইকে তো খবরটা দেয়া দরকার। কখন কি হয়। হার্টের ব্যাপার।

হার্টের অপনার কিছু হয়নি মা। খুব প্রেসার ছিল তাতেই...

তুমি কি ডাক্তারদের চেয়ে বেশি জানো? যা করতে বলেছি করো। সবাইকে খবর দাও। ঢাকার বাইরে যারা তাদের চিঠি দিয়ে দিও।

জি আচ্ছা।

রফিক সফিকের কাণ্ডটা দেখো তো। নিজের মা মরে যাচ্ছে কোনো খেয়াল নেই।

এখনো খবর পায়নি।

তোমার কি ধারণা খবর পেলেই ছুটতে ছুটতে চলে আসবে? নিজের ছেলেনের মাঝি চিনি না? খুব চিনি।

নীলু তার শাতড়ির পাশে বসে মৃদুস্বরে বলল, মা আপনি আমার কথায় রাগ করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আমার কি যে খারাপ লাগছে।

বলতে বলতে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। গলা ভার ভার হলো। মনোয়ারা বিরক্ত গলায় বললেন, বলেছ ভালো করেছ। আমি দিনে এক হাজার কড়া কথা বলি আর তুমি একটা বলতে পারবে না? কান্দতে শুরু করবে না তো মা। গায়ের মধ্যে কুটকুট করছে। বিছানায় হারপোকা আছে কিনা কে জানে। মা তুমি ঐ নার্সটাকে জিজ্ঞেস করে আসো তো বিছানায় হারপোকা আছে কি না।

নীলু বাধ্য মেয়ের মতো উঠে গেল। মনোয়ারা মনে মনে বললেন, আল্লাহ তুমি আমার এই লক্ষ্মী বৌটাকে সুখে রেখো। কোনো রকম দুঃখ তাকে দিও না।

রফিক এলো রাত নটার দিকে। নীলু অবাক হয়ে বলল, তুমি একা? তোমার ভাই আসেনি?

সকালে আসবে।

বলো কি তুমি? সকালে আসবে মানে? অস্ত্রশস্ত্রকে দেখতে আসবে না?

রফিক চুপ করে গেল। সে টিফিন কেয়িয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। ভাত, কৈ মাছ ভাজা, ফুল কপির ভাজি।

খেয়ে নাও ডাবী। ক্ষিদে লেগেছে নিশ্চয়ই।

ক্ষিদে লেগেছে কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। তোমার ভাইয়ের কি মনটন বলে নেই?

সেটা ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করো আমাকে জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই।

তুমি এখানে আর রাত করে কি করবে? মাকে দেখে চলে যাও।

আমিও আছি তোমার সঙ্গে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে থাকব। তুমি একা একা রাত জাগবে তা হয় নাকি? একটা চায়ের দোকান দেখে এসেছি সারারাত খোলা থাকে। এখানে গিয়ে এক ঘণ্টা পর পর চা খাব আর হাসপাতালের বারান্দায় বসে মশার কাছাকাছি থাকব।

রাতটা ভালোই কাটবে।

নীলু হেসে ফেলল। রফিক সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, হাসপাতাল নিয়ে একটা জোক শুনবে? খুব হাসির।

ঘটনার উত্তেজনায় মনোয়ারা এখন খানিকটা ক্লান্ত। ডাক্তাররা ঘুমের অধিকার নিয়েছে। তাতে ঘুম ঠিক আসছে না। ঝিমুনির মতো আসছে। নীলুকে তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। জেগে আছে নীলুও। কিছুতেই তার মনের গ্রানি কাটছে না। একসময় মনোয়ারা বললেন, বৌমা ঘুমিয়ে পড়ছে?

জি না।

তোমার স্বত্বরের কাণটা দেখেছ? তার উচিত ছিল না হাসপাতালে থাকা? একটা মানুষ মরে যাচ্ছে আর সে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ। বৌমা ঘুমিয়ে পড়লো?

জি না।

রফিক আছে তো?

জি বারান্দায় ইঁটাইটি করছে।

ব্যাটা ছেলে একজন থাকা ভালো। কখন কি দরকার হয়। তাই না? হাটের অসুখ।

জি। আপনি ঘুমান মা। মাথায় হাত দুলিয়ে দেই?

দাও।

নীলু মাথায় হাত দুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকদিন পর গভীর তৃপ্তি নিয়ে মনোয়ারা ঘুমতে গেলেন।

সাতদিন হাসপাতালে কাটিয়ে মনোয়ারা আজ বাড়ি ফিরবেন। এই উপলক্ষে রফিকের ইচ্ছা ছিল একটা নাটকের মতো করা। দরজার বাইরে লেখা থাকবে শুভ প্রত্যাবর্তন। ফুলটুল দিয়ে ঘর সাজানো হবে। রাত্রে একটি ঘরোয়া গানের আসর। রফিক তার এক বন্ধুকে খবর নিয়েছে সে সন্ধ্যাবেলায় এসে গজল গাইবে। এই জিনিষটির আজকাল বেশ প্রচলন হয়েছে। ঘরে ঘরে গজল।

না-ও অবস্থা গতিকে মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব হবে না। ভোরবেলায় ভাবী এবং
মধ্যে তুমুল ঝগড়া। এরা দু'জন যে এভাবে ঝগড়া করতে পারে তা রফিক
করেনি। একবার ভেবেছিল ঝগড়ার ধাক্কাটা কমানোর জন্যে সে কিছু বলবে।
তাকে বেরুতে দেয়নি। ব্যাপারটি শুরু হয়েছে এভাবে-অফিসের সময় সফিক
কাপড় পরছে। কাপড় পরতে পরতে বলল, এক কাপ চা দিতে পারো নীলু।

নীলু চা এনে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আজ মা হাসপাতাল থেকে ফিরবেন জানো
না হয়।

হ্যাঁ জানি। আমিও সকাল সকাল ফিরব।

কোথায় যাচ্ছ তা জানতে পারি কি?

তোমার কথা বুঝতে পারছি না। রোজ যেখানে যাই সেখানে যাচ্ছি।

অফিসে যাচ্ছ?

সফিক এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ছুতা ব্রাশে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়ল।

নীলু বলল, কি কথা বলছ না কেন? অফিসে যাচ্ছ?

না।

কোথায় গিয়ে বসে থাকো জানতে পারি?

আপ্তে কথা বলো, চেষ্টাচ্ছ কেন?

তোমার চাকরি নেই এই খবরটা আমাকে কেন অনোর কাছ থেকে শুনতে হলো?

কেন তুমি বলতে পারলে না?

চাকরি নেই এই কথাটা তো ঠিক না। তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলেই আমি আগের

কাজে ফিরে যাব।

ফিরে যাবে ভালো কথা। আমাকে কেন বলবে না?

কি মুশকিল, তুমি চেষ্টাচ্ছ কেন?

চেষ্টা। চেষ্টায়ে বাড়ি মাথায় তুলব।

ঝগড়ার এই পর্যায়ে শারমিনের আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে রফিক এসে বলল, ভাবী
একটু শুনে যাও তো, বুঝ দরকার।

নীলু মুহূর্তের মধ্যে নিজেসঙ্গে সামলে নিল। শান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।
রফিক বলল, তোমার অফিসের গাড়ি অনেকক্ষণ হলো দাঁড়িয়ে আছে। হর্ন দিচ্ছে। যাও
অফিসে যাও। এইসব কি হচ্ছে?

আজ অফিসে যাব না।

সেই খবরটা গাড়িতে যারা আছে তাদের দিয়ে আসতে হবে তো না? তুমি তোমার
একজন জনো সবাইকে লেট করাবে?

নীলু খবর দিতে গেল কিন্তু ফিরে এলো না। শেষ মুহূর্তে মনে হলো বাসায় ফিরে
কি হবে? এরচে' অফিসে সময় কাটানোই ভালো। তার পোতাড়ি সন্ধ্যার আগে আগে
বাসায় আসবেন। তার আগে ফিরে গেলেই হবে।

সফিক আজ প্রথম অফিসে গেল। বিনা প্রয়োজনে নয়। প্রোভিডেন্ট ফান্ড থেকে
টাকা তুলতে হবে। বাড়ি ভাড়া, হাসপাতালের খরচ, নানান ফ্যাকরা। অফিসে ঢুকতে

তার লজ্জা লজ্জা লাগছে। নিজের অফিস অথচ নিজের মনে করে আসতে পারছে না। অফিসের কর্মচারীরাও কেউ এই ক'দিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। সিদ্দিক সাহেবের সঙ্গে দেখা।

আরে সফিক সাহেব আপনি? আসুন আসুন। আজ কেন জানি মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন।

তাই নাকি! আপনার যে সিক্সেস সেল ডেভেলপ করছে তা তো জানতাম না। সিদ্দিক সাহেব।

আমার কথা বিশ্বাস করলেন না তাই না? আপনার সামনেই আমি মুজিবুরকে জিজ্ঞেস করছি। আধ ঘণ্টা আগে আমি মুজিবুরকে বলেছি যে আপনি আজ আসবেন। আসুন আমার ঘরে আসুন। প্রিজ?

আমি একটু ক্যাশ সেকশনে যাব কিছু টাকা তুলব।

ক্যাশ সেকশনের পাখা গজায়নি। পালিয়ে যাচ্ছে না। তাহাড়া টাকা আপনি আনতে ঘরে বসেও তুলতে পারবেন।

অফিসের খবর কি?

তদন্তের খবর জানতে চাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ।

তদন্ত পরও শেষ হয়েছে। সাহেবদের তদন্ত একটা দেখবার জিনিসেরে ভাই। ঠা খেতে খেতে চার-পাঁচ জন লোককে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করল, ব্যাস তদন্ত শেষ।

ফলাফল কি?

তাও ভো জানি না। ব্যাটা কিছু বলে না। আমি গতকাল জিজ্ঞেস করলাম সে বলে মতো ঠোট সুরু করে বলল, এই খবরের জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন? ব্যাটার কথা গা জুলে যায়। অফিসের খবরে আমার আগ্রহ থাকবে না? আপনি কি বাবেন চা না কহি আমি কিছুই খাব না।

এসব বলে কোনো লাভ হবে না। খেতেই হবে। ক্যাশিয়ারকে ডাকাছি টাকা পয়সার ব্যাপার সেরে নিন। ইন্টারকমের ব্যবস্থা হয়েছে দেখেছেন? টেলম্যান ব্যা দারুণ একটিভ। হ' কোটি টাকার একটা নতুন প্রান্ট হচ্ছে। ব্যাটার এক চিঠিতে হে অফিস প্র্যান স্যাংশন করে দিয়েছে।

কিসের প্রান্ট?

সালফিউরিক এ্যাসিড প্রান্ট। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে জয়েন্ট কোলমবরেশন সিক্সটি-ফোর্টি শেয়ার। সিক্সটি কোম্পানি অ'র ফোর্টি লোকাল গভর্নমেন্ট

ভালোই তো।

আমাদের জন্যে ভালো। কোম্পানি ঘো করবে আমরাও ঘো করব।

সিদ্দিক সাহেব ইন্টারকমের বোতাম টিপে ক্যাশিয়াকে আসতে বললেন। তা এক মিনিট পরই টেলম্যান খবর পাঠাল-সফিককে যেন তার ঘরে পাঠানো হয়। সিদ্দিক সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, আপনি এসেছেন ব্যাটার কাছে খবর চলে গেছে। নাৎসি জার্মানির অবস্থা হয়েছে বুঝলেন। জীবন অতিষ্ঠ। চারদিকে ব্যাটার শ্পাই।

টেলম্যান হাসি মুখে বলল, কেমন আছ সফিক?

নাগো আছি স্যার।

খামসে এসেছিলে কেন?

পার্সেন্টে ফান্ডের টাকা কিছু তুলব।

কেন?

না এখনো তোলা হয়নি।

নাগো। আরাম করে বসো। অফিসের খোজ-খবর কিছু রাখো?

না। তবে আজ শুনেছি। কোম্পানি বড় হচ্ছে।

হ্যাঁ বড় হচ্ছে। বিগ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদের সরকারি অফিস
কমিটির মতো হা করে আছে। সারাফক এদের মুখে কিছু না কিছু দিতে হচ্ছে। হা হা
হা। তা খাবে?

না।

তদন্তের রিপোর্ট জানতে চাও?

হ্যাঁ চাই।

তোমার কি ধারণা বলো? তুমি কি মনে করো তদন্তে তোমাকে নির্দোষ বলা হবে?

আমার তাই ধারণা। আমি কোনো অন্যায় করিনি। এসবের কিছুই আমি জানি না।

যে এসবের কিছু জানে না অথচ যার সিগনেচার নিয়ে এত চুরি-জুয়াচুরি হয় সে কি

বড় রকমের একজন অপদার্থ নয়?

হ্যাঁ ঠিক।

তদন্তে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদিও আমি এবং তদন্ত কমিটির
অন্যেরা ভালোই জানি অন্যায়টা তোমার করা নয়।

তদন্ত কমিটি দোষী ব্যক্তিদের বের করতে পারেনি এটা কি কমিটির একটা বড়
রকমের ব্যর্থতা নয়?

হ্যাঁ ব্যর্থতা তো বটেই। বিগ ফেইলিযুর।

স্যার আমি কি এখন উঠব?

না একটু বসো। আমি হাতের কাজ সেরে নেই। ধরো দশ মিনিট।

ঠিক আছে স্যার বসছি।

কিংবা আরেকটা কাজ করতে পারো। যে কাজে এসেছিল সেটা শেষ করে আমার
গাঙ্গে দেখা করবে।

আর দেখা করে কি হবে?

কথাবার্তা বলব। আজ আমার কাজ করার মুড নেই। কথা বলতে ইচ্ছা করছে।

সফিক বের হয়ে গেল। টলম্যান দু'টি অর্ডারে সই করল। একটি হচ্ছে
মালফিউরিক গ্র্যাসিড প্লাস্টার প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসেবে সফিকের নিয়োগ পত্র।
দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঢাকা জোনাল অফিসের জি. এম. পদে সফিকের পদোন্নতি।

তদন্ত কমিটি সফিকের কোনো ত্রুটি ধরতে পারেনি। তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে
টলম্যান তার রিপোর্টে লিখেছে-সং এবং দক্ষ এই দুই ধরনের গুণের সমন্বয় সাধারণত
হয় না। সফিকের মধ্যে তা লক্ষ্য করেছি। বড় রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ একে দেয়া যেতে
পারে। তা ছাড়া সফিক আহমদের বিপুল জনপ্রিয়তাও আমি সর্বশ্রেণীর কর্মচারীদের

মধ্যে লক্ষ্য করেছি। কোম্পানির স্বার্থেই এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো উচিত।

সফিক বাড়ি ফিরে যাবার আগে টেলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সে গেল, করতে চলে গিয়েছে। টেলম্যানের পি.এ. দু'টি খাম এগিয়ে দিল। নরম গলায় বলল
বড় সাহেব আপনাকে দিতে বলেছেন। আর আপনার জন্যে এই চিঠি লিখে গেছেন। চিঠিটা আগে পড়তে বলেছেন।

সফিক চিঠি পড়ল। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে “আজ রাতে অবশ্যই তুমি তোমার নিয়ে কোনো একটা ভালো বেস্টেরায় খেতে যাবে। খাবার এবং পানীয়ের অর্ডার পর খাম দু'টি খুলে পড়বে। আশা করি এর অন্যথা হবে না।”

সফিক অফিসে বসেই খাম খুলে পড়ল। তার বেশ মন খারাপ হলো। টেলম্যান ভাবে বলেছিল কাজটা সেভাবেই করা উচিত ছিল। নীলু কত খুশি হতো। আনন্দ ভোগ করা যায় না।

সিন্দিক সাহেব বললেন, কি ব্যাপার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছেন? স্যারের দেখা হয় নি?

হয়েছে।

ব্যাটা কি বলল?

তেমন কিছু না।

সফিক একটা রিকশা নিল। যাবে মতিঝিল। নীলুর অফিসে। নীলুর অফিস এখন দেখা হয়নি। নীলু আজ অফিসে গিয়েছে কি না কে জানে। হয়তো অফিসেই যাক্স, ঝগড়া-টগড়া করে বাসায় বসে আছে।

নীলু অফিসেই ছিল। সফিককে ঢুকতে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কি ব্যাপার তুমি?

দেখতে এলাম তুমি কি করো না করো। নিজের কিছু করার নেই, সময়টা কাটাতে হবে।

সফিক নীলুর সামনে চেয়ার টেনে বসল। পকেটে হাত নিয়ে হাসি মুখে বলল সিগারেট খেতে কোনো বাধ্য নেই তো?

অফিসের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকচ্ছে। নীলুর কেন জানি খুব লজ্জা লাগবে। সফিকের হঠাৎ এখানে আসার কারণটা ধরতে পারছে না। সে চাপা গলায় বলল, সফিক করে বল কি জনো এসেছ।

তোমার যখন কাজ কর্ম ছিল না তখন তুমি আসতে না আমার অফিসে অকারণে যেতাম না কোন একটা কাজ নিয়ে যেতাম।

বেশিরভাগ সময়ই যেতে টাকার জন্যে হঠাৎ টাকার দরকার হয়ে পড়ত তখন... তুমি নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যে আসোনি।

সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, আমার উদ্দেশ্যও তাই। গোটা সপ্তাহেক টাকা দিতে পারবে?

সফিক হাসছে। সমস্ত রহস্য নীলুর কাছে এখন পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। ভালো খবর আছে। নিশ্চয়ই খুব ভালো খবর। আজ সন্ধ্যায় এই নাটকটা সে যদি না করত। বেচারী জানাতে চায়নি কেন সে জোর করে জানল? জানাতে চায়নি লজ্জায় এবং অপমানে, সে স্ত্রী হয়ে স্বামীর লজ্জা এবং অপমানকে সবার সামনে প্রকাশ করে দিল।

হাস্য এই লোকটি রাগ করেনি। ভালো খবরটি নিয়ে হাসিমুখে এসেছে তার কাছে।
হাস্য করার চেষ্টা করছে। হস্যা করার তার ক্ষমতা নেই। মোটেই জমতে পারছে না।
শীতল চোখ ভিজে উঠল।

নীলু বলল, কিছু খাবে? আমাদের এখানে খুব ভালো ক্যান্টিন আছে। সফিক হাসতে
হাসতে বলল,

এক কাজ করলে কেমন হয় চলো না বাইরে কোথাও বেয়ে বাসায় চলে যাই। আজ
একটু সকাল সকাল বাসায় ফেরা দরকার।

একটু বসো আমি স্যারকে বলে আসি।

নীলু কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এলো। নরম স্বরে বলল, তুমি একটু আসবে
আমার সঙ্গে?

কেন?

স্যারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতাম।

কি পরিচয় দেবে, বেকার স্বামী?

হ্যাঁ তাই। প্রিজ আসো।

সফিক হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল।

মনোয়ারা সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন। ডাক্তার বলে দিয়েছে, ইনাকে নিজের মত
পাশে দিতে হবে। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করা একেবারেই
চালাবে না। মনোয়ারার মন ভালো নেই। তিনি আরো কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে
চেয়েছিলেন-

গৃহ প্রবেশের আয়োজন মোটামুটি ভালোই। রফিক সতি সতি একটা কাগজে
লেখছে-'শত প্রত্যাবর্তন'। সেটা টানানো হয়েছে দরজার সামনে। ফুলের একটি তোড়া
টুনার হাতে। সেই ফুলের তোড়া টুনী তার দাতির হাতে তুলে দিল। মনোয়ারা গম্ভীর হয়ে
ফুলের তোড়া নিলেন। মনে হচ্ছে তিনি জানতেন এরকম একটা কিছু হতে যাচ্ছে।

আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা তাঁকে দেখতে আসছে। তিনি সবার সঙ্গেই
হাসপাতালের ভয়াবহ গল্প করছেন-

"বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিল। নেহায়েৎ ভাগ্য
চাপে ফিরে এসেছি।"

কথা পুরোপুরি মিথ্যা। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করছে।

রফিকের বন্ধু সেই গজল গায়ক সন্ধ্যা থেকেই বসে আছে। মনোয়ারা ফিরলেন তাঁর
ফিরে আসা উপলক্ষে গান-বাজনার আয়োজনও আছে। তাঁর বেশ আশ্রিত হলো। শাহানা
খান তার বর এখনো আসেনি। এইটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। এর দু'জন তাঁকে দেখতে
হাসপাতালেও যায়নি। নেপাল থেকে ফিরেছে তো বেশ কিছুদিন হলো। তিনি উঁচু গলায়
ডাকলেন, বৌমা ও বৌমা।

শারমিন এসে ঢুলঢুল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, তোমাকে তো ডাকিনি, তুমি
এসেছ কেন? বড় বৌমাকে আসতে বলো।

নীলু ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, শাহানাদের খবর দেয়া হয়েছে?

জি হয়েছে।

ওরা আসছে না কেন?

কোনো কাজ পড়েছে বোধ হয়।

যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছে আর তার কাজ পড়ে গেল? বড় কামের মের গছে গেছে দেখি। রফিককে বলো ওদের নিয়ে আসুক।

ওকে বললে এখন যাবে না মা। বন্ধুবান্ধব এসেছে, ওদের নিয়ে হৈচৈ করছ।

তোমাকে বলতে বললাম তুমি বলো। তোমরা সবাই মিলে আমাকে রাগিয়ে দিচ্। ডাক্তার কি বলেছে মনে নেই?

রফিক নীলুর কথার কোনো পাত্তাই দিল না পাত্তা দেবার প্রশ্নও ওঠে না। তল গায় বন্ধু মাথা দু'লিয়ে মেয়েলী গলায় গান ধরেছে—“মেরা বালাম না আয়ে।”

বানাম না আসার কারণে তাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে।

হোসেন সাহেবের এই গান খুবই পছন্দ হচ্ছে। তিনি চোখ বন্ধ করে হাতে তাল দিচ্ছেন। টুনি এবং বাবলু একটু পর পর হেসে উঠছে। তিনি এতে খুব বিরক্ত হচ্ছেন। গজল গায়কও বিরক্ত হচ্ছে।



কবির মাটারের ঘুম ভাঙে সূর্য ওঠার আগে। কিন্তু গত ক'দিন ধরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। তিনি আটটা-নটার আগে বিছানা থেকে নামতে পারছেন না। সকাল বেলা গাড়ি ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে থাকে। শরীরে কোনোরকম জোর পান না। ঘুম ভাঙার পরও অনেকক্ষণ তাকে বিছানার উপর বসে থাকতে হয়। নড়াচড়া করতে পারেন না। তাঁর মনে ভয় ঢুকে গেছে—হয়তো বা এক সময় পুরোপুরি বিছানা নিতে হবে। জীবন কাটাতে অন্যের করুণায়। এরচে দুঃখের ব্যাপার আর কি হতে পারে? চট করে মরে যাওয়া ভালো। কিন্তু দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভয়াবহ ব্যাপার। এটা তিনি চান না।

আজ অবশি তাঁর ঘুম সূর্য ওঠার আগেই ভেঙেছে। শওকত তাঁকে ডেকে তুলছে। শওকতের মুখ গম্ভীর। বড় রকমের কোনো ঝামেলা হয়েছে বোধ হয়। কিন্তু শওকত তাঁকে কিছু বলছে না। ঘুম ভাঙিয়ে চা বানাতে গিয়েছে। একেক সময়ে শওকতের উপর রাগে তাঁর গা জ্বলে যায়।

হয়েছে কি রে শওকত? ব্যাপারটা বল।

রান্নাঘর থেকে শওকত বলল, চা খান তারপরে কইতাহি। খবর খারাপ।

চা খাবার পরও শওকত কিছু বলল না। কবির মাটার বড় বিরক্ত হলেন।

ব্যাপারটা কি?

আসেন আমার সাথে। নিজের চউক্ষে দেখেন। মুখের কথায় কাম কি?

এ সঙ্গে বাক্যালাপ করা অর্থহীন। কবির মাষ্টার গায়ে চাদর জড়ালেন। ছাতা
গাচা নিলেন। কতদূর যেতে হবে কে জানে।

শিশিদূর যেতে হলো না। কুলের পুকুরের কাছে এসে শওকত বলল, দেখেন নিজের
মৃত্যু দেখেন।

কবির মাষ্টার কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলেন না। পুকুরের সব মাছ মরে
উঠেছে। দুধের সরের মতো মাছের সর পড়ে গেছে। অনেক লোকজন জড়ো
গেছে এর মধ্যেই। তারা কবির মাষ্টারের দিকে এগিয়ে এলো; কিন্তু কেউ কিছু বলল
না।

কবির মাষ্টার বসে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরছে। বহু যত্নে তিনি এই পুকুর তৈরি
করেছেন। মাটি ভরাট হয়ে গিয়েছিল। মাটি কাটিয়েছেন। পোনা মাছের চারা
ফেঁদেছেন। ফিশারি ডিপার্টমেন্টের লোক এনে শানিতে সার দিয়েছেন। শ্যাওলা পরিষ্কার
করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের জন্যে তো এটা তিনি করেননি? করেছেন সুখী নীলগঞ্জের
জালা। মাছের আয় পুরোটা যেত কুলে। কুল নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু এটা কি
কাল?

শওকত বলল, স্যার উঠেন বাড়িত যাই। বইস্যা খাইক্যা কি করবেন? কার জন্যে
করবেন?

তিনি উঠলেন, বাড়ি গেলেন না পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসলেন। এই বছরই ঘাট পাকা
করেছেন। ছেলেবুড়ো এখন পুকুর পাড়ে ভেঙে পড়েছে। কেউ কেউ বড় বড় মাছ তুলে
নিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে রান্না করবে। খাবে। মাছের শরীরে বিষ কতটুকু গিয়েছে কে জানে।
নিষাক্ত মাছ খেয়ে হয়তো অসুস্থ হবে অনেকে। তাঁর ইচ্ছা হলো একবার বলেন, এই মাছ
গেয়ো না। কিন্তু বললেন না। বলতে ইচ্ছা হলো না। কেনইবা বলবেন?

বেশ কিছু সাপ মরে তেমে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেই সব সাপ কচ্ছির
প্রণয় নিয়ে মহানন্দে ছোট্ট ছুটি করছে। মাঝে মাঝে এ-ওর গায়ে ফেলে দিচ্ছে। কবির
মাষ্টার ঘাটে বসে শিশুদের খেলা দেখতে লাগলেন। শওকত বেশ কয়েকবার চেষ্টা করল
স্যারকে বাসায় নিয়ে যেতে। পারল না। তিনি মূর্তির মতো বসে রইলেন। রোদ বাড়তে
লাগল।

দুপুর এগারটায় থানার ওসি সাহেব তদন্তে এলেন। দু'জন কনস্টেবল নিয়ে পুকুরের
চারদিকে কয়েকবার ঘুরলেন। কুলে হেড-মাষ্টার সাহেবের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে
কবির মাষ্টারের পাশে এসে বসলেন। আশেপাশের সবাইকে অবাক করে দিয়ে কবির
মাষ্টারের পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। থাকি পোশাক পরা কেউ সাধারণত পা ছুঁয়ে সালাম
করে না। কবির মাষ্টার বললেন, ভালো আছ বাবা?

জি স্যার। আপনার দোয়া।

তাহলে তো ভালো থাকার কথা না কারণ দোয়া আহুতি তোমার জন্যে করিনি।

এখন করবেন। রোদের মধ্যে বসে আছেন কেন? বাড়ি চলে যান।

বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। রোদে বসে থাকতে ভালোই লাগছে।

এনড্রিন দিয়ে মেরেছে। আপনার সঙ্গে কি স্যার কারো শত্রুতা আছে। চট করে
কিছু বলবেন না স্যার। ভালো করে ভেবে বলুন।

ভেবেই বললাম। শ্রুতি থাকবে কেন?

স্যার আপনি ঘরে গিয়ে কিছু মুখে দিন। শীতকালের রোদই গায়ে লাগে বেশি।

হ্যাঁ যাব। খানিকক্ষণ পরেই যাব। শুধু শুধু বসে থেকে লাভ কি? কেনইনা পক্ষ:

তিনি কিন্তু উঠলেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত একই জায়গায় একইভাবে বসে রইলেন।

হচ্ছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। নীলগঞ্জ স্কুলের হেডমাষ্টার অন্য স্যারদের সঙ্গে নিয়ে অনেকক্ষণ বোঝালেন, কি জন্যে বসে আছেন? নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভটা কি হচ্ছে? সারাদিন কিছু মুখে দেননি। হিম পড়তে শুরু করেছে। বড় রকমের একটা ঝড় না বাধিয়ে আপনি ছাড়বেন না মনে হচ্ছে। তাতে লাভটা হচ্ছে কার?

কবির মাষ্টার ক্লাস্ত গলায় বললেন, লাভ-লোকসান নিয়ে ভাবি না।

আপনি না ভাবলেন আমরা তো ভাবি। কেন আপনি শুধু শুধু বসে আছেন?

একটা প্রতিবাদ করছি বুঝলে। একটা প্রতিবাদ। যে এই কাজ করেছে সে একজন আমার কাছে ক্ষমা চাইবে। তখন আমি উঠব। তার আগে আমি উঠব না। সারা বছর বসে থাকব। সন্ধ্যার পর শওকত বলল-কাজটা সেই করেছে। ক্ষমা চায়। কোনোদিন করবে না।

শুধু শওকত নয় একের পর এক অনেকেই আসতে লাগল। সবাই বলছে কাজটা তারই করা। পাশের দু'একটি গ্রাম থেকেও লোকজন এসে বলল কাজটা তারা করেছে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারলেন না। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। তাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে। সেখানে তিন দিন রেখে ঢাকার পিজিতে। ঢাকায় পঞ্চম দিনের বিকেলে তিনি চোখ মেললেন। শুনলেন কে বলছে-বুড়ো মনে হচ্ছে এই যাত্রায় টিকে গেল।

কথা বলছে রফিক। তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন রফিক এখানে এলো কি করে। মাথা ঘুরাতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না, শরীর সিসার টুকরার মতো ভারী হয়ে এলো। মামা, কথাবার্তা কিছু শুনেতে পারছ? তাকাও দেখি আমার দিকে। বলো তো কে রফিক।

মনে হচ্ছে আরো কিছুদিন আমাদের যত্ননা দেবে।

তুই এখানে কোথেকে?

আমি যেখানকার সেখানেই আছি। তুমি বর্তমানে আছ ঢাকায়। পিজিতে। বেঁচে উঠবে এরকম কোনো আশা ডাক্তারদের ছিল না। তুমি তাদের বোকা বানিয়ে বেঁচে উঠেছ। বুঝতে পারছ?

পারছি।

রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আমরা পালা করে তোমাকে পাহারা দিচ্ছি। বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আমার ডিউটি।

তোর সঙ্গে উনি কে?

ইনি হচ্ছেন বাবলুর বাবা। সোবাহান সাহেবের খ্যাতি জ্যোতিষী। তুমি আরেকটা সুস্থ হলেই তোমার হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব বলে দিবে। এমন কি তোমার পুকুরের মাছ কে মারল সেই খবরও বলে দিবে।

সোবাহান বলল, রফিক সাহেব উনাকে ঘুমুতে দিন বিরক্ত করবেন না। আসুন
খানায় বারান্দায় গিয়ে বসি।

এবার মাস্টার কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। গভীর ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।
১৪। পরেও তিনি জেগে থাকতে পারছেন না।

রফিক বলল, বুড়োতো মনে হয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে। এখন আর পাহারা
বাহাদুর কোনো মানে নেই। চলুন বাড়ি চলে যাই।

বাড়ি গিয়ে কি করবেন?

তাহলে চলুন আপনার আস্তানায় যাই। আপনি কি ভাবে জীবনযাপন করেন দেখে
খানি।

দেখার মতো কিছু না। বস্তির মতো একটা জায়গায় বাস করি। ওখানে গেলে
আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

বন্ধ হলে হবে, চলুন যাই।

সত্যি যাবেন?

আরে কি মুশকিল। আমি কি ভদ্রতা করে যাবার কথা বলছি?

কি করবেন আমার ওখানে গিয়ে?

গল্প করব। যদি চা খাওয়ান চা খাব।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

তা আছে। আপনি খুব ভালো করে আরেকবার আমার হাত দেখবেন। ঐদিন তেমন
ব্যবহারযোগ্য দেননি। ভাসা ভাসা কথা বলেছেন।

ব্যাপারটা ভো ভাই ভাসা ভাসা।

ভাসা ভাসা হলেও যতদূর সম্ভব আপনি একটু তলিয়ে দেখবেন। আপনার কাছে
১৫। দেখার ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে না?

সোবাহান হেসে ফেলল। রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, হাসবেন না। ব্যাপারটা বেশ
শিরিয়াস। আপনার হাত দেখার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বাসায় চলুন সেখানে
আমি সব বলব।

বেশ তো চলুন। কিন্তু তার আগে আপনি কি একটা খবর দেবেন না?

কি খবর?

আপনার মামার যে জ্ঞান ফিরেছে সেই খবর।

খবর দেবার দরকার নেই। আটটার সময় নীলু ভাবী এসে নিজের খেতেই জানবে।
মামার খবর চট চট দিতে হয়। বাঁচার খবর না দিলেও চলে।

সোবাহান যেখানে থাকে তাকে ঠিক বস্তি বলা যাবে না। কাঁচা ঘর নয়। হাফ
নিউ। দুটি কামরা। আসবাবপত্র যা আছে তা বেশ খোঁজানো। হাত দেখা, কোষ্টি
খাবার প্রচুর বইপত্র। রফিক বলল, এইসব বই পড়েছেন নাকি?

হ্যাঁ পড়েছি।

তার পরেও বলেন আপনি এসব বিশ্বাস করেন না?

জি না করি না।

অল্পত লোক ভাই আপনি। দেখি চায়ের ব্যবস্থা করুন।

সোবাহান কেরোসিনের চুলা ধরাল। চায়ের কাপ সাজাল। সহজ পলাতক
রক্ষিক সাহেব চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন?

ফিদে ফিদে অবিশ্যি লাগছে। কি আছে ঘরে?

মুড়ি খাবেন। তেল মরিচ দিয়ে মেখে দেই?

দিন। লোকজন আসে কেমন আপনার কাছে?

বেশি আসে না। তবে আসে কিছু কিছু। টাকা যা পাই তার থেকে বাড়ি ভাড়া
খাবার খরচ ওঠে।

জমে না কিছু?

না। সঙ্কয়ের ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই। কার জন্য সঙ্কয় করব বলুন।
নগ্ন হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম নগ্ন হয়ে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু যতদিন বাঁচবেন নগ্ন হয়ে বাঁচতে পারবেন না। কিছু একটা গায়ে দিতে
দিতেই হবে এমন কোনো কথা কিন্তু নেই। কেউ কেউ জীবনও নগ্ন গাত্র
দেন।

কাইডলি আপনার হাই সিলসফি রেখে আমার হাতটা দেখুন। আপনি বলো
আমি প্রচুর পয়সা করব।

তা বলেছিলাম।

সে রকম লক্ষণ অবিশ্যি দেখা যাচ্ছে কিন্তু স্ত্রী ভাগ্যে ধন তা তো মনে হচ্ছে না।
হচ্ছে বন্ধু ভাগ্যে হচ্ছে।

তাই নাকি?

জি তাই। আজ একটু সময় নিয়ে হাতটা দেখুন। ম্যাগনিফাইং গ্লাসড্রাস যা
দেব করুন। বিনা পয়সায় হাত দেখাব না রীতিমত ফি দেব। কত নেন আপনি?
কত?

বাঁধা কোন রেট নেই। যার যেমন খুশি দেয়।

আমার কাছে কুড়িটা টাকা আছে, এর অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। দেরি
লাভ নেই। এখনই নিয়ে নিন।

সোবাহান হাসল। চায়ের পানি ফুটছে। কেতনিতে চায়ের পাতা ছাড়ল। রা
ছেলেটিকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। চমৎকার ছেলে।

রক্ষিকের ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটা অনেক
গুপ্তধন পাওয়ার মতো। ঢাকা কলেজে তার সঙ্গে ইদরিস বলে একটা ছেলে পড়
মহাহারামি। সবার সঙ্গে ফাজলামি করত। ফিজির-এর নবী স্যারের মতো কড়া লোকে
ক্লাসে ও একদিন বাঘের একটা মুখোশ পরে হাজির। নবী স্যার বেশ অনেকক্ষণ হত
হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সবার নিশ্বাস বন্ধ। না জানি কি হয়। নবী স্যার খুব ঠাণ্ডা গ
বললেন, কি ব্যাপার?

ইদরিস বলল, কোনো ব্যাপার না স্যার। ছোট্ট ভাইয়ের জন্যে কিনেছিলাম। এক
পরে দেখলাম। এখন খুলে ফেলব।

খুব ভালো কথা। নাম কি তোমার?

খামার নাম ইদরিস।

রাসের শেষে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

হ্যাঁ আচ্ছা স্যার।

না। স্যার ইদরিসকে পঁচিশ টাকা ফাইন করে দিলেন।

সেই ইদরিস একদিন বাসায় এসে উপস্থিত। গলায় মাইক লাগিয়ে চিংকার-তুই

না গ্যাটা দাডি-গোফ জ্বালিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেছিস।

চেষ্টা করছি।

ওনলাম বেকার।

আগে তো শুনেছিস এবার স্বচক্ষে দেখ।

হা হা হা। ব্যাটা তোর রস কয়েনি দেখি। চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

একটা ব্যবস্থা করে দেই।

কি ব্যবস্থা করবি?

বিজনেসে লাগিয়ে দেই। একটা ইনডেনটিং ফর্ম বুলে ফেল।

সেটা আবার কি?

কাগজে-কলমে ব্যবসা। দালালি যাকে বলে।

করতে হয় কি?

কিছুই করতে হয় না। বড় বড় কানেকশন থাকতে হয়। তোর তা আছে। তোর
পরের তো বিরাট মালদার পার্টি। চল তোকে নিয়ে বের হই।

রফিক বের হলো। সারাদিন ঘুরল। ব্যবসার কথাটোষা বলল।

বুবলি রফিক, তোর ব্রেনই আছে, তুই এই লাইসেন্স উন্মুক্ত করবি। ব্যবসা বুঝে নিতে
মাস ছয়েক লাগবে, তারপর দেখবি আঙুল ফুলে বটগাছ। মানুষের বেলায় সাধারণত
এলাগাছ হয় আমার ধারণা তোর বেলা হবে বটগাছ। যাকে বলে বটবৃক্ষ।

ক্যাপিটেল লাগবে না?

তা তো লাগবেই। লাখ তিনেক টাকা শুরুতে লাগবে।

সর্বনাশ। নয় মণ তেলও হবে না রাখাও নাচবে না। তিন লাখ টাকা কে দেবে
আমাকে?

ব্যাংক দেবে।

ব্যাংক কেন দেবে?

কেনর প্রশ্ন তুলিস না। ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ টাকা দশ ভূতে লুটে থাকে। ব্যাংকগুলি
হচ্ছে কিছু সুবিধাবাদী লোকের টাকা মারার যন্ত্র, তোকে আমি লোন পাইয়ে দেব।

তোর স্বার্থ কি?

আছে, স্বার্থ আছে। বিনা স্বার্থে আমি কিছু করব না কি? ইদরিস সেই ইদরিস নয়।
এখনই সেটা বলব না। তুই আগে মনস্থির কর বিজনেস করবি না আদর্শ বাঙালি ছেলের
মতো দশটা-পাঁচটা অফিস করবি। তোকে সাতদিন সময় দিলাম। সাতদিন বসে বসে
ভাব। এই সাতদিন আমার অফিসের কাজকর্ম দেখ। লোকজনের সঙ্গে কথাটোষা বল।
তারপর এসে বল-ইয়েস অর নো।

আজ রফিকের সেই সাতদিনের শেষ দিন। সন্ধ্যা বেলায় ইদরিসকে বলতে হবে। রফিক ঠিক করেছে সোবাহানের এখান থেকে বের হয়েই সে সোবাহানের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হবে। হ্যাঁ বলবে। না বলার কোনো অর্থ হয় না।

সোবাহান দীর্ঘ সময় হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, বাবসা হবে। লেগে যান।

সত্যি বলছেন?

যা দেখছি তাই বললাম। আপনার হবে।

মেনি থ্যাংকস। তাহলে উঠি?

উঠবেন?

আমার একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। একজনের কাছে যাব।

ইদরিসের বাসা কলাবাগানে লেক সার্কাসে। বিশাল তিনতলা দালান। সামনে ফুলের বাগান। ফোয়ারা, কালো পাথরের কি একটা মূর্তি অনেকটা মধুরের দেখতে। যদিও এটা মধুর না। ইদরিস বাসায় ছিল না। সে এলো রাত এগারোটা অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে রফিক। যায়নি। এখনো বসে আছে। স্কিদের যন্ত্রণা যাবার মতো অবস্থা। এক ফাঁকে রাস্তার এক রেইটরেন্ট থেকে দুটো পরোটা এবং টাকার ভাঙ্গি কিনে খেয়েছে। এইসব জিনিস সহজে হজম হতে চায় না। তাও হজম দ্বিতীয়বার যখন স্কিদে পেল তখন ইদরিসের গাড়ি গेट দিয়ে ঢুকল। গাড়ি থেকে নামার সামর্থ নেই। দু'তিন জন ধরে ধরে নামাল। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার হয়েছে?

ইদরিস হাসি মুখে বলল, কিছুই হয় নাই দোস্ত। মদিরা পান করেছে। সাত একদিন মোটে খাই। আজ হচ্ছে সেই দিন। তোর কি ব্যাপার?

আজ থাক অন্য একদিন বলব।

অন্যদিন বলার দরকার কি আজ বল। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না মাথা পরিষ্কার আছে। হ্যাঁ নাকি না?

হ্যাঁ।

ওড। কাল অফিসে আসবি। এগারোটার আগে আসবি।

ঠিক আছে আসব।

মুনির মিয়া আমার দোস্তকে বাড়ি পৌছে দাও।

বলতে বলতেই ইদরিস হড় হড় করে বমি করল। যে দু'জন তাকে ধরে রেখেছিল তাদের একজন নোংরায় মাখামাখি হয়ে গেল। কিন্তু মুখ বিকৃত করল না। এই দু'সম্ভবত এদের কাছে নতুন নয়।

রফিক আহিস এখনো?

আছি।

জিনিসটা সহ্য হয় না তবু খাই। তোর কাছে থাকা বলেছিলাম, সত্যি একদিন রোজই খাই। রোজই এই অবস্থা।

তাহলে তো চিন্তার কথা।

দ্রব্যের কথা তো ঠিকই। মদ খেয়ে কোম্পানি লাটে তুলে দিয়েছি। তোর কাছে
কিনা। এলব নায়ে ভাই, লাখ লাখ টাকা আমার দেনা। ডুবে যাচ্ছি বুঝলি। তোর লেজ
করে এখন ভেসে উঠতে চাই।

দরিস আবার বমি করতে লাগল। গেটের দারোয়ান এগিয়ে এসে রফিককে বলল,
শাও আপনি চলে যান। একটা রিকশা নিয়ে চল যান।

রফিক যেতে পারছে না। মাতালরা বমি করতে করতে সত্যি কথা বলতে থাকে এই
দৃশ্য সে কোনো ছবিতেও দেখেনি। বড় অবাক লাগছে।

রফিক আছিস?

আছি।

আমার জীবন নষ্ট হয়ে গেলরে দোস্ত। এক বেশ্যা মেয়ের জন্য নষ্ট হয়ে গেল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মাগীর নাম কাক্সন। বুঝলি আমি এক নরাধম। আচ্ছা দোস্ত 'নরাধম' কি সন্ধি
না গমাস? সব ভুল মেরে বসে আছি।

দারোয়ান আরেকবার রফিকের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, বাড়ি যান
শাও। আপনি থাকলে সমস্যা।

রফিক নড়ল না। দৃশ্যের শেষটা তার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।



আজ শাহানা এসেছে। বিয়ের পর এই তার তৃতীয়বার আসা। বাড়িটা তার এখন
কিছুতেই আগের মতো লাগে না। এটা যেন অচেনা কোনো মানুষের বাড়ি। নিজের বাড়ি
নয়। অথচ সব আগের মতোই আছে। শাহানার লাগানো টবের গাছগুলি আগের চেয়েও
সুন্দর হয়েছে। সে এ বাড়িতে নেই তাতে এদের যেন কিছু যায় আসে না। সে যদি এসে
দেখ তো তার অনুপস্থিতিতে এ বাড়ির সবাই পানি দিতে ভুলে গেছে। গাছগুলি শুকিয়ে
মরা মরা হয়েছে তাহলে তার ভালো লাগতো।

সুন্দর সতেজ গোলাপ গাছগুলি দেখে তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। কত ফুল
ফুটেছে। বিরাট বিরাট ফুল। সে প্রতিটি গাছেই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে লাগল।
গোলাপের দু'টি কচি পাতা নিয়ে দু'আঙুলে পিষে নাকের সামনে ধরল ফুলের ঘ্রাণের
চেয়ে তার পাতার ঘ্রাণ ভালো লাগে। টুনী এবং বাবলু কৌতূহলী হয়ে দেখছে। টুনী
বলল, কি করছ ফুপু?

গাছগুলিকে আদর করছি।

আদর করছ কেন?

অনেক দিন পরে এসেছি তো ভাই। বাবলু শুধু বের কি ববর?

বাবলু জবাব দিল না। পর্দার আড়ালে সরে গেল। তার লজ্জা বড় বেশি। তা ছাড়া
শাড়ি-গয়নায় এখন শাহনাকে অপরিচিত লাগছে। টুনী বলল-ফুপু, বাবলুর বাবা এসেছিল।

তাই নাকি?

ইঁ। মা খুব বকা দিয়ে দিয়েছে।

বকা দিয়েছে?

ইঁ। মা একদিন আব্বুকেও বকা দিল।

ভাবী মনে হচ্ছে বকা দেয়ায় ওস্তাদ হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ হচ্ছে। দাদিকেও বকা দিল এই জনো দাদীর অসুখ হয়ে গেল।

আমি থাকলে হয়তো আমাকেও বকা দিত। কি দিত না?

হ্যাঁ দিত।

টুনী মুগ্ধ হয়ে শাহানাকে দেখছে। তার খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর ~~হয়েছে~~
কুপুমণি। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

এমন ডাব ডাব করে কি দেখছিস রে টুনী।

তোমাকে দেখছি। তুমি কত সুন্দর হয়েছ।

নতুন করে আবার হব কিরে বোকা? আমি তো আগে থেকেই সুন্দর তাই না?
ইঁ।

আচ্ছা টুনী, আনিস ডাই আর ফুল নিতে আসে না? গোলাপের ম্যাজিক দেখাও
তার ফুল লাগে না?

ম্যাজিক দেখায় না তো।

সে কি! কি করে এখন?

মাষ্টারী করে।

বলিস কি?

শাহানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ~~তাই~~
চেহারাটা কেমন দুখী হয়ে গেল। সে মৃদু গলায় বলল, চট করে ছাদে গিয়ে দেখে আ
তো আনিস ডাই আছে কি না। আমার কথা কিছু বলবি না খবরদার। বললে চড় খাবি।
শাহানা মার ঘরে ঢুকল। মনোয়ারা গম্বীর মুখে শুয়ে আছেন। গলা পর্যন্ত চাদর টানা।
শাহানাকে ঢুকতে দেখেও কিছু বললেন না। শাহানা বলল, অসময়ে শুয়ে আছ যে মা!
জ্বর নাকি?

মনোয়ারা জবাব দিলেন না। মেয়ের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। আমার
উপর রাগ করেছ নাকি মা?

না রাগ করব কেন?

তাহলে এমন রাগী রাগী মুখ করে রেখেছ কেন?

বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের উপর রাগ করব কোন সাহসে?

তার মানে?

পরের বাড়ির মেয়ে রাতের পর রাত হাসপাতালে থেকে আমার সেবা করে। আর
নিজের পেটের মেয়ে একবার খোঁজ নিতেও আসে না।

শাহানা লজ্জিত হয়ে বলল, আমরা চিটাগাং চলে গিয়েছিলাম মা। আমার
একেবারেই যাবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ও এমন করে বলল।

গিয়েছ ভালো করেছ। শুধু চিটাগাং কেন? হিল্লি যাও দিল্লি যাও। কাশ্মির যাও।

নাওয়ারা পাশ ফিরলেন। শাহানা কিছু সময় বসে রইল তাঁর বিছানায়। মা'র রাগ মনে পড়ে চট করে ভাঙানো যাবে না। মাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করতে লাগল। কিন্তু কেন জানি তার কান্দতে ইচ্ছে করছে না। সে যে মাকে দেখতেও যায়নি তার মতো খুব অনুশোচনাও বোধ হচ্ছে না। সে এমন বদলে গেল কেন?

শাহানা মা'র ঘর থেকে বের হয়ে আবার বারান্দায় তার টবের গাছগুলির কাছে গেল। সেখান থেকে বসার ঘরে। তার কিছু করার নেই।

বসার ঘরে জহির চুপচাপ বসে আছে। হোসেন সাহেব অতি উৎসাহে তাঁর ওপাখিক গল্প করছেন।

দুইজনে জহির যাকে বলে মিরাকল। কিডনি ভর্তি গজগজ করছিল পাথর। সবচেয়ে খারাপের সাইজ পায়রার ডিমের মতো। দাস বাবু রোগীকে দিলেন থ্রি হানড্রেড পাওয়ারের কেলিফস। মজার ব্যাপার কি জানো?

কিডনির পাথরের জন্যে কিছু ফনা।

কাজ হলো কেলিফসে?

হবে না মানে? বললাম না মিরাকল। দু'টা মাত্র ডোজ, প্রথম ডোজের আটচল্লিশ মিনিট পর সেকেন্ড ডোজ। অল ক্রিয়ার।

বাহু খুব আশ্চর্য।

আশ্চর্য তো বটেই। একত্রে করে দেখা গেল পাথরের বংশটাও নেই (ভ্যানিশ) অল মনে।

শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাবার বক্তৃতা শুনল। এমন মজা লাগছে শুনতে। কেমন শিশুর মতো ভঙ্গিতে বাবা কথা বলেন। বিস্তৃত হবার কি অসাধারণ ক্ষমতা এই মানুষটির।

হোসেন সাহেব মেয়ের দিকে একপলক তাকিয়েই ছোট ধমক দিলেন, জহিরকে চা-টা কিছু দে। তেঁর কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?

শাহানার কাছে এই ধমক বড় মধুর লাগল। ঠিক আগের মতো বাবা তাকে ধমক দিলেন। যেন এখনো তার বিষে হয়নি। সে বাড়িরই একটি আদুরে মেয়ে যে কোনো কাজ কর্ম শিখেনি। শুধু গল্প শুনে।

আবেগে শাহানার চোখ ভিজে উঠল। সে এগিয়ে গেল বান্নাঘরের দিকে।

বান্নাঘরে নীলু খুব ব্যস্ত। একটি চুলায় সে ফুলকপির বড়া ভাজছে। অন্যটিতে চায়ের পানি ফুটছে।

বাবা চা চাচ্ছেন ভাবী।

দিল্লি। বড়াগুলি হয়ে যাক।

চা-টা আমি বানাই?

তোমাকে কিছু করতে হবে না। মা'র সঙ্গে গিয়ে গল্প শুনো।

তুমি আজ অফিসে যাওনি?

না আমি দশ দিনের ছুটি নিয়েছি।

কেন?

অনেক ব্রকম কামেলার মধ্যে আছি। কবির মামার জন্যে হাসপাতালে খাবার

পাঠাতে হয়। এদিকে মা'র অসুখ। তোমার কিন্তু একবার কবির মামাকে দেখতে গিয়ে উচিত শাহানা।

যাব। কাল-পরশুর মধ্যে যাব।

কবির মামা তোমার কথা আর জহিরের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। নাও একটা কথা খেয়ে দেখো তা কেমন হয়েছে। সস দিয়ে মাখিয়ে খাও। কি ভালো?

খুব ভালো হয়নি ভাবী। কেমন যেন ঘাসের মতো লাগছে।

নীলুর মুখ কালো হয়ে গেল। সে খুব যত্ন করে বানিয়েছে। শাহানা বনল, করছিলাম ভাবী। খুব চমৎকার হয়েছে।

সত্যি। এই যে তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। ছোট ভাবী কোথায়?

নিউ মার্কেটে গিয়েছে, এসে পড়বে। যাও ভো শাহানা এগুলি দিয়ে আস। আমি নিয়ে আসছি।

শাহানা ট্রেতে খাবার সাজাতে সাজাতে বনল, এ বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দ না ভাবী।

নীলু চুপ করে রইল। লক্ষ্য বার শাহানার মুখে এই কথা তার শুনতে হয়েছে। জবাব দিতে হয়েছে। জবাব শাহানার পছন্দ হয়নি। যে কোনো কারণেই হোক ব্যাশাখী শাহানার মনে গঁধে গিয়েছে। এই কাঁটা সহজে তোলা যাবে না।

ভাবী।

তুচ্ছ। বলো কি বলবে।

মা'র অসুখ হয়েছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, এই খবর কেউ আমাকে দো নি।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়নি কিন্তু দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ দেয়ার উপায় ছিল না। তোমার ভাই এবং রফিক কেউ বাসায় ছিল না। ওরা ফিরেছে অনেক রাতে।

ইচ্ছে করলে কিন্তু দেয়া যেত ভাবী। হাসপাতাল থেকে সহজেই টেলিফোন করতে পারতে। আমার টেলিফোন নাম্বার তোমরা জানো।

ঝামেলার মধ্যে এটা মনে আসেনি।

আমাকে যদি তোমরা পছন্দ করতে তাহলে ঠিকই মনে আসত।

নীলু হেসে ফেলল। শাহানা শুকনো গলায় বললো, ভাইয়া এত বড় প্রমোশন পেয়েছে। এই খবরও কিন্তু দাওনি।

দিতে চেয়েছিলাম। তোমার ভাইয়া নিষেধ করল। তার স্বভাব তেমন জানো। কাউকেই কিছু জানাতে চায় না।

নীলুর কথা শেষ হবার আগেই শাহানা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার রীতিমত কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেন সে এ বাড়িতে এসেছে। কেনো দরকার ছিল না। কেউ তাকে নিয়ে ভাবে না। সে কেন ভাববে? তার এমন কি গরজ? টুনীকে আনিস ভাইয়ের খবর আনতে পাঠিয়েছিল। সেও ফিরে আসেনি। কেউ বা আসবে? সে তাদের কে? কেউ না।

শাহানা খাবার কিছুই মুখে দিল না। দু'চুমুক চা খেয়ে ছাদে গেল। আনিসের ঘর

খান। সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হালকা স্বরে বলল, আসব আনিস ভাই? আনিস খান। বিষয় চাপা দিয়ে হাসি মুখে বলল, আরে কি মুশকিল, এসো।

করছেন কি?

ভেমন কিছু না। বসো শাহানা।

বসবার সময় নেই। দাঁড়িয়ে চলে যাব। ম্যাজিক নাকি ছেড়ে দিয়েছেন?

কে বলল?

তুনি। এখন নাকি মাষ্টারী করেন?

পাগল হয়েছ? মাষ্টারী করব কোথায়? দুটা প্রাইভেট টিউশ্যানি জোগাড় করেছি।

খান। বেলা তাই করি। খানা জোগাড় করতে হবে না? ম্যাজিক দিয়ে পেটে ভাত আসছে

না। একটু বসো না শাহানা।

শাহানা বসল। আনিস বলল, চা খাবে? চা বানাব?

ইঁ বেতে পারি। আচ্ছা আনিস ভাই, আপনাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিলাম পেয়েছিলেন?

পেয়েছি।

একবার তো জিজ্ঞেস করলেন না আমার কি অসুখ হয়েছিল।

চোখের সামনে তোমাকে এত সুস্থ দেখছি যে অসুখের কথা আর মনে এল না।

এখন অন্তত জিজ্ঞেস করুন।

কি হয়েছিল?

খুব খারাপ ধরনের অসুখ। আমি বোধহয় বেশি দিন বাঁচব না।

কি বলছ তুমি?

সত্যি বলছি। বিশ্বাস করুন। এই খবরটা আর কাউকে বলিনি। শুধু আপনাকে বললাম।

অসুখটা কি?

তা আমি জানি না।

শাহানা তার মুখ খুব করুণ করতে চেষ্টা করল। যেন তার সত্যি সত্যি খুব খারাপ একটা অসুখ হয়েছে। মৃত্যু অবধারিত। আর মাত্র অল্প ক'দিন সে বাঁচবে। পৃথিবীর চমৎকার সব দৃশ্য আগের মতোই থাকবে। বর্ষা রাতে বৃষ্টি পড়বে ঝমঝম করে। চৈত্র মাসে উথালপাথাল জোছনা হবে। শুধু সে দেখতে পাবে না। ভাবতে ভাবতে তার চোখে পানি এসে গেল। গাল বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে কিন্তু আনিস সেটা দেখছে না। সে চা বানানোয় ব্যস্ত। অথচ শাহানার খুব ইচ্ছা আনিস দৃশ্যটা দেখুক।

আনিস না দেখলেও জহির দৃশ্যটি দেখল। সে ছাদে এসেছিল সিগারেট খাবার জন্যে। আনিসের ঘর খোলা দেখে উকি দিয়েই চট করে সরে গেল। ছাদের এক কোনায় দাঁড়িয়ে পর পর দু'টি সিগারেট শেষ করে নিঃশব্দে নেমে গেল। আনিসের খোলা দরজা দিয়ে তার আরেকবার তাকানোর ইচ্ছে ছিল কিন্তু তাকে বাঁধে না। সব ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিতে নেই। সে নিচে নেমে এলো।

বসার ঘরে দ্বিতীয়বার ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। হোসেন সাহেবের হোমিওপ্যাথিক গল্ল তাকে কখনো আকর্ষণ করেনি আজ আরো করছে না। ঘরে ঢুকলেই তিনি আবার

গুরু করবেন। হাসি হাসি মুখে গল্প শুনতে হবে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে হবে।
মনে হয় খুব আগ্রহ নিয়েই শুনছে।

এই যে জহির তুমি এখানে?

জি।

হোসেন সাহেবের হাতে মোটা একটা বই। তিনি দ্রুত বইয়ের পাতা ওপালা
লাগলেন, তোমাকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কেইস হিষ্ট্রি পড়ে শুনাই।

জি আচ্ছা।

বিরক্ত হচ্ছ না তো আবার?

জি না বিরক্ত হব কেন?

আসো ঘরে আসো।

তারা ভেতরে গিয়ে বসল। জহির প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল মুখ হাসি
রাখতে। হোসেন সাহেব কি বলছেন তা শুনতে। কিন্তু মন বসছে না। হোসেন সাহেব
চোখ বড় বড় করে বলছেন-

বিমলা নামের একটা মেয়ের কেইস হিষ্ট্রি। বয়স একুশ, বিবাহিতা, গার্ল বর্ণ গো
একহারা গড়ন, মৃদুভাষী, ভোগী স্বভাব, কিছুটা অলস। পয়েন্টগুলি মন দিয়ে শুনছে
প্রতিটি পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ডায়াগনোসিস এই পয়েন্টগুলির উপর হবে।

আমি মন দিয়েই শুনছি।

আরেক কাপ চা খেয়ে শুরু করা যাক। কি বলো তুমি?

না থাক।

থাকবে কেন? ষাও আরেক কাপ। আমি বৌমাকে বলে আসছি। তোমাকে পেয়ে
ভালোই হলো। কারো সঙ্গে ডিসকাস করতে পারি না। কেউ উৎসাহ দেখায় না। তোমা
ভালো লাগছে না শুনতে?

জি লাগছে।

লাগতেই হবে। গল্প-উপন্যাসের চেয়ে এগুলি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।

হোসেন সাহেব চায়ের কথা বলতে গেলেন।

জহিরদের রাতে এ বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল না, নীলুর পীড়াপীড়িতে খেয়ে যেতে
হলো। অল্প সময়েই ভালো আয়োজন হয়েছে। রফিক নিউ মার্কেট থেকে বিশাল
সাইজের কৈ মাছ নিয়ে এসেছে। মটরপোলাও, কৈ মাছ ভাজা এবং ভুনা গোশত। বেতে
বসে শাহানা বলল, আনিস ভাইকে ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয়? বেচারার বোধহয় আল
ভর্তা দিয়ে ভাত খাবে।

নীলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল শাহানার দিকে। শাহানা সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝল
না। সে হাসি মুখে বলল, ভাবী আনিস ভাইকে আমি ডেকে নিয়ে আসি? তোমাদের
খাবারে কম পড়বে না তো আবার?

নীলু কিছু বলার আগেই জহির বলল, কম পড়বে কেন? তোমরা খাওয়া শুরু করো
আমি ডেকে নিয়ে আসছি।

শাহানা বলল, তোমার যেতে হবে না, আমি আসছি। যাব আর আসব।

শাহানা বের হয়ে গেল। জহির তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। নীলু কি তা বুঝতে

শাহানা? সে একবারও জহিরের দিকে তাকাচ্ছে না। হোসেন সাহেব বললেন, হাত গুটিয়ে
খাওয়া-খাচ্ কেন, খাওয়া শুরু করো।

জহির বলল, আনিস সাহেব এলেই শুরু করব।

আনিসকে পাওয়া গেল না। সে প্রাইভেট টিউশনিতে গিয়েছে। শাহনাকে দেখে
মন হলো সে খুব মন খারাপ করেছে। তার মুখ শুকনো। চোখ দু'টি ছায়াচ্ছন্ন।

হোসেন সাহেব বললেন, অপূর্ব রান্না হয়েছে বৌমা। অপূর্ব! কৈ মাছ কি আরেকটা
লোনা যাবে?



রফিকের ধারণা ছিল মাতাল অবস্থায় লোকজন সত্যি কথা বলে। সে অবশি
মাতাল দেখেছে খুব কম। যাদের দেখেছে তাদের সবই কুলি বা রিকশাওয়ালা শ্রেণীর।
এদের একজন কাপড়-চোপড় খুলে মেয়েদের দিকে অশ্লীল ভঙ্গি করছিল। এতে পাশের
পাবলিক ক্লেপে গিয়ে তাকে ধোলাই দিতে শুরু করে। সে হাত জোড় করে বার বার
বলতে থাকে-ভাই মাফ করেন। আর জীবনে মদ খামু না। এই কানে ধরলাম ভাই।
দ্বিতীয় মাতালটি একটি ঠেলাগাড়ির উপর বসে বেশ ককরণ সুরে গান গাচ্ছিল।
ঠেলাওয়ালা সবাইকে হাসি মুখে বলতে বলতে যাচ্ছে-ব্যাটা মদ খাইছে। ঠেলাওয়ালাকে
খুব হাসি-খুশি মনে হচ্ছিল। একজন মাতাল তার গাড়িতে বসে সবার চিত্ত বিনোদনের
চেষ্টা করছে এটা বোধহয় তাকে খুব আনন্দ দিচ্ছিল। পাবলিকও দৃশ্যটিতে মজাই
পাচ্ছিল।

মাতালরা সত্যবাদী হয় এরকম ধারণা হবার মতো কোনো কারণ রফিকের জানা
ছিল না। তবু কেন জানি সে একটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরেই নিয়েছিল। ইদরিসের
ব্যাপারটা সেই কারণে তাকে চিন্তায় ফেলে দিল। ব্যাটার মতলবটা কি?

বেশ কয়েকবার যাওয়া-আসা করেও তার মতলব পরিষ্কার হলো না। বরং মনে
হলো সত্যি সত্যি ইদরিস রফিকের জন্যে কিছু করতে চায়। ব্যাংক লোনের জন্যে
ক্লাসিফাইড ছোট্টাছুটিও সে বেশ আগ্রহ নিয়ে করেছে। তার চেয়েও অল্পত কথা মাতাল
অবস্থায় ঐ রাতে সে যা বলেছে তার কোনোটিই দেখা গেল সত্যিই নয়। ধর-দেনা তার
একেবারেই নেই। মদ সে সপ্তাহে একদিনই খায় তাও নিজের পর্যায়ের নয়। অন্যদের
পর্যায়।

কাঞ্চন বলে একটা মেয়ের অন্তিৎ অবশি আছে। কলকাতা ধরনের মেয়ে। ইদরিস
তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মেয়েটিকে প্রায়ই ক্লায়েন্টস কাফে পাঠায়। কাঞ্চন সেই
উপলক্ষে মোটা কমিশন পায়। ব্যাপার এইটুকুই।

রফিক একদিন বেশ অবাক হয়েই বলল, মাতাল অবস্থায় তুই ডাहा মিথ্যা কথাগুলি
বললি?

ইদরিস হাসি মুখে বলল, সত্যি কথা বলব আমি? পাগল হয়েছি? ব্যবসা করে ?
না। সত্যি কথা বললে ভাত জুটবে?

ব্যবসায়ী হলেই সারাক্ষণ মিথ্যা কথা বলতে হবে?

তা তো হবেই সত্যি কথাগুলি এমনভাবে বলতে হবে যাতে শুনলে মনে না
মিথ্যা। হা হা হা। তারপর যখন ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে যাবে তখন কদাচিৎ
বলা একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে।

তখন কথা বলবে ভাড়া করা লোক। বুঝতে পারছিস?

এখনো পারছি না তবে চেষ্টা করছি।

বিরিট ব্যবসায়ীরা দেখবি ব্যবসা নিয়ে একেবারেই কথাবার্তা বলে না।
কথাবার্তা বলে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে।

তাই নাকি?

তাকে একদিন এরকম একজনের কাছে নিয়ে যাব। বিড়ির বিজ্ঞানস করে
হয়ে গেছে। এখন রবীন্দ্রচর্চা করে। বিরিট এক প্রবন্ধও লিখেছে—রবীন্দ্র কাব্যে মুনশাদী
শব্দ।

পয়সা হয়েছে বলেই সে রবীন্দ্রচর্চা করতে পারবে না এমনতো কোনো কথা নেই।

তা নেই। রবীন্দ্রচর্চা, পিকাসোচর্চা সব চর্চার মূল হচ্ছে টাকা। এইটা থাকলে সব
কলার চর্চা করা যায়।

ইদরিসের যোগাযোগ এবং কাজ করবার, কাজ গোহাবার কায়দা দেখে দেখে রফিক
সত্যিকার অর্থেই মুগ্ধ। একটি পয়সা এডভান্স না দিয়ে সে মতিঝিলে রফিকের জামো
দু'কামরার এক অফিস জোগাড় করে ফেলল। টিএন্ডটির বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে
সে কি বলল কে জানে তাঁরা আশ্বাস দিলেন এক মাসের মধ্যে টেলিফোন লাইন পাওয়া
যাবে। ফার্নিচারের দোকান থেকে বাকিতে ফার্নিচার চলে এলো। রফিক মুখ শুকনো করে
বলল, আমার তো ভাই ভয় ভয় লাগছে। সামাল দেব কিভাবে?

সামাল দেয়ার লোকও তোমার জন্যে ব্যবস্থা করেছে। এই লাইনের মহাঘাত লোক।
তোমার নতুন ম্যানেজার। নাম হলো সাদেক আলি। তবে ব্যাটাকে বিশ্বাস করবি না।
তোমার বিশ্বাস অর্জনের সব চেষ্টা করবে। তুইও ভাব দেখাবি যে বিশ্বাস করছিস কিন্তু
আসলে না।

এ রকম একটা লোককে তুই আমার সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছিস কেন?

তোমার ভালোর জন্যেই দিচ্ছি। সাদেক আলি তোমার ফার্মকে দাঁড়া করিয়ে দেবে।
যখন দেখবি তুই নিজে মোটামুটি দাঁড়া হয়ে গেছিস তখন ব্যাটাকে লুপ্ত দিয়ে বের করে
দিবি।

এটা কেমন কথা?

খুবই জরুরি কথা। নয়তো ব্যাটা সর্বনাশ করে উঠবে।

রফিক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সব কিছুই হচ্ছে ঝড়ের গতিতে। এটা কি ঠিক
হচ্ছে? শেষ পর্যন্ত বড় রকমের ঝামেলায় পড়তে হবে না তো? আমও যাবে ছালাও যাবে?
তার ভরসাটুকু কি আসন্ন?

এইসব কথাবার্তা সে অবশিা বাসায় কিছুই বলেনি। শারমিনের সঙ্গেও নয়। শারমিনের সঙ্গে তার একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে। সন্নির কোনোরকম ইশারাও পাওয়া যাচ্ছে না। গাতে দু'জন দু'দিকে ফিরে ঘুমায়। এই অবস্থায় ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা জমে না। শারমিনের সন্দেহবাতিক আছে। এক লক্ষ প্রশ্ন করবে-কেন তোমার এই বন্ধু তোমার জন্যে এত কিছু করেছে? তার স্বার্থ কি? তোমার কতদিনের বন্ধু? কই আগে তো তার নাম শুনিনি। তার আসল মতলবটা কি?

এই জাতীয় প্রশ্ন রফিকের মনেও আছে বলেই সে অন্য কারো মুখ থেকে শুনতে চায় না। তারচে যেভাবে আগাচ্ছে আগাক।

নীলুর সঙ্গে একবার অবশিা কিছু কথা হয়েছে। তাও ভাসা ভাসা কথা। যেমন এদিন রফিক বলল- Arron International নামটা তোমার কেমন লাগে ভাবী? ভালোই লাগে।

এটা হচ্ছে আমার ফার্মের নাম।

ফার্ম আবার কবে দিলে?

দেইনি এখনো। দেব।

ও তাই বসো। এখনো পরিকল্পনার স্টেজে আছে।

ইঁ তবে খুব শিগগিরই ড্রামাটিক একটা ডিক্লোরেশন আমার কাছ থেকে শুনতে পারবে। তখন আকাশ থেকে পড়বে।

তোমার সব ডিক্লোরেশনেই তো ড্রামাটিক।

রফিক আর কিছু বলল না। বেশি কিছু বলতে সাহসও হলো না। যদি ব্যাংক লোন শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায়? ভরী সাধারণত তীরে এসেই ডুবে। মাঝনদীতে ডুবে না।

রফিক চিহ্নিত মুখে ঘুরে বেড়ায়। ব্যাংক লোন নিয়ে ছোট্টাছুটি করতে থাকে। তার নতুন ম্যানেজার-সাদেক আলি। ভালো মানুষের মতো চেহারা। মনে হয় বুদ্ধিবৃত্তি পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। অথচ রফিক এর মধ্যেই বুঝেছে-এ মহাধুরন্ধর।

সাদেক আলিকে নিয়েও রফিক সারাক্ষণ দৃষ্টিভ্রায় ভোগে। তার রাতে ঘুম হয় না। বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নগুলিরও কোনো আগামাথা নেই। একটা স্বপ্ন ছিল এ রকম-সে এবং সাদেক আলি প্রাণপণে ছুটছে। দু'জনের গায়েই কোনো কাপড় নেই। তাদের তাড়া করছে বাবলুর বয়েসি এক দল ছেলে। সাদেক আলি বারবার বলছে-এরা বড় যন্ত্রণা করছে। স্যার, বন্দুক দিয়ে একটা গুলি করেন। এই জাতীয় স্বপ্নের কোনো মানে হয়?

হোসেন সাহেব বসার ঘরে ঢুকে দেখলেন মাঝবয়েসি একজন পরিচিত লোক বসে আছে। লোকটি খুব কায়দা করে সিগারেট টানছে এবং পা নাচাচ্ছে। হোসেন সাহেব বললেন, জনাব আপনার নাম?

স্যার আমার নাম সাদেক আলি।

বলতে বলতে লোকটি এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে মালাম করল। তিনি হকচকিয়ে গেলেন। বিব্রত কণ্ঠে বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমি দি এয়ারন ইন্টারন্যাশনালের জেনারেল ম্যানেজার।

ও আল্লা আল্লা।

স্যার কি আছেন?

রফিক তো চিটাগাং গিয়েছে।

আমি রফিক স্যারের কাছে এসেছিলাম।

ওর কাছে কি জন্মে?

দি গ্র্যারন ইন্টারন্যাশনালের ব্যাংক লোন পাওয়া গেছে এই সুখবরটা শাফিক দেবার জন্যে এসেছিলাম।

হোসেন সাহেব কিছুই বুঝলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বেশিক্ষণ বসতে পারব না। স্যারকে খবরটা দিয়ে দেবেন। স্যার এটা নিয়ে দৃষ্টি করছিলেন।

কি খবর দেব?

বলবেন ব্যাংক লোনটা হয়েছে।

জ্বি আচ্ছা বলব। একটু চা খান।

চা আমি খাই না, তবে আপনি মুকুন্নি মানুষ বলছেন। এই জন্যই খাব।

সাদেক আলি কিছুক্ষণের মধ্যেই জন্মে ফেলল। হোসেন সাহেবের সঙ্গে পুরো একমত হলো যে দেশ থেকে এলোপ্যাথি চিকিৎসা তুলে দেয়া দরকার। প্রতি ডিসেম্বর থাকা দরকার একটা করে হোমিও হাসপাতাল। দরকার একটা হোমিও ইউনিভার্সিটি। হোসেন সাহেব লোকটির আনন্দ-কায়দা ও ভদ্রতায় মুগ্ধ হলেন। রাতে ভাত খাবার সময় নীলুকে বললেন, ম্যানেজার সাহেব বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

কোন ম্যানেজার?

সাদেক আলি সাহেব। রফিকের কাছে ব্যাংকের কি একটা কাজে এসেছে। আমরা তো মা মনে থাকবে না। তুমি রফিককে বলে দিও।

কি বলব?

ম্যানেজার সাহেব এসেছেন। এটা বললেই হবে।

রফিক এলো রাত এগারোটায় দিকে। সে হাসপাতালের কবির মামাকে দেখতে গিয়ে আটকা পড়ে গিয়েছিল। কবির মামার জ্বর হঠাৎ বেড়ে গেছে। আবোলতাবোল কথা বলছেন। অনেকটা বক্তৃতার ঢং। সখু ভাষায় বক্তৃতা-সুধী সমাজের নিকট আকুল আবেদন। হে বন্ধু হে প্রিয়। সংযত হোন। যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করুন। শরৎকালের এই সুন্দর মেঘমুক্ত প্রভাত ...।

রফিক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ব্যাপার কি? মাঝবয়েসি একজন ডাক্তার কখনো মুখে বললেন, বুঝতে পারছি না ডিলেরিয়াম মনে হচ্ছে। ডিলেরিয়াম হবার ক্ষেত্রে জ্বর জে নয়। একশ দুই।

কিছু একটা করুন। মামার এই কুৎসিত বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে না। হাসি এসে যাচ্ছে। এখানে হাসা ঠিক হবে না।

ডাক্তার বিরক্ত মুখে তাকালেন।

আপনি রুগীর কে হন?

ভাগ্নে হই।

আমার মনে হয় রুগীকে বাড়ি নিয়ে ফ্যামিলির কেয়ারে রাখাই ভালো।

শয় অবস্থা নাকি?

!। ধরনের কথা বলছেন? শেষ অবস্থা হবে কেন?

বাবি বাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলছেন। এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

কিন্তু পরে নিয়ে যান।

কিন্তু যদি এ রকম বক্তৃতা শুরু করেন তখন কি করব?

আজার সাহেব বেশ কিছু সময় কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, দয়া করে
মামা সঙ্গে রসিকতা করবেন না। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।

বাইরে তো বসার কোনো ব্যবস্থা নেই।

সেবার ব্যবস্থা না থাকলে হাঁটাইটি করুন।

রফিক আর কথা বাড়াল না। হাসপাতালের বারান্দায় রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত
থাকতে রইল। ফেরার আগে দেখে এলো কবির মামা শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। এখন সে
চলে গেলে দোষ হবে না।

দরজা খুলে দিল শারমিন। শারমিনের মুখ গম্ভীর। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সে
চাপতে চাপতে বলল, বাবো! না বেয়ে এসেছ?

রফিক তার জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। তাদের দু'জনের মধ্যে এখন কথাবার্তা
নেই বললেই হয়। প্রায় রাতেই রফিক বাড়ি ফিরে দেখে শারমিন ঘুমিয়ে পড়েছে।
সেই ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। এখনো জেগে আছে।

শারমিন তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। রফিককে তোয়ালে এগিয়ে দিতে দিতে
বলল, ভাত খাবে?

হ্যাঁ খাব। তোমার থাকার দরকার নেই ঘুমিয়ে পড়ো। যা হয় আমিই ব্যবস্থা করব।

তোমাকে একটি কথা বলার জন্যে জেগে আছি।

বলো।

খেতে বস বলছি।

সিরিয়াস কিছ?

না খুবই সাধারণ। তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা কি বলব?

খুবই সাধারণ কথাগুলি রফিক শুনল। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। শারমিনের বক্তব্যের
সংক্ষিপ্ত হলে সে পিএইচডি করার জন্যে দেশের বাইরে যাবে। খাওয়া এবং ঘুমানোর
এই রুটিন তার আর ভালো লাগছে না।

রফিক হাত ধুতে ধুতে বলল। যাবে কি ভাবে?

শারমিন বলল, অন্য সবাই যে ভাবে যায় সেই ভাবেই যাব। প্রস্তুত করে। হেঁটে
হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব নয়।

সব ঠিকঠাক নাকি?

মোটামুটি ঠিকঠাক বলতে পারো। ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজের ফরেন ইন্ডেন্ট
এডভাইজার আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন আমার একটা টিচিং
এ্যাসিস্টেন্সিপ প্যাপারের সম্ভাবনা আছে।

চিঠি কবে এসেছে?

সপ্তাহ খানেক আগে।

এই এক সপ্তাহ বসে বসে ভাবলে।

হ্যাঁ। আমি ঘুমুতে গেলাম। তুমি বাতি নিভিয়ে এসো।

রফিক বসার ঘরে দীর্ঘ সময় বসে রইল। একবার ভাবছিল জিজ্ঞেস করবে- কে করে দিলেন সাক্ষির সাহেব? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সাক্ষির সে কোনোদিন কিছু বলবে না এ রকম প্রতিজ্ঞা একবার করেছে। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যেই। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা সে ভাঙবে না। তার চা খেতে ইচ্ছে রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই বনিয়ে নিতে পারে কিন্তু আলসী লাগছে। ঘুম ঘুমও পাচ্ছে, সে জানে দিছানায় শোয়া মাত্র ঘুম পালিয়ে যাবে। তার পাশে নিশিতে ঘুমুবে শাওর তার গায়ে হাত রাখলে ঘুমের ঘোরেই সে হাত সরিয়ে নিয়ে বিরক্ত গলায় বলবে- তারচে এখানে বসে বসে মশার কামড় খাওয়াই ভালো।

অনেক রাতে নীলু টুনীকে বাথরুম করাবার জন্যে দরজা খুলল।

কি ব্যাপার রফিক জেগে আছ যে?

ঘুম আসছে না ভাবী।

তোমার কাছে কে যেন এসেছিল। কি এক ম্যানেজার। বাবার সঙ্গে গল্প করছিল রফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখাল না। ক্রান্ত গলায় বলল, শারমিন তোমাকে কিছু বলেছে ভাবী?

কোন প্রসঙ্গে?

বাইরে যাবার ব্যাপারে।

না তো। কোথায় যাচ্ছে?

রফিক জবাব না নিয়ে উঠে পড়ল। বাতি নেভাতে নেভাতে বলল, সকালে বলল বা ডাবা গিয়েছিল তাই। ঘুম আসছে না। পাশেই শারমিন।

গায়ের সঙ্গে গা লেগে আছে তবুও দু'জনের মধ্যে অসীম দূরত্ব। এই দূরত্ব কমানোর কোনোই কি উপায় নেই? রফিক ছোট নিশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। মামার কথাটা ভাবীকে বলা হয়নি। তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। কামেলার ঝামেলা।

রফিক একটু লজ্জিত বোধ করল। নিজের সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য এখন ঝামেলা।

নীলুও জেগে আছে। সন্ধিক বাড়িতে না থাকলে তার এ রকম হয়। সারাক্ষণ চাপা ভয় বুকের উপর বসে থাকে। মনে হয় এ বাড়িতে যেন কোনো পুরুষ মানুষ বড় কোনো বিপদ-আপদ হলে কে সামলাবে? হয়তো আত্মন লেগে পেল, চোর বাড়িতে, কিংবা ডাকাত পড়ল। তখন কি হবে?

নীলু মাঝে মাঝে ভাবে সব মেয়েরাই কি তার মতো ভয়? এই নির্ভরশীল কারণটা কি?

টুনী শক্ত করে তার গলা চেপে ধরে আছে। ফাঁসের মতো লাগছে। বিশ্রী অজানা মেয়েটার। ঘুমের সময় হাতের কাছে যা পাবে তাকে শক্ত করে ধরবে। নীলু কী বলল, টুনী ঘুমচ্ছিল।

টুনী জবাব দিল না।

হাতটা একটু ভালগা কর মা। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

টুনী আরো শক্ত করে গলা চেপে ধরল। ঘুমের ঘোরেই বলল, কমলা খাব না।
মামা তো খাব না।



কবির মামা বাড়ি ফিরে এসেছেন। বাড়ি মানে নিজের বাড়ি নয়—নীলুদের ভাড়াটে ঘর। এ বাসায় কত অসংখ্যবার তিনি এসেছেন, এমনও হয়েছে টানা এক মাস কেটে গেছে—নড়ার নাম নেই। কিন্তু এ বারে এসে কিছুটা অদ্ভুত আচরণ করছেন। যেন তিনি অপরিচিত একটা জায়গায় এসেছেন—লোকজন ভালো চেনা নেই, শারমিনকে জিজ্ঞেস করলেন, মা বাথরুমটা কোন দিকে? বাথরুম কোন দিকে তাঁর না জানার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্নের ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি জানেন না।

রাতে খাবার টেবিলে বসলেন কিন্তু কিছু মুখে দিলেন না। মনোয়ারা বললেন, ভাইজান আপনাকে দুটো রুটি বানিয়ে দেবে? তিনি বললেন—জি না। আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না।

মনোয়ারার বিশ্বয়ের সীমা রইল না। ভাইজান তার সঙ্গে আপনি আপনি করছেন কেন? তিনি তাকালেন নীলুর দিকে। নীলু বলল, মামা আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে? না। আমি ভালো।

মামা আসুন আপনাকে শুইয়ে দি। দুধ গরম করে দিচ্ছি। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ুন।

কবির মামা নিঃশব্দে উঠে পড়লেন। তাঁর খুব খারাপ লাগছে। তিনি এ রকম করছেন কেন? তাঁর গায়ে জ্বর নেই। এ রকম করার তো কথা নয়।

মাখন লাগানো দু'মাইস রুটি আর এক গ্রাস দুধ নিয়ে নীলু কবির মামার ঘরে ঢুকল। মৃদু স্বরে ডাকল,

মামা।

আয় বেটি। আয়।

আপনার জন্যে রুটি আর দুধ এনেছি।

রেখে দাও মা। ক্বিধে পেলো খাব।

না আপনাকে এখনই খেতে হবে। আপনাকে খাইয়ে তারপর আমি খাব।

কবির মামা একটু হাসলেন তারপর নেহায়েৎ যেন নীলুকে মুগ্ধ করবার জন্যেই পাউরুটি ছিড়ে ছিড়ে দুধে ডুবিয়ে মুখে দিতে লাগলেন।

মাখন দেয়া রুটি মামা দুধে ডুবচ্ছেন কেন?

নরম হয়, খেতে সুবিধা।

আপনার খেতে ইচ্ছা না হলে খাবেন না মামা। শুধু দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলুন।

তিনি বাধ্য ছেলের মতো দুধ খেয়ে ফেললেন।

পান খাবেন মামা? একটু পান এনে দেই। মুখের মিষ্টি মিষ্টি ভাবটা যাবে।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, পান তো আমি খাই না। ঠিক তোমার যখন ইচ্ছা দাও।

পান এনে নীলু দেখল মামা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। পড়েছেন বোধ হয়। সে চাপা গলায় বলল, মামা ঘুমিয়ে পড়েছেন?

না জেগে আছি। দাও পান দাও। আর একটু বসো আমার পাশে।

নীলু বসল। তিনিও উঠে বসলেন। নরম গলায় বললেন, আচ্ছা মা তোমার কি আমি কিছু দিয়েছিলাম? নিলু বিস্মিত হয়ে বলল, হঠাৎ এই কথা কেন মামা?

না মানে হঠাৎ মনে হলো। এ জীবনে তোমার কাছ থেকে শুধু সেবাই নিয়েছি। ফেরত দেয়া হয়নি।

আপনার ভালোবাসা যা পেয়েছি সেটা বুঝি কিছু না মামা? তাছাড়া আপনার শান্তির জন্যেই বলছি আপনি বিয়েতে খুব দামী একটা শাড়ি দিয়েছিলেন। নীলু একটা কাতান। চারশ টাকা দাম ছিল শাড়িটার। তখন চারশ টাকায় একটা গদনা যেত।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মামা। আমার বিয়ের শাড়ির দাম ছিল তিনশ টাকা। আমার বড় বোন বললেন বিয়ের শাড়িটা থাক এইটা দিয়েই বৌ সাজিয়ে দেই।

কবির মামা গভীর অগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাই করা হলো বুঝি?

না মামা। বিয়েতে নাকি লাল শাড়ি পরতে হয় তাই সবাই মিলে আমাকে লাল পরাল কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা করছিল নীলটা পরতে।

কবির মামা হাসতে লাগলেন। কোনো এক বিচ্ছিন্ন কারণে এই গল্পে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। তাঁর চোখেও পানি এসে যাচ্ছে। যদিও চোখে পানি আসার মতো এটা না।

মামা।

বলো মা।

তখন তো আপনার নীলগঞ্জ ছিল না। টাকা পয়সা যা পেতেন আমাদের পেছনে খরচ করে ফেলতেন। শুয়ে পড়ুন মামা।

রফিক কি বাসায় আছে মা?

জি আছে। এই কিছুক্ষণ আগে এসেছে।

ওকে কি একটু আমার কাছে পাঠাবে?

পাঠাচ্ছি।

রফিক বেতে বসেছে। কবির মামা ডেকেছেন তখন খুব ব্যস্ত করে বলল, ওও আমার কাছে কি চায়? এখন যেতে পারব না।

নীলু বলল, চট করে “না” বলে ফেলো কেন? একজন অনুস্থ মানুষ ডাকছে, যাবে না?

শুধু ত্যাজবত্যাজ করবে।

যদি করে, হাসি মুখে তনবে সেই ত্যাজবত্যাজর।

তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন ভাবী? আমি তো জাস্ট কথার কথা হিসেবে বলেছি। তুমি পূর্ণাংগ নাও বলে জানো আমি মুখে 'না' বললেও কবির মামাকে দেখতে ঠিকই যাব। হাসি মুখে তাঁর সব ফালতু কথা শুনব। যে ক'দিন উনি হাসপাতালে ছিলেন আমি কি রোজ গিয়ে দেখতে যাইনি?

নীলু লজ্জা পেয়ে গেল। রফিক ভাত শেষ না করেই উঠে পড়েছে। নীলু বলল,
তুমি কি আমার উপর রাগ করলে রফিক?

না ভা করিনি। আমি তো মেয়ে মানুষ না যে কথায় কথায় রাগ করব। আর যদি এঁরও ভাতে কার কি যায় আসে?

রফিক কবির মামার ঘরে ঢুকল।

মামা জেগে আছ?

বস রফিক।

বসব না। যা শুনবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনব। বলো কি বলবে?

তুই আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবি?

কোন জায়গায়?

আগে বল নিয়ে যাবি কি না?

নিয়ে যাব।

বারাসাতে যাব। ঐখানে আমাকে নিয়ে যা।

সেটা আবার কোথায়?

চব্বিশ পরগনা জেলা।

ইন্ডিয়া?

হ্যাঁ, বেনাপোল বর্ডার দিয়ে...

তুমি কি পাগল টাগল হয়ে গেলে নাকি মামা?

জন্মস্থান দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি আর বাঁচব না।

তুমি একা কেন, আমরা কেউ বাঁচব না। জন্মস্থান দেখলে হবেটা কি? ঐখানে গিয়ে মরতে চাও?

তিনি জবাব দিলেন না। রফিক খাটে বসল। নরম স্বরে বলল, জন্মস্থানে মরতে যেমন কষ্ট বিদেশে মরতেও ঠিক সে রকম কষ্ট। মরার কষ্ট সব জায়গায় সমান।

তুই তাহলে নিতে পারবি না?

না মামা পারব না। পাসপোর্ট-ফাসপোর্টের অনেক ঝামেলা। আমার মনে হয় মরতে চাইলে তুমি তোমার সুখী নীলগঞ্জেই মরো। সেটাই ভালো হবে।

তিনি হেসে ফেললেন। রফিকও হাসল। হাসতে হাসতেই বাকল, তুমি আবার আমার উপর রাগ করলে না তো?

না তোর কোনো কথায় আমি রাগ করি না।

খুব ফালতু কথা বলি এই জন্যে?

তাও না। তোর কথাবার্তা ঠিকই আছে। তোর কথাবার্তা আমার পছন্দ। বা শুয়ে পড়।

বারাসাতে যেতে চাচ্ছ কেন?

মনটা হঠাৎ টানছে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি। বারাসাতে শৈশবে কেটেছে। একটা বিরাট পুকুর ছিল, নাম হলো গিয়ে ভূতের পুকুর। ছোটবেলায় দেবার জন্যে এর পাড়ে বসে থাকতাম।

দেবেছ?

না দেখিনি।

মামা আমার কথা শোনো-এখন যদি যাও তোমার খুবই খারাপ লাগবে। দেখা সব বদলে গেছে। ভূতের পুকুর হয়তো ভরাট করে দানান তুলছে। এরচে' শৈশবে শূঁতিটাই থাকুক।

কবির মামা শুয়ে পড়লেন। রফিক মশারি গুঁজে দিতে দিতে বলল, এর পরেও তোমার যেতে ইচ্ছে করে তাহলে কি আর করা, নিয়ে যাব। কি ইচ্ছা করে?

তিনি গাড়ি স্বরে বললেন, হ্যাঁ করে।

রফিক নিশ্বাস ফেলে বলল, মাস তিনেক তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে মামা। আমি একটা কাজ শুরু করেছি। একটু ওছিয়ে নেই।

কি কাজ?

ব্যবসা। মতিঝিলে রুম নিয়েছি। কাউকে কিছু বলিনি। বুধবারে বলব। সবাইকে অফিস দেখিয়ে আনব। তুমি থাকছ তো বুধবার পর্যন্ত?

থাকব। দেখে যাই তোর কাগজখানা।

মামা এখন যাই?

আসছে যা। বাতি নিভিয়ে যা।

শারমিন জেগে আছে। আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। মেয়েদের চুল বাঁধা দৃশ্যটি বেশ সুন্দর। দেখতে ভালো লাগে। রফিক স্বমিক্রণ দেখল। ছনোবন্ধ ব্যাপার। চিরুনি উঠছে-নামছে। উঠানামা হচ্ছে নির্দিষ্ট ভালে। রফিক সিগারেট ধরাল। শারমিন বলল, দয়া করে সিগারেটটা বাইরে গিয়ে খাও।

কেন?

ঘরে কুৎসিত গন্ধ হয় আমার ভালো লাগে না।

গন্ধ তো আগেও হতো তখন তো কিছু বলো নি।

তখন বলিনি বলে কখনো বলতে পারব না এমন তো কোনো কথা নেই। একই বলছি।

রফিক সিগারেট ফেলে দিল। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে শারমিন চুল বাঁধা শেষ করে উঠল। দরজা বন্ধ করে বাতি নেভালো। মশারি ফেলে হালকা গলায় বলল, তুমি কি ঘুমবে না আরো কিছুক্ষণ জেগে বসে থাকবে?

ঘুমব।

বিছানায় উঠতে উঠতে শারমিন বলল, তোমার মতিঝিলের অফিস স্টার্ট হচ্ছে বলে রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, অফিসের খবর তুমি কোথায় পেলো?

কেন এটা কি গোপন কিছু?

না গোপন কিছু না। কাউকে তো বলিনি। তুমি জানলে কিভাবে? কে বলল?

আজ বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাবা বললেন।

তিনি জানলেন কোথেকে?

তিনি জানবেন না কেন! সব তো তাঁরই করা। বেকার জামাই বোধ হয় সহ্য হচ্ছিল না। দূর থেকে কলকাঠি নাড়লেন।

রফিক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এই সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি। রহস্য পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। কেন সব এমন ঘড়ির কাঁটার মতো সহজ হচ্ছিল এটা বোঝা গেল।

শারমিন বলল, দেখে মনে হচ্ছে অধিক শোকে পাখব। স্বপ্তরের সাহায্য নিতে চাও না?

রফিক সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বারান্দায় চলে এলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে পিগারেট টানবে। মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে। ঘুমতে যাবে অনেক রাতে। যখন ঘাবে তখন দেখবে শারমিন পরম তৃপ্তিতে ঘুমুচ্ছে। তার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসবে না। নানা আজেবাজে চিন্তা তার মাথায় ভিড় করবে। একেক দিন একেক জিনিস নিয়ে সে ভাবে। আজ ভাববে শারমিন হঠাৎ করে বাবার কাছে কেন গেল? পিতা-কন্যার মিলন তাহলে হয়েছে। কিভাবে হলো কে জানে। শারমিন নিশ্চয়ই কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, খুব ভাল করেছি বাবা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আর কোনোদিন তোমার অবাধ্য হব না। তুমি যা বলবে তাই শুনব। এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করো।

কবির মামার জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না। সকালের দিকে সুস্থ থাকেন। বিকেল থেকেই কাতর। গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে। ম্যালেরিয়ার রুগীর মতো লেপ জড়িয়েও শীত মানানো যায় না। যদিও অসুখটা ম্যালেরিয়া নয়। ডাক্তাররা নিঃসন্দেহ জীবাণু ঘটিত কিছু নয়। হোসেন সাহেব এই জ্বর নিয়ে খুব উত্তেজিত। তাঁর ধারণা এক সত্ত্বা চিকিৎসা করবার সুযোগ দিলে তিনি হোমিওপ্যাথি যে কি তা প্রমাণ করে দেবেন। এই সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না। কবির মাষ্টার পরিষ্কার বলেছেন, সারা জীবন যে কয়েকটা জিনিস অবিশ্বাস করে এসেছি হোমিওপ্যাথি হচ্ছে তার একটা। এখন শেষ সময়ে যদি হোমিওপ্যাথিতে সেরে উঠি সেটা খুব দুঃখজনক হবে। আমাকে অবিশ্বাস নিয়েই মরতে দাও।

হোসেন সাহেব হাস ছাড়লেন না। নীলুর সঙ্গে পরামর্শ করে গোপনে কবির মাষ্টারের খাবার পানিতে এক পুরিয়া 'কেলিফস' মিশিয়ে নিলেন। নীলুকে বললেন—এক ডোজেই কাজ হবে। দেখবে আজ আর জ্বর আসবে না। একশ টাকা তোমার সঙ্গে বাজি।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার সত্যি সত্যি জ্বর এলো না। আনন্দে উত্তেজনার হোসেন সাহেব অন্য রকম হয়ে গেলেন। রান্নাঘরে ঢুকে নীলুকে বললেন—কি যা বলেছিলাম তা হলো? বিশ্বাস হলো আমার কথা? এত যে তোমাদের অবিশ্বাস। আশ্চর্য! নীলু হেসে ফেলল।

আমার অবিশ্বাস নেই তো।

আছে আছে, তোমারও আছে, সবই বুঝি। টুনীর মাথাব্যথা হচ্ছিল সেই চিকিৎসা

কি করিয়েছ আমাকে দিয়ে? অবিশ্বাস করো আর যাই করো চিকিৎসাটা একবার করে দিয়ে দেখবে? দেখা উচিত নয়?

জি বাবা উচিত।

আমি মা চিন্তা করছি একটা ঘর ভাড়া করে প্রফেশনাল চিকিৎসা শুরু করব। ফার্মেসি দেব। তুমি একটা নাম ঠিক করো ফার্মেসির।

হোসেন সাহেব হুট চিন্তে রান্নাঘর থেকে বেরুলেন। টুনী ও বাবলু বইপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের বললেন-তোরা নিজে নিজে পড় আজ আমি ব্যস্ত। কাজ আছে। তিনি হেমিওপ্যাথির বই খুলে বসলেন।

তার আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। ভোররাতে কবির মামার প্রচণ্ড জ্বর এলো। জ্বরে ঘোরে তিনি হটফট করতে লাগলেন। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাথামাথা উঠে বসে শূন্য দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকান, গম্ভীর গলায় বলেন, "হে বন্ধু হে শ্রী। দেশের দরিদ্র বন্ধু আমার। হে আমার প্রিয় বন্ধু। আজ এই শরতের মেঘমুক্ত প্রভাত..."

কিছুক্ষণ প্রলাপ বকেন তারপর আবার সহজ-স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেন কিছুই হয়নি। নীলুকে বললেন, বৌমা আমার জ্বরটা একটু কমলেই কিন্তু আমি নীলগঞ্জ রওনা হব। সেখানে বড় কোনো ঝামেলা হয়েছে।

নীলু বলল, কোনো ঝামেলা হয়নি মামা। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। মাথায় পাঁচি ঢালছি।

ঝামেলা হয়েছে মা। খুব ঝামেলা নয়তো শওকত আসত। এতদিন হয়ে গেছে ঢাকায় আছি কিন্তু শওকতের কোন বোঁজ নাই।

আপনি এখন কথা বলবেন না তো মামা। প্রিজ।

কবির মামা চোখ বন্ধ করে আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন, "হে বন্ধু হে শ্রী। 'হে দেশবাসী। হে আমার দরিদ্র বন্ধু।

রফিক ডাক্তার আনতে গেল।

হোসেন সাহেব হতভম্ব হয়ে বিছানার পাশে বসে রইলেন। টুনী খুব ভয় পেয়েছে। সে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে।

দুপুরের আগেই জ্বর নেমে গেল। কবির মামা শিং মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে বারান্দায় এসে বসলেন। নীলু অফিসে গিয়েছে। অফিসে জরুরি মিটিং, না গেলেই না। দায়িত্ব দিয়ে গেছে শারমিনের উপর। শারমিন তার দায়িত্ব পালন করছে চমৎকারভাবে। কবির মামা বারান্দায় আছেন, সেও আছে বারান্দায়।

মামা আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

না মা লাগবে না। তুমি খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করো। আমার শরীর এখন ভালো। বেশ ভালো। ইনশাআহ কাল রওনা হব।

অসম্ভব। কাল কিভাবে রওনা হবেন?

রওনা হতেই হবে মা। উপায় নেই। তোমার বাকী একবার বলেছিলেন নীলগঞ্জ যাবেন। আমারও খুব শখ ছিল তাঁকে নিয়ে যাবার। আর সম্ভব হলো না।

সম্ভব হবে না কেন?

কবির মামা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন- মৃত্যু এখন আমার পাশে।

অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে সে হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারি।
আমার সময় কোথায় মা? সময় শেষ মা।

আমি বাবাকে বলব যেন তিনি তাড়াতাড়ি নীলগঞ্জ চলে যান। আমি আজই বলব।
কবির মামা হেসে ফেললেন। বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে তাঁর কিছুনি ধরে
গেল। শীত শীত করছে। আবার হয়তো জ্বর আসবে। তার বড় লজ্জা লাগছে। এ বাড়ির
প্রতিটি মানুষকে তিনি বিবৃত করছেন। সেই অধিকার তাঁর কি সত্যি আছে?

পরদিন তিনি অসুস্থ শরীরেই নীলগঞ্জে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে গেল সোবাহান।
রফিকের যাবার কথা ছিল-তার অফিস উদ্বোধন হবে সে যেতে পারল না। জুটিয়ে দিল
সোবাহানকে। এই লোকটি কোনো রকম আপত্তি করল না।

স্টেশন থেকে বাড়ি অনেকটা দূর। কবির মাষ্টারের হেঁটে যাবার সামর্থ্য নেই।
আবার আকাশ-পাতাল জ্বর। সোবাহান গরুর গাড়ি জোগাড় করে আনল। রওনা হবার
আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আশেপাশে কোথাও ডাক্তার নেই,
নবীনগরে একজন ডাক্তার আছেন-এলএমএফ। কবির মাষ্টার বললেন-নিজের চোখে
দেখো গ্রামগুলির কি খারাপ অবস্থা। ডাক্তাররা কি এই গঞ্জে আসবে? তারা যাবে
শহরে।

সোবাহান বলল, আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করতে থাকুন, আমি নবীনগর থেকে
ডাক্তার নিয়ে আসব।

পাগল নাকি তুমি? বহু দূরের পথ।

কোনো অসুবিধা নেই। এই অবস্থায় আপনাকে নিশ্চয় রওনা হব না। গরুর গাড়িতে
বিছানা করে দিচ্ছি শুয়ে থাকুন। আমি যাব আর আসব।

নবীনগরে ডাক্তার সাহেবকেও পাওয়া গেল না। তিনি বিরামপুর কলে গিয়েছেন।
কখন ফিরবেন ঠিক নেই। নাও ফিরতে পারেন। বিরামপুরের কাছেই তাঁর স্বত্ববাড়ি।
রাতটা হয়ত স্বত্ববাড়িতেই কাটাবেন।

সোবাহান ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল-গরুর গাড়ির
চারপাশে অসংখ্য মানুষ।

চারদিকে খবর রটে গিয়েছে অসুস্থ হয়ে কবির মাষ্টার গ্রামে ফিরেছে। দলে দলে
লোক আসছে। ভীড় ক্রমেই বাড়ছে। বিশাল একদল মানুষ নিয়ে গরুর গাড়ি রওনা
হলো।

আশেপাশের মানুষ জিজ্ঞেস করে কে যায় গো?

কবির মাষ্টার যায়।

কি হয়েছে মাষ্টার সাবের?

শইল খুব খারাপ। উন্টাপন্টা কথা কইতাকে।

কও কি? কি সর্বনাশের কথা!

ক্ষেতের কাজ ফেলে রেখে চাষীরা উঠে আসে রাস্তায়। তারা এক পলক দেখতে
চায় মাষ্টার সাহেবকে। দুটি কথা শুনতে চায়।

সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে। চলমান মানুষগুলির ছায়া ছোট হয়ে আসে। কবির মাষ্টার চোখ মেলে একবার ভিজ্জেন করেন-আর কত দূর সোবাহান? আর যে কতদূর সোবাহান নিজেও জানে না। এই অঞ্চল তার অপরিচিত। তবু সে বলে-এসে পড়েছি। এ তো দেখা যাচ্ছে।

সুখী নীলগঞ্জ সাইন বোর্ড দেখা যায়? বিরাট সাইন বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছি।

কবির মাষ্টার টেনে টেনে হাসেন। সোবাহান কোনো সাইনবোর্ড দেখতে পায় না। শুধু দেখে মানুষ আসছে পিল পিল করে। চিৎকার নেই। হৈ চৈ নেই। নিঃশব্দ মানুষ। মাথা নিচু করে এরা হাঁটিছে।

সোবাহানা।

জি মামা।

শুধু সাইনবোর্ডটাই আছে। নীলগঞ্জকে সুখী নীলগঞ্জ করতে পারলাম না। আফসোস রয়ে গেল।

এক জীবনে তো হয় না মামা। আপনি শুরু করেছেন অন্যরা শেষ করবে। শুরু করাটাই কঠিন। শুরু তো হয়েছে।

আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে মামা?

হচ্ছে। আবার আনন্দও হচ্ছে। কত লোক এসেছে দেখলে।

জি দেখলাম।

কিছুই করতে পারি নাই এদের জন্যে। তবু এরা আসছে। বড় আনন্দ লাগছে সোবাহান। জীবনটা তাহলে একেবারে নষ্ট হয়নি। কি বলো?

জি না। অসাধারণ জীবন আপনার।

পানি খাওয়াতে পারো? বুক শুকিয়ে আসছে।

বট গাছের ছায়ার নিচে গরুর গাড়ি রাখা হলো। চার-পাঁচ জন ছুটে গেল পানির খোঁজে। আশেপাশের বাড়ির বৌ-কিরা সব বেরিয়ে আসছে। এদের মধ্যে অল্প বয়স্ক একটা মেয়ে খুব কাঁদছে। সে নীলগঞ্জের মেয়ে। এই গ্রামে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের দিন খুব গণ্ডগোল হচ্ছিল। জামাইকে সাইকেল দেয়ার কথা সেই সাইকেল দেয়া হয়নি। বিয়ে ভেঙে বরযাত্রীর দল উঠে যাবে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। খবর পেয়ে ছুটে ছুটে এলেন কবির মাষ্টার। ধমথমে গলায় বললেন-সাইকেল আমি দিব। বিয়ে হোক।

কবির মাষ্টারের কথাই যথেষ্ট। বিয়ে হয়ে গেল। তার পনেরো দিন পর নতুন সাইকেল নিয়ে কবির মাষ্টার এসে উপস্থিত। তিনি সাইকেল নতুন জামাইয়ের হাতে দিয়েই আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, সত্যি জাদা ছোটলোক। সাইকেলটা তোর কাছে বড় হলো? তুই একটা মেয়েকে বিয়েও দিন লজ্জা দিলি? তোর এত বড় সাহস?

ছেলেটা ভালো ছিল। সাত দিন পর সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে গেল। লাজুক গলায় বলল, আপনার দোয়া চাই মাষ্টার সাব। আর কিছু চাই না। আপনে খাস দিলে আমার জন্যে দোয়া করেন।

কবির মাষ্টার গম্ভীর হয়ে বললেন-দোয়া লাগবে না। সৎ মানুষের জন্যে দোয়া পাগে না। দোয়া দরকার অসৎ মানুষের জন্যে। তোর বৌটাকে আদর-যত্ন করিস। ভালো মেয়ে।

সেই মেয়েটাই এখন চিৎকার করে কাঁদছে। কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। কবির মাষ্টার বিরক্ত গলায় বললেন-তুই এরকম করছিস কেন? সালাম করেছিস আমাকে? আদর-কাযদা কিছুই শিখিস নাই। নীলগঞ্জের মেয়ে না তুই? গ্রামের বদনাম। আয় সালাম কর। তোর জামাই কই? ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয়।

নীলগঞ্জে ঢোকার ঠিক আগে আগে কবির মাষ্টার মারা গেলেন। নিঃশব্দে মৃত্যু। কেউ কিছুই টের পেল না। সবাই ভাবল বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। সোবাহান তাঁর হাত ধরে বসে ছিল। শুধু সে টের পেল। হাত নামিয়ে দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে এলো। অসংখ্য লোকজন চারপাশে। সবাই নিঃশব্দে হাঁটছে। সেও হাঁটছে তাদের সঙ্গে। এই মানুষটালিকে মৃত্যুর খবর দিতে তার মন চাচ্ছে না।

গরুর গাড়ি নীলগঞ্জের সীমানায় এসে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। নীলগঞ্জের সীমানায় বিশাল এক রেন্টি গাছ। সেই গাছে সাইন বোর্ড ঝুলছে। সেখানে লেখা-

“আপনারা সুখী নীলগঞ্জে প্রবেশ করেছেন। স্বাগতম!”

নীলগঞ্জের সমস্ত বৌ-ঝিরা জড়ো হয়েছে সেখানে। ছুটে ছুটে আসছে শওকত। আজ সকালেই সে থানা হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে। নীলগঞ্জের চেয়ারম্যান তাকে একটা ডাকাতি মামলায় আসামি দিয়েছিল। ওসি সাহেব নিজ দায়িত্বে তাকে জামিন দিয়েছেন। শওকত চোঁচাতে চোঁচাতে আসছে-“কি হইল? আমার স্যারের কি হইল?”

দুপুর বেলার শান্ত-নিশ্চল গ্রাম। করুণ সুরে ঘুমু ডাকছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে এগিয়ে চলছে গরুর গাড়ি। সোবাহান দাঁড়িয়ে আছে রেন্টি গাছের কাছে। তার দৃষ্টি সাইন বোর্ডের দিকে।

“আপনারা সুখী নীলগঞ্জে প্রবেশ করেছেন। স্বাগতম!”

সোবাহানের মনে হচ্ছে সুখী নীলগঞ্জ জায়গাটা বড় পবিত্র। এরকম একটা পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করবার মতো যোগ্যতা তার নেই। তার উচিত এই সীমানা থেকেই বিন্দেয় নেয়া।



খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কবির মাষ্টারের মৃত্যু। এ ধরনের কাউকে তেমন স্পর্শ করল না। রফিক তার নতুন অফিস, নতুন ব্যবসা নিয়ে সন্তুষ্ট বাস্তব। তোরবেলা বেরিয়ে যায় ফিরে অনেক রাতে। সফিকেরও এই অবস্থা। তার দায়িত্ব দিন দিন বাড়ছে। সালফিউরিক এ্যাসিড প্লাস্টের কাজ এগুচ্ছে দ্রুত গতিতে। সফিকের বেশিরভাগ সময়ই

চলে যাচ্ছে সেখানে। যখন বাসায় ফিরে এমন ক্লান্ত থাকে যে ভাত খেয়ে বিছানায় গেকে না যেতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

দায়িত্ব বেড়েছে নীলুরও। সে একটি প্রমোশন পেয়েছে। অফিসে তার এখন বড় আলাদা। ঘরের সামনে টুল পেতে একজন বেয়ারা বসে থাকে। অফিসের নানান সমস্যা নিয়ে তাকে প্রতিদিনই মিটিং করতে হয়। এতসব ঝামেলা তাঁর আগে ছিল না।

হোসেন সাহেবও ব্যস্ত। তিনি একটি বই লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। বইটির নাম-সহজ হোমিওপ্যাথি। যেসব ডাক্তার গ্রামে চিকিৎসা করেন বইটি লেখা হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ্য করে। কাজেই লিখতে হচ্ছে খুব সহজ ভাষায়। তিনি জোর দিচ্ছে কেইস হিস্ট্রিতে। প্রতিটি রোগের জন্যে বেশ কয়েকটা কেইস হিস্ট্রি দিতে হচ্ছে। যেসব খুঁজে বের করতে সময় নিচ্ছে। বেশ কিছু হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করছেন। তাদের এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। এতে হোসেন সাহেবের উৎসাহে ভাটা পড়ছে না।

মনোয়ারা আগের তুলনায় খানিকটা শান্ত। কাজের একটি মেয়ে রাখা হয়েছে, নাম নাজমা। তাঁর বেশিরভাগ সময়ই কাটছে নাজমার খুঁত ধরে। এই মেয়েটার কোনো কিছুই তাঁর পছন্দ নয়। নামটাও অপছন্দ। তাঁর ধারণা নাজমা হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম। কাজের মেয়ের এ রকম নাম থাকবে কেন? নাজমা মেয়েটির বয়স আঠারো-উনিশ। এইটিও তার পছন্দ নয়। এই বয়সের মেয়ে ঘরে রাখা মানে আগুন ঘরে রাখা। কোন দিন কি এক ঝামেলা বাধাবে, ছি ছি পড়ে যাবে চারদিকে। মনোয়ারার বেশিরভাগ সময় এখন কাটছে কি করে মেয়েটিকে তাড়ানো যায় এই বুদ্ধির সন্ধানে। তেমন কোনো পথ পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ নাজমা মেয়েটি খুবই কাজের। অতি অল্প সময়েই সে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে। তবু মনোয়ারা চেষ্টার ক্রটি করছেন না। আজ ভোরবেলা তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই তুই ঘর মুছলি কেন? সকালবেলা পানি দিয়ে ঘর ভাসিয়ে ফেলেছিস।

নাজমা সহজ স্বরে বলল, আইনেই তো কইছিলেন দাদি।

আমি কখন বললাম?

আপনে কইছিলেন সন্তাহে একদিন ঘর ধুইতে।

এই তোর ঘর ধোয়ার নমুনা? পানিতে চারদিক সয়লাব।

কই দাদি পানি তো নাই। শীতের দিনে পানি শুকায় তাড়াতাড়ি।

আসলেই তাই, ইতিমধ্যেই চারদিক শুকনো খট খট করছে। মনোয়ারা কিছুতেই মেয়েটিকে জব্দ করতে পারেন না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন না। তীক্ষ্ণ নজর রাখেন যদি বেচাল কিছু চোখে পড়ে।

এই তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ছাদে গেছিলাম দাদি।

তোকে না বললাম ছাদে যাবি না। ব্যাটা ছেলে থাকে।

কাপড় শুকাতে গিছিলাম।

কাপড় শুকাতে সারাদিন লাগে?

গেলাম আর আসলাম দাদি বেশিক্ষণ তো থাকি নাই।

আবার মুখে মুখে কথা! তুই কি মনে করিস তোর মতলব আমি বুঝি না? আমি কচি খুকি?

বিশ্বাস করেন দাদি আমার কোনো মতলব নাই।

তুই কাল সকালেই বিদ্বান-বালিশ নিয়ে বিদায় হবি। আমার পরিবার কথা।

সত্যি যাইতে বলেন দাদি?

আমি কি তোর সাথে মশকরা করছি? ফাজিল কোথাকার। বড় বৌমা আনুক তোকে আমি আছই বিদায় করব। পাখা উঠেছে।

নীলু এই মেয়েটির বিদায়ের কথা শুনতেই পারে না। নাজমা তাকে অনেকভাবে নিশ্চিন্ত করেছে নীলু এই সুখ হারাতে রাজী নয়। উন্টো মেয়েটার কাছে তার নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। যে সংসার তার দেখার কথা তা দেখছে সংসারের বাইরের একজন মানুষ। মমতা এবং ভালোবাসা নিয়েই দেখছে। এটা যেন ঠিক নয়। অন্যায়। আগে সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব শারমিন পালন করত। তার দায়িত্বও কমেছে। সে এখন পুরো সময় দিচ্ছে পড়াশোনায়।

ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির এ্যাসিসটেন্টশিপের চিঠি এসেছে। ভিসার জন্যে আই টুয়েন্টি তারা পাঠিয়েছে এখনো এসে পৌছায়নি। এখন আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শারমিন রাতদিন পড়ে। রফিক দেবে কিছু বলে না। তারা দু'জন এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন কেউ কাউকে চেনে না।

পরিবারের সবক'টি মানুষকে অস্বস্তিতে ফেনে দিল শওকতের একটা চিঠি-কবির মাষ্টারের কুলখানি। সবাই যেন আসে। সে থাকার ব্যবস্থা গরিবি হালতে করে রেখেছে।

কারোই যাওয়ার ইচ্ছা নেই। অনিশ্চার বিষয়টাও তারা চেপে রাখতে চায়। এই ব্যাপারটা নীলুর মন খারাপ করে দিল। এ রকম কেন হবে? যে মানুষটি এ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্যে গাঢ় ভালোবাসা পোষণ করেছেন তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে করেও এরা কেউ সামান্য ত্যাগ স্বীকার কেন করবে না?

একদিন সে রফিককে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল, কবে যাচ্ছ রফিক? রফিক খুব অবাক হয়ে বলল-কোথায় যাব?

মামার কুলখানিতে যাবে না?

মামার কুলখানি তো দূরের কথা আমার নিজের কুলখানি হলেও যেতে পারব না।

তোমার কি মনে হয় না, যাওয়া উচিত?

না। এসব লোক দেখানো ব্যাপার। মারা গেল ফুরিয়ে গেল। আর কি?

তাই বুঝি?

হ্যাঁ তাই। তাছাড়া এসব কুলখানি হচ্ছে হিন্দুয়ানী ব্যাপার। হিন্দুরা যেমন মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করে ওদের দেখাদেখি আমরা করি কুলখানি।

ধর্মজ্ঞানও তোমার হয়েছে মনে হয়।

তুমি এমন করে তাকাচ্ছ কেন ভাবী? আমার শতক ঝামেলা। আমি পারছি না।

সফিকও যাবে না। সে ছুটির চেষ্টা করেছিল। টলমলান ছুটি দেয়নি। বলেছে-অসম্ভব। আগামী দু'মাস কোনো ছুটি নেই। সামনের মাস থেকে শুক্রবারেও তোমাকে কাজ করতে হবে।

সফিক মনে হলো এতে খুশিই হয়েছে। অন্তত ছুটি না যাওয়ার একটা কঠিন অজুহাত আছে। ঠিক হলো হোসেন সাহেব সোবাহানকে নিয়ে যাবেন। হোসেন সাহেব শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। ঢাকা থেকে গেল শুধু সোবাহান। বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

কুলখানির দিন রাতে সফিক হঠাৎ বলল, অন্যায় হয়েছে নীলু। আমাদের সবার যাওয়া উচিত ছিল। আমার খারাপ লাগছে।

এখন খারাপ লাগলেও তো কিছু করার নেই।

তুমি কল্লনাও করতে পারবে না নীলু ছেলেবেলায় আমার কি পরিমাণ আদর তুমি আমার পেয়েছি।

নীলু চুপ করে রইল। সে এ বাড়ির সবার উপর খুব বিরক্ত হয়েছে। সফিক বলল

আজ অফিসে বসে ডাবছিলাম-কোনোদিন মামাকে আমরা কিছু দেইনি।

তিনি কিছু ফেরত পাবার আশায় নিশ্চয়ই তোমাদের ভালোবাসেননি?

কিন্তু আমাদের এটা দায়িত্ব ছিল।

হ্যাঁ ছিল।

এবার দেখলাম তাঁর সুয়েটারটা ছেঁড়া। আমি কি পারতাম না একটা নতুন সুয়েটার কিনে মামাকে বলতে-মামা তোমার জন্যে এনেছি।

নিশ্চয়ই পারতে।

তাহলে কেন এটা বললাম না?

এখন আর এসব চিন্তা করে লাভ নেই, এসো গুয়ে পড়ো।

তারা বাতি নিভিয়ে দু'জনই গুয়ে পড়ল। কিন্তু কেউই ঘুমুতে পারল না। রাত্ত একটার দিকে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হলো। প্রচণ্ড শব্দে তাদের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল।

দরজা খুলে দেখা গেল-রফিক। সে খরখর করে কাঁপছে। সফিক বলল, কি হয়েছে রে?

রফিক কাঁপা গলায় বলল-সংঘাতিক ভয় পেয়েছি। বসার ঘরে হঠাৎ দেখি কবি মামা বসে আছেন। আমাকে দেখে হাসলেন। আমি চিৎকার নিয়ে উঠতেই দেখি কেউ নেই।

দরজা খুলে সবাই বের হয়ে এসেছে। রফিক লজ্জা পাচ্ছে।

কিন্তু তার ভয় এখনো কাটেনি, সে মৃদু গলায় বলল-আমি সত্যি দেখেছি মামা দেখলাম। মনের তুল না।

নীলু বলল, তোমার মনে অপরাধ বোধ কাজ করেছিল তাই এসব দেখেছ। যাও গুয়ে পড়ো।

ডাবী আমি সত্যি দেখেছি।

এসো তোমাকে চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খেয়ে ঘুমাও।

মনোয়ারা বললেন-চা না ওকে এক গ্রাস লবণ পানি দাও। এটা খাওয়া দরকার। দেখো না কেমন ঘামছে।

রফিক ভালোই ভয় পেয়েছে কারণ তার জ্বর এসে গেল। বেশ ভালো জ্বর- একশ দুই পয়েন্ট পাঁচ। শারমিনকে অনেক রাত পর্যন্ত মাথাব্যপ্তি দিচ্ছিল চালতে হলো। রফিক ক্রীণস্বরে বলল, কেমন ছেলেমানুষী কাণ্ড করলাম বলে তো। দিনের বেলা সবাই এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

করলে করবে তুমি চুপ করে থাকো।

আমি কিন্তু সত্যি দেখেছি। বিশ্বাস করো।

তুমি কিছুই দেখ নি। ডাবী যা বলেছে সেটাই সত্যি।

শ্রুটি দেখলাম শারমিন। কমলা রঙের সুয়েটার গায়ে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

ঠিক আছে থাক। এখন গল্প করতে হবে না। তোমার ভয় লাগছে?

না। ভয় লাগছে না। ভয় কেন লাগবে? তাঁকে যদি দেখেই থাকো তাতে ভয়ের কি? রফিক জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। শারমিন অনেক দিন পর তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে গেল। রফিক বলল, ভয় পেয়ে একটা লাভ হয়েছে। তুমি কাছে এসেছ। কবির মামাকে ধন্যবাদ।

বসার ঘরে বাকি সবাই গোল হয়ে বসে আছে। তাদের কেউই সেই রাতে ঘুমাল না। সবাই যেন কবির মান্নার উপস্থিতি অনুভব করছে। যেন এক্ষুণি ছায়াময় কোনো জগৎ থেকে তিনি দৃশ্যমান হবেন। এক সময় ভোর হলো। গাছে গাছে পাখি ডাকতে লাগল।



নীলু হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে গভীর বিস্ময়।

কি রে এমন করে দেখছিস কেন? চিনতে পারছিস না?

পারছি, পারব না কেন? তোর এ কি হাল হয়েছে?

বন্যা হাসল। হাসি আর থামেই না। আশপাশের সবাই তাকান্ধে। অফিসে এসে কেউ এমন করে হাসে? নীলু বলল-এই তোর কি হয়েছে?

কিছু হয়নি।

এত হাসছিস কেন?

জানি না কেন হাসছি। পাগলটাগল হয়ে যাচ্ছি বোধহয়। তুই আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবি?

নীলু বন্যাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। তার মনে হলো বন্যা ঠিক প্রকৃতস্থ নয়। চেহারা ভীষণ খারাপ হয়েছে। মাথার সামনের দিকে চুল উঠে কপাল অনেক বড় বড় লাগছে। শাড়িতে ইট্রি নেই। ইট্রি ছাড়া শাড়িতে বন্যাকে কল্লনাও করা যায় না। নীলু বলল, তোর কি হয়েছে বল তো?

কিছুই হয়নি।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস?

হঁ সে তো এক বছর আগে। তুই কোনো খোজববর লিখি না। কাজেই জানিস না। কেউ আমার খবর রাখে না।

নীলু লজ্জিত বোধ করল। সে সত্যিই কোনো খোজ নেয়নি। অথচ তার আজকের এই চাকরি বন্যাই জোগাড় করে দিয়েছে। কত উৎসাহে সে ছুটছুটি করেছে। কত কামেলা করেছে।

নীলু, আমাকে হাজার খানেক টাকা দিতে পারবি?

পারব। কাল আসতে হবে। কাল আমি টাকা জোগাড় করে রাখব।

এখন তোব কাছে কত আছে।

পঞ্চাশ টাকার মতো আছে।

পঞ্চাশ টাকাই দে। কাল আবার আসব।

নীলু ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। নিচু গলায় বলল, তোব আর সব খবর বল।

কর্তা কেমন আছে?

জানি না কেমন আছে। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

বলছিস কি তুই?

ভিভোর্স হয়েছে তিন মাস হলো।

নীলু ভয়ে ভলে বলল, তোব বাচ্চাটা কার কাছে থাকে? তোব কাছে?

না।

উনার সঙ্গে থাকে?

না। কারো সঙ্গেই থাকে না। চা খাওয়া তো নীলু। চায়ের সঙ্গে আর কিছু থাকলে

তাও দিতে বল। ক্ষিদে লেগেছে।

ভাত খাবি?

না ভাত খাব না।

বন্যা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগল-বাচ্চাটা মরে গেল বুঝলি। চার মাস হবার আগেই শেষ। ওর খারণা হলো আমার জন্যেই মরেছে। আমি যত্ন নেইনি, অফিস নিয়ে থেকেছি। কি যে কুৎসিত ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিলাম। তাতেও কিছু লাভ হয় না। রোজ ঝগড়া। রোজ হৈচৈ, চিংকার। একদিন কি হয়েছে জানিস? লোকজনের সামনে হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলল...

থাক ওনতে চাই না। এখন কি করছিস তুই?

কিছু করছি না। বড় ভাইয়ের বাসায় থাকি আর ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া করি। ভাবী কি যে ঝগড়া করতে পারে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। ঝগড়ায় কোনো ডিগ্রি থাকলে ভাবী পি এইচ ডি পেয়ে যেত।

বন্যা আবার হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। নীলু তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। বন্যা বলল, আমার হাসি রোগ হয়েছে বুঝলি। গতকাল ভাবী আমাকে কালনাগিনী বলে গাল দিয়েছে। রাগ ওঠার বদলে আমার হাসি উঠে গেল। হাসি দেখে ভাবী মনে করল আমি পাগল হয়ে গেছি। ভয়ে তার চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল। হি হি হি।

নীলু বলল, এই বন্যা। চুপ কর তো।

তোবও কি খারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

না হলেও শিগিরীরই হবে তুই একটা চাকরিটা কর। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাক।

হ্যাঁ তাই করব।

বন্যা উঠে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, যাইরে নীলু। কাল আবার আসব, টাকাটা জোগাড় করে রাখবি।

নিশ্চয়ই রাবব।

কবে ফেরত দেব তা কিন্তু জানি না। নাও দিতে পারি।

টাকা ফেরত দিতে হবে না।

তাহলে তো আরও ভালো।

নীলু বন্যাকে এগিয়ে দিতে গেল। তার খুবই খারাপ লাগছে। ইচ্ছা হচ্ছে বন্যার সঙ্গে চলে যেতে। দু'জনে মিলে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারে। বন্যার ঠিক এই মুহূর্তে একজন বন্ধু দরকার। যে তাকে সাহস দেবে, ভরসা দেবে। মাঝে মাঝে জীবন ভিন্ন ধরনের বইতে থাকে। সব কেমন জট পাকিয়ে যায় তখন একজন প্রিয়জনকে কাছে থাকতে হয়।

নীলু যাই রে।

কাল আসিস।

আসব। একটা কথা নীলু, আচ্ছা তোর কি মনে হয় আমি যদি চাকরি না করতাম যদি বাসায় থেকে বাচ্চার দেখাশোনা করতাম তাহলে সে বাঁচত?

এখন আর এসব নিয়ে কেন ভাবছিস?

ভাবছি না তো। এমনি মনে হলো তাই বললাম।

আর ভাবিস না।

না ভাবব না। বাচ্চাটার জন্যে বড় কষ্ট হয় নীলু ওর নাম রেখেছিলাম অডীক? নামটা সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর।

নামের মানে বলত?

নীলু তাকিয়ে রইল।

সারাদিন তার আর অফিসের কাজে মন বসল না। বন্যার মতো প্রাণময় মেয়ের আজ কি অবস্থা! কি কঠিন দুঃসময়। সন্তানের মৃত্যুর পুরো দায়ভাগ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার উপর। বন্যা নিজেও তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

নীলু ঠিক করল আগামীকাল সে ছুটি নেবে। বন্যা এলেই তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। দূরে কোথাও যাবে বেড়াতে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে কিংবা বলধা গার্ডেনে। কোথায় যেন সে পড়েছিল গাছপালা মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে পারে।

বন্যা পর দিন এলো না। অফিস চারটায় ছুটি হয় নীলু পাঁচটা পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করল। অফিসের গাড়ি চলে গিয়েছে। সে একা একা বাসায় রওনা হলো। রিকশা নিতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভালো লাগছে। সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোয় তার মন কেমন করতে থাকে। জগৎ সংসার তুচ্ছ মনে হয়।

নীলুর হাতব্যাগে এক হাজার টাকা। তার কেন যেন মনে হলো এই টাকা নিতে বন্যা কোনোদিনই আর আসবে না।

শাহানা অসময়ে শুয়ে আছে।

এখন বাজছে সন্ধ্যা সাতটা। অথচ শাহানা মশারি পাঠিয়ে শুয়ে আছে। জহির বিস্মিত হয়ে বলল, ঘুমুচ্ছে নাকি? শাহানা বলল, হ্যাঁ।

একটু মনে হয় সকাল সকাল শুয়ে পড়লে।

ভালো লাগছে না।

ভালো না লাগলে তুয়ে পড়তে হয় নাকি?

কি করব তাহলে?

কত কিছু করার আছে-এই পড়ো, টিভি দেখো, মেয়েদের বাসা থেকে পোকা আসো, শপিং-এ যাও।

শাহানা তার মাথার উপর লেপ টেনে দিল। সে আর কোনো কথাবার্তায় উৎসাহ নয়। এখন সে ঘুমাবে। জহির বলল

শাহানা বাতি নিভিয়ে দেব?

দাও। রাত্রে কিছু খাবে না?

না।

আমার উপর কি কোনো কারণে রাগ করেছ?

শাহানা জবাব না দিয়ে পাশ ফিরল। এর মানে পরিষ্কার বোঝা গেল না। হয়তো রাগ করেছে। অনেক চিন্তা করেও রাগের কারণ কি জহির বের করতে পারল না। বাতি নিভিয়ে বসার ঘরে চলে গেল। টিভি চলছে। পর্দায় নানান ছবি কিন্তু শব্দ নেই। এও শাহানার কাণ্ড। সে সন্ধ্যা হতেই টিভি ছেড়ে সামনে বসে থাকে। শব্দ ছাড়া টিভি দেখে। এর কি মানে কে জানে। চেনা-জানা কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট থাকলে আলাপ করা যেত। তেমন কেউ নেই। জহিরের মনে হয় যে কোনো কারণেই হোক শাহানার মন খারাপ। প্রচুর কাজে তাকে ডুবিয়ে রাখতে পারলে মানসিক এই অবস্থাটা হয়তো কাটত। তাও করা যাচ্ছে না। শাহানা আর পড়াশোনা করতে রাজি নয়। সে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে কিন্তু ক্লাসে যাচ্ছে না। আর পড়াশোনা করবে না এ রকম একটা ঘোষণা গত সপ্তাহে দিয়েছে। জহির বলেছে-কেন পড়াশোনা করবে না?

ভালো লাগে না। তাই করব না।

সময় কাটবে কি করে?

যে ভাবে কাটছে সেই ভাবে কাটবে। আমাকে নিয়ে তোমার এত ভাবতে হবে না।

কেন ভাবতে হবে না?

জানি না। আমি এত সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।

এই বলেই শাহানা উঠে গিয়ে শব্দহীন টিভির সামনে বসেছে। বসার ভঙ্গি দেখে মন হয় পর্দার ছবিগুলির নড়াচড়া দেখে সে খুব মজা পাচ্ছে। জহির তার পেছনে এসে বসল তার পাশেই। শাহানা তা যেন লক্ষ্যই করল না। জহির বলল, সাউন্ড দাও। কিছু শব্দের ছবিতে কি আছে?

শাহানা ক্লান্ত গলায় বলল, আমার এইভাবেই দেখতে ভালো লাগে।

শব্দ তোমার ভালো লাগে না?

না।

আগে লাগত? যখন তুমি তোমাদের বাড়িতে থাকত?

জানি না। তোমাকে তো বলেছি আমি এত সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।

জহির চুপ করে গেল। সে বুঝতে পারছে তাদের দু'জনের ভেতর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে।

এটাকে আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়। কি ভাবে দূরত্ব কমানো যায় তাও তার জানা নেই।

একদিন সে বলল, গান শিখবে শাহানা? গানের মাষ্টার রেখে দেই? শাহানা হাঁ-না কিছুই বলল না। গানের মাষ্টার একজন এলেন। হারমোনিয়াম, তবলা, সেতার এলো। হুলস্থূল ব্যাপার। শাহানা দু'দিন মাষ্টারের কাছে বসে তৃতীয় দিনে বলল, উনার কাছে গান শিখব না।

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

উনি কথা বলার সময় মুখ থেকে থুথু বের হয়। আমার গায়ে থুথু লেগে যায়।

নতুন একজনকে রেখে দেব?

দাও।

তোমার উৎসাহ আছে তো নাকি আমাকে খুশি করবার জন্যে...

শাহানা উত্তর দিল না। দ্বিতীয় মাষ্টারও এক সপ্তাহের বেশি টিকলেন না। উনি খুব সিগারেট খান। সিগারেটের গন্ধে শাহানার মাথা ধরে যায়। তৃতীয় একজন এলেন। ইনি কি করছেন না করছেন জহির জানে না। গান শেখার সময়টাতে সে থাকে না। শাহানা রেযাজ করে কিনা তাও জহিরের জানা নেই। রেযাজ করতে তাকে সে কখনো শুনেনি। জহির গানটাকে দেখছে সময় কাটানোর একটা পথ হিসেবে। কিছু একটা নিয়ে শাহানা ব্যস্ত থাকুক। মনের অস্থিরতা কমুক। কিন্তু তা কি সত্যিই কমছে?

রফিকের অফিস শুরু হয়েছে গত মাসের গোড়ায়।

শুরুর পনেরো দিন কিছু করার ছিল না। রফিকের কাজ ছিল সকালে এসে অফিসে বসে থাকা। দুপুরবেলা ঘণ্টা খানিকের জন্যে ছুটি। হোটেল থেকে খেয়ে এসে আবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একনাগাড়ে বসে থাকা। কথা বলার দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই কারণ সাদেক আলি নানান জায়গায় ছুটাছুটি করছে। টাইপিস্ট হিসেবে একটি মেয়েকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। সেও আসছে না। সাদেক আলিকে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতেই বিচিত্র একটা ভঙ্গি করে বলেছে-সময় হলেই সে আসবে। কাজ নেই কোনো এসে করবেটা কি? রফিক বিস্মিত হয়ে বলছে, কাজ না থাকলে অফিসে আসবে না?

আসবে স্যার আসবে। ওর কাজ তো স্যার অফিসে না। কাজ অন্য জায়গায়।

তার মানে?

এইসব স্যার এখন আপনার জানার দরকার নেই। তাহলে খারাপ লাগবে।

রফিক আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছেও হয়নি। দু'দিন মেয়েটির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তার কাছে মনে হয়েছে বেশ ভালো মেয়ে। চেহারা ভালো। শার্ট। কথায় কথায় হাসে। এবং বেশ রসিক। রফিকের দু'একটা রসিকতাকে সে বেশ শব্দ করে হাসল। একটু গায়ে পড়া ধরনের স্বভাব আছে। এই স্বভাব রফিকের কাছ খুব খারাপ লাগে নি। প্রথম দিনেই সে রফিককে বলেছে-আমার ডাকনাম হলো কুসুম। আপনি স্যার আমাকে কুসুম ডাকবেন। আমার ভালো নাম নিজের কাছেই সহ্য হয় না। অবশি কুসুমও খুব বাজে নাম।

আপনি টাইপ কেমন জানেন?

কাজ চালাবার মতো জানি। এইসব অফিসে স্যার মিনিটে পঞ্চাশ ওয়ার্ড টাইপ করার দরকার নেই। সমস্ত দিনে হয়তো তিন থেকে চারটা চিঠি টাইপ করা হয়।

তাই নাকি?

জি স্যার। কাজকর্ম হয় টেলিফোনে এবং টেলিগ্রে। এই জাতীয় কাজের সঙ্গে অনেক দিন থেকেই আছি। সবই জানি।

অনেক দিন মানে কত দিন?

প্রায় ছ'বছর।

আগের চাকরিটা ছাড়লেন কেন?

খাটুনি বেশি ছিল সেই তুলনায় রোজগার ছিল না। নতুন ফার্মগুলিতে খাটুনি খার কম রোজগার হয়ে বেশি। স্যার আপনি কিন্তু আমাকে ভূমি করে বলবেন।

কেন?

ছোট ফার্ম, সবাই বলতে গেলে ফ্যামিলি মেম্বারের মতো। তাই নয় কি স্যার?

হ্যাঁ তা তো বটেই।

একা একা অফিসে বসে থাকার মতো যন্ত্রণা অন্য কিছুতেই নেই। টেলিফোন লাইনে এসেছে গত সপ্তাহে ইন্টারিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু সময় কাটছে। তবে ইন্টারিস ব্যস্ত মানুষ। বকবক করার সময় কোথায় তার? টেলিফোন করলেই দু'একটা কথা বলা পরই বলে-দোস্ত তাহলে রাখলাম। রফিক সহজে রাখতে দেয় না।

ইন্টারিস বসে থাকতে থাকতে তো শিকড় গজিয়ে গেল। কাজকর্ম কিছু নেই।

হবে দোস্ত হবে। ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর-বাঁধ বাঁধ বুক।

আর কত ধৈর্য ধরব।

এইসব অফিসের কর্তাদের হতে হয় মাকড়সার মতো। জাল ফেলে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়। জালে কিছু একটু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলতে হয়। একবার তো পড়েছিল, ভুই তো পেঁচাতে পারনি না, অন্য পার্টি নিয়ে নিল। চিন্তা করিস না, আমি সাদেক আলিকে একটা বড় টিপস দিয়েছি। হতে পারে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ হবার সম্ভাবনা আশি ভাগ তবে এইসব লাইনে কিছুই বলা যায় না, শেষ মুহূর্তে দেখবি ডাইস উল্টে গেল। রাখলাম দোস্ত।

ব্যাপারটা কি বলা? কাজটা কি?

কাজ শুনে ভুই করবিটা কি? বসে মাছি মারছিস মাছি মার। যা করবার সাদেক আলি করবে। ও টাকা-পয়সা যা চায় সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিবি। কি জন্যে চাচ্ছে জিজ্ঞেস করবি না।

রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে।

রহস্য কিছু না। দোস্ত রাখলাম।

ইন্টারিসের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে চারদিন আগে। এই চারদিনে কাজের অগ্রগতি কি হচ্ছে রফিক কিছুই জানে না। সাদেক আলিকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে তারও উপায় নেই। তার দেখাই পাওয়া যায় না।

আজ রফিক অফিস এসে বুঝে বিরক্তি বোধ করল। গানেশনিক ম্যাগাজিন জোগাড় করে রেখেছিল। অফিসে নিয়ে আসবে। পড়ে সময় কাটাবে। আসার সময় ভুলে ফেলে এসেছে। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। অফিসে কোনো লোকও নেই যাকে পাঠানো যাবে।

রফিকের ইচ্ছা ছিল একজন অফিস এ্যাসিস্টেন্ট রাখার। সাদেক আলি রাজী

এনি। দাঁত বের করে বলেছে, এখনো সময় হয়নি স্যার। সময় হলে সব হবে। অফিস
গ্যাসিস্টেন্ট হবে, পি.এ. হবে, ক্যাশিয়ার হবে, হেডক্লার্ক হবে, কয়টা দিন ধৈর্য ধরেন।

রফিক ধৈর্য ধরেই আছে। ধৈর্যেরও সীমা আছে। এখন একেবারে সীমা অতিক্রম
করার মতো অবস্থা। রফিক ইলেকট্রিক হিটার বসিয়ে দিল। আপাতত চমৎকার জাপানি
কাপে চা খাওয়া যাক। চা খেতে খেতে জীবন সম্পর্কে কিছু ফিলসফিক চিন্তাভাবনা করা
যেতে পারে। লেখার অভ্যাস থাকলে সময়টা কাজে লাগত। দারুণ রোমান্টিক একটা
গল্প ফাঁদা যেত। যেখানে তিনটি মেয়ে ভালোবাসে একটি ছেলেকে। ছেলেটি আবার
চতুর্থ একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু সেই মেয়ে বিবাহিত। স্বামী-স্তান নিয়ে সুখেই
আছে জটিল পঞ্চভুজ প্রেম। সবচে' ভালো হয় নিজেকে নিয়ে গল্প শুরু করলে। ধনী
বাবার কন্যা ভালোবাসত প্রবাসী এক ছেলেকে। হঠাৎ কি মতিভ্রম হলো বিয়ে করে বসল
চালচুলা নেই এক বেকার যুবককে। সেই বেকার যুবক হচ্ছে একজন আদর্শবান,
অনুভূতিশ্রবণ, কোমল হৃদয় পুরুষ।

রফিক বসে আছে চুপচাপ। গল্প তরতর করে এগুচ্ছে। মনে মনে গল্প লেখার
কাজটা এত সহজ তার ধারণা ছিল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে টেলিফোন ধরল।

হ্যালো।

স্যার আমি সাদেক।

কি খবর সাদেক সাহেব?

হাজার পাঁচেক টাকা দরকার স্যার। আধঘণ্টার মধ্যে।

কেন?

ব্যাপার আছে স্যার। একটা মেয়ে আসবে আপনার কাছে। তাকে টাকাটা দেবেন।
নাম হচ্ছে নমিতা। নমিতা নাম বললেই টাকাটা দিয়ে দেবেন। আমি আসতে পারছি না।
অন্য জোগাড়যন্ত্র করতে হচ্ছে।

ক্যাশ টাকা তো নেই।

ব্যাংক থেকে ভুলে নিয়ে আসেন স্যার। যাবেন আর আসবেন। মেয়েটা যেন আবার
চলে না যায়।

মেয়েটা কে?

তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। কাজ হওয়া দিয়ে কথা। বহু কষ্টে একে জোগাড়
করা হয়েছে।

ব্যাপারটা কি একটু বলুন।

একটা ঘরোয়া ধরনের পার্টির মতো হবে। ঐ সব পার্টির শোভা, দু'জন মেয়ে যাবে
শোভা হিসেবে। একজন হচ্ছে আমাদের কুসুম সরকার অন্যজন নমিতা। পার্টির মেয়ে
তো আর পাঠানো যায় না। সবটা নির্ভর করছে ওদের উপর। সমস্যা আমি টেলিফোন
রাখলাম আপনি টাকাটার জোগাড় দেবেন।

নমিতা কোনোরকম কথা ছাড়া টাকাটা তার ব্যাগে করল। কি মিষ্টি চেহারা
মেয়েটির। চোখ দুটি বিষণ্ণ। ছায়াময় চোখ বোধহয় একেই বলে। বড় বড় পল্লব ছায়া
ফেলেছে চোখে।

মেয়েটির গায়ে গাঢ় নীল রঙের একটা চাদর। এই নীল রঙের জন্যেই কি তাকে
এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে?

নমিতা বলল, আমি আপনার অফিসে খানিকক্ষণ বসব। সাদেক আলি সাহেব এনে আমাকে নিয়ে যাবেন।

বসুন।

উনি কি আমার ড্রেস সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

না কিছু বলেনি। যা পরে এসেছেন তাতেই আপনাকে খুব চমৎকার লাগছে।

মেয়েটি এক পলক তাকাল রফিকের দিকে।

বরফের মতো শীতল চোখ। কোনো রকম আবেগ-উত্তেজনা সেখানে নেই। রফিক বলল, আপনি কি চা খাবেন?

না।

আমি খাব। আমার সঙ্গে এক কাপ চা বান।

মেয়েটি হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। রফিক দু'কাপ চা বানাল। এক কাপ রাখল মেয়েটির সামনে। সে এই চা ছুঁয়েও দেখল না। ক্লান্ত গলায় বলল, দু'টা প্যারাসিটামল এনে দিতে পারেন?

এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। যাব আর আসব।

আপনি নিজেই খাবেন।

মেয়েটি হেসে ফেলল। কি সুন্দর হাসি। রফিকের ইচ্ছা হল বলে-আপনার কোথাও যেতে হবে না। আপনি বাড়ি যান। আমরা অধিকাংশ কথাই বলতে পারি না।

শারমিন ছাদে একা একা হাঁটছিল। এ বাড়ির ছাদে সে খুব কম আসে। কেন জানি ছাদটা তার ভালো লাগে না। ছাদে উঠলেই নিজেদের বাড়ির বিশাল ছাদের কথা মনে হয়। উঁচু রেলিং ঘেরা ছোটখাটো ফুটবল মাঠ। সেখানে যখন শারমিন গিয়ে দাঁড়াতে আশেপাশের কেউ তাকে দেখতে পেত না। কত সহজেই একা হওয়া যেত। এখানে সে সুযোগ নেই। চিলেকোঠার ঘরে থাকে আনিস। আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন ছেলেমেয়েও এখানে খেলতে আসে। চেষ্টা করে মাথা ধরিয়ে দেয়।

আজ অবশিষ্ট কেউ নেই। আনিসের ঘর তালাবদ্ধ। দরজার উপর একটা কাগজে বড় বড় করে লেখা—“আমি এক সপ্তাহের জন্যে বাইরে গেলাম।” সেই এক সপ্তাহ কবে শুরু হবে আবার কবেইবা শেষ হবে কে জানে। শারমিনের খুব ইচ্ছা করল ছোট ছোট করে লেখে-আপনার এই সপ্তাহ কবে থেকে শুরু?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। শারমিনের মন খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল সন্ধ্যা মিলানোর আগ পর্যন্ত ছাদে থাকবে। সূর্য ডোবা দেখবে। সেটা আর সম্ভব হলো না। পৃথিবীটা এমন, যারা একা থাকতে চায় তারা একা থাকতে পারে না। রাজ্যের মানুষ এসে তাদের চারপাশে ভিড় করে।

শারমিন।

আরে ভাবী তুমি!

নাও চা নাও।

বুঝলে কি করে আমি ছাদে?

নীলু হাসতে হাসতে বলল, আমি হচ্ছি মহিলা শার্লকহোমস। ছাদে কি করছ?

তেমন কিছু না। এবার শীত তেমন পড়ল না ভাবী?

হঁ। ফামুন চলে এসেছে নাকি?

কি জানি। আমি এখন আর দিন-তারিখের হিসাব রাখি না।

শারমিন রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নীল বলল, তোমার কি হয়েছে শারমিন
বলো ভো?

কই কিছু হয়নি তো।

কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছ। রফিকের সঙ্গে কি কোনো কিছু নিয়ে বাক্যালাপ
বন্ধ?

না।

ও কি সব অফিসটফিস খুলেছে, তুমি তো দেখতেও যাওনি।

যাব একদিন, দেখে আসব।

তুমি বাইরে চলে যাবে এরকম একটা কথা শুনতে পাচ্ছি। এটা কি গুজব না সত্যি?
সত্যি।

রফিক এক জায়গায় তুমি এক জায়গায়?

হ্যাঁ।

এটা কি ভালো হবে?

শারমিন অল্প হাসল। খুব সহজেই সেই হাসি ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বলল, কত
হেলেই তো বৌকে ফেলে পিএইচডি করতে যায়। আমি গেলে সেটা দোষের হবে কেন?

দোষের হবে না। এখন তোমাদের দু'জনেরই ভালোবাসাবাসির সময়। এ সময়
আলাদা হওয়াটা ঠিক হবে না। তুমি আরো ভালো করে ভেবে দেখো।

দিনরাতই ভাবছি।

বরং একটা কাজ করো, তুমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকো। একটা বৈচিত্র্য
আসুক। দিনের পর দিন এক জায়গায় থেকে তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ। কিছুদিন ওখানে
থাকলে তোমার ভালো লাগবে।

শারমিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিও তাই ভাবছি ভাবী।

এত ভাবাভাবির কিছু নেই। বেশ কিছুদিন থেকে আসো। এখানে দিন-রাত কেমন
গম্ভীর হয়ে থাকো আমার ভয় ভয় লাগে। রফিকের না জানি কি অবস্থা।

নীল তবল গলায় হেসে উঠল। শারমিন বলল, আমি আজ সন্ধ্যায় চলে গেলে কেমন
হয় ভাবী?

আজই যাবে?

বাড়িওয়ালায় বাসা থেকে টেলিফোন করলেই গাড়ি চলে আসবে। ভাবী যাব?

বেশ তো যাও। রফিককেও আমি পাঠিয়ে দেব।

নীল লক্ষ করল শারমিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দিনের শেষে আলো পড়েছে
শারমিনের চুলে। চুলগুলি কেমন লালচে দেখাচ্ছে। সুন্দর লাগছে শারমিনকে।

রফিক বাসায় ফিরল রাত নটায়। তাকে দেখেই টুনী বলল, ছোট চাচি চলে
গিয়েছে। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় গেছে?

উনার নিজের বাড়িতে। সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। মনে হয় আর আসবে না।

রফিক গম্ভীর হয়ে গেল। রাত এগারোটায় মফিজার সাদেক আলি এসে পাংগু মুখে
বলল, স্যার কাজটা হয়নি।

রফিক শান্ত স্বরে বলল, না হলে কি আর করা যাবে। আপনি আপনার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। বাড়ি যান বিশ্রাম করুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবেন।

সাদেক আলি মৃদুস্বরে বলল, ওরা স্যার আগেই অন্য পার্টির সঙ্গে সব ঠিকঠাক করে আমাদের বলেছে একটু আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করতে। বলেছে-আমাদের খুশি করে দিন তারপর দেখুন আপনাদের খুশি করতে পারি কি না।

ঠিক আছে বাদ দিন। যা হবার হয়েছে।

আমি বাদ দেব? বলেন কি স্যার? আমার নাম সাদেক আলি না? আমার সাথে মামদেবাজি করবে আমি চূপ করে থাকব?

কি করবেন আপনি?

আমি যে কি পরিমাণ শয়তান আপনি তা জানেন না স্যার।

সাদেক আলি সাহেব।

জি।

কাজটা না হওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি। সামান্য একটা কাজের জন্যে আমি মেয়ে মানুষ পাঠাব এটা তো হয় না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। আমার বাবা জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেননি। আমার এক মামা-কবির মামা, তিনি তাঁর নিজের জীবনটা দিয়ে দিয়েছিলেন অন্যের জন্যে। সাদেক আলি সাহেব আমার সারাটা দিন খুব মন খারাপ ছিল। কাজটা হয়নি শুনে মনটা ভালো হয়েছে।

আপনি তো স্যার ব্যবসা করতে পারবেন না।

বোধহয় পারব না। বসুন, এক কাপ চা খেয়ে তারপর যান।

সাদেক আলি বলল, আপনার মন ভালো হয়েছে খুব ভালো কথা। আমার মনটা এখনো খারাপ, ঐ শালাকে শিক্ষা দিতে না পারলে স্যার আমার মন ভালো হবে না। তা বাব না সাব। আমি যাই। শ্রামালিকুম।



নীলগঞ্জ থেকে বাবলুর একটা চিঠি এসেছে। চিঠি কার কাছে লেখা বোঝা যাচ্ছে না কারণ কোনো সম্বোধন নেই। চিঠির বক্তব্যও সার্বজনীন, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি বাবলু। চিঠি যেমনই হোক চিঠির সঙ্গে শিল্পকর্মটি অসাধারণ-একটি তিন মাথাওয়ালা গরু ঘাস খাচ্ছে। মনোয়ারা ছবি দেখে আঁকে উঠেছিলেন-তোমাকে কত বার বলেছি বোমা ছোঁড়াটার মাথা খারাপ। তুমি তো বিশ্বাস করো না। দেখো একটা গরু একেছে, মাথা তিনটা। নীলু হাসতে হাসতে বলল, ছেলমানুষ।

ছেলমানুষ হলোই তিন মাথার গরু আঁকতে হলে ছি ছি কি ঘেন্নার কথা

ছবি দেখে টুনি বেশ মন খারাপ করল। ব্যাপ্তি যে ছবি আঁকতে পারে তাই তার জানা ছিল না। তাও এমন সুন্দর ছবি যা সবাই কত আগ্রহ নিয়ে দেখছে। টুনি তার মাঝে ধরল-মা গরু আঁকা শিখিয়ে দাও। নীলু বিরক্ত হয়ে বলল,

গরু আঁকা আমি জানি না মা, তোমার দাদুর কাছে যাও।

না তুমি শিখিয়ে দাও।

দেখ না আমি একটা চিঠি পড়ছি। কেন বিরক্ত করছ টুনি?

না তুমি শিখিয়ে দিবে। তুমি...

নীলু মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। টুনি ইদানীং খুব বিরক্ত করছে। যা একবার বলবে তাই করতে হবে। গত রাতেও তাই করেছে। রাতে খাবার টেবিলে বলে এসল-পোলাও খাব মা। নীলু বলল, পোলাও তো রান্না হয়নি খাবে কি করে?

এখন রাঁধ।

কি বলছ টুনি। এখন পোলাও রাঁধব কি?

না রাঁধতে হবে। এখনই রাঁধ।

কাল পোলাও হবে। এখন খেয়ে নাও।

তাহলে আমি খাব না।

টুনি টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। কিছুতেই তাকে খেতে বসানো গেল না। সত্যি সত্যি রাত দশটায় রান্না চড়াতে হলো। মনোয়ারা গজগজ করতে লাগলেন কি আর করা যাবে। সবাই হয়েছে আধুনিক। একটা মাত্র বাচ্চা। ছেলে হলেও একটা কথা ছিল। মেয়ে পরের বাড়ি চলে যাবে।

কিছুদিন থেকেই মনোয়ারা এই লাইনে কথাবার্তা বলছেন। কথার সারমর্ম হচ্ছে আরো ছেলেপুলে দরকার। বংশ বন্ধার জন্যে হলেও ছেলে দরকার। তাছাড়া এক সন্তান সংসারে অলম্বী ডেকে আনে। এইসব কথাবার্তা হয় কাজের মেয়েটির সঙ্গে কিন্তু উদ্দেশ্য নীলু। সেদিন নীলু অফিসে যাবার সময় তখন মনোয়ারা কাজের মেয়েটিকে বলছেন-এক সন্তান সংসারে থাকলে কি হয় জানিস? একা একা থাকে জে কাজেই অলম্বীকে ডাকে। তখন অলম্বী এসে সংসারে ঢুকে পড়ে। আর অলম্বী একবার সংসারে ঢুকলে উপায় আছে? সব ছাড়খাড় হয়ে যায়।

নীলু তনেও না শোনার ভান করে। মাঝে মাঝে বড় বিরক্ত হয়। তার শাওড়ির মাথায় একবার কোনো জিনিস ঢুকে পড়লে খুব মুশকিল। তিনি সেটা নিয়ে দিনের পর দিন কথা বলবেন। অন্যো কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাবেন না। মানুষ এরকম একচোখা হয় কি ভাবে?

ভবে টুনি যে বেশ নিঃসঙ্গ তা নীলু বুঝতে পারে। নিঃসঙ্গ মানুষ খুব জেদী হয়। টুনি যেমন হয়েছে। একটু আগে সে চড় ঝেঁয়েছে। চোখে পানি আসেনি। মুখ শুক করে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু বলল, কি হলো এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমি গরু আঁকা পারি না। একবার তো বললাম।

তুমি পারো।

তুমি বললেই তো হবে না। আমাকে আঁকা জানতে হবে।

তুমি জানো।

নীলু দ্বিতীয় চড়টা বসাল। টুনি এতেও কান্দল না। কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। মনোয়ারা পুরো দশমিনিট দূর থেকে দেখছিলেন তিনি বললেন-বেশ করেছে, ভালো করেছে। শুধু যত্নগা করে।

নীলুর বেশ মন খারাপ হলো। তার শাওড়ি এ রকম কেন বলবেন? দাদু-নানুরা

সংসারে থাকেন কেন? নীলু নিজে যখন টুনীর মতো বয়েসি তখন তার দাদি থাকতেন তাদের সঙ্গে। চোখে ভাল দেখতেন না। হাঁটা চলাতেও কষ্ট হতো। অথচ কেউ গাণি নীলুকে কড়া কোনো কথা বলেছে উনি ছুটে এসে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে নীলুকে নিয়ে গেছেন। আর কি রাগ। একবার নীলু একটা কানের দুল হারিয়ে ফেলেছে। নীলুর মা তাকে খুব মার দিলেন। নীলুর দাদি এসে বললেন-বৌমা তোমার এত সাহস! তুমি আমার সামনে মেয়েটাকে মারলে? কানের দুল হারিয়েছে তো কি হয়েছে? জিনিস হারা না? তুমি বৃথি সারাজীবনে কিছু হারাওনি?

নীলুর মা বললেন,

আমার ডুল হয়ে গেছে মা। এ রকম আর হবে না।

নীলুর দাদি সেদিন ভাত খেলেন না। সবার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে নিলেন। নীলুর মা অনেক কান্নাকাটি করে হাত-পা ধরে তাঁর রাগ ডাঙলেন।

সংসারে দাদি-নানিরা এবকম হবেন। টুনীর দাদির মতো মুখ কুঁচকে বলবেন না মেয়েছ বেশ করেছ। ভালো করেছ। শুধু যত্নগা করে।

নীলুর মনে হলো চাকরি করতে গিয়ে সে অফিসের সঙ্গে বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছে। অবহেলা করছে তার মেয়েকে। মা'রা বাচ্চাদের হাত ধরে ধরে কুলে নিয়ে যান ফিরিয়ে আনেন। সারা পথে বাচ্চারা মনের আনন্দে কত গল্প করে মা'র সঙ্গে। কুলের গল্প, বন্ধুবান্ধবদের গল্প। টুনীর সে সুযোগ নেই।

নীলু ঠিক করল আজ অফিসে দেরি করে যাবে। টুনীকে নিজেই কুলে পৌছে দেবে। বিকেলে তাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে যাবে। কয়েকটা গল্পের বই, একটা কুল ব্যাগ এক বাস্র ভালো চকলেট। বাবলু না থাকায় মেয়েটা খুব একা হয়ে গেছে। মামার কুলখানি তো কবেই হয়েছে, এখনো তারা আসছে না কেন কে জানে। দুলাভাই মানুষটা কাওজানহীন, কে জানে হয়তো নীলগঞ্জের খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। ছেলের কুলের কি হবে কিছুই ভাবছে না।

টুনী তার মা'র সঙ্গে কুলে যাবার কোনো আগ্রহ দেখাল না। কঠিন মুখে বলল-আমি তোমার সঙ্গে কুলে যাব না।

কেন আমি কি দোষ করেছি?

আমি যাব না।

দু'জনে গল্প করতে করতে যাব।

বললাম তো যাব না।

বিকলে তোমাকে নতুন কুল ব্যাগ কিনে দেব।

না না না।

তুমি খুব অবাধ্য হয়েছে টুনী।

হয়েছি ভালো করেছি।

মনোয়ারা ভেতর থেকে বললেন-বৌমা একটা ছুটি দাও। তেজ বেশি হয়ে গেছে। তেজ কমুক।

নীলু অফিসে চলে গেল। তার মন বিষণ্ণ। মেয়েটা অনেকটা দূরে সরে গেছে। সে বুঝতে পারেনি। আজ মেয়েটাকে নিয়ে বেরুতে হবে। সারা সন্ধ্যা ঘুরবে।

অফিসে পৌছতেই শরিফ সাহেব বললেন-আপা আপনাকে বড় সাহেব আর্জেন্ট মনেজ দিয়ে রেখেছেন। আপনি যেন আসামাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, খুব জরুরি।

ব্যাপার কি?

আপনাকে চিটাগাং যেতে হবে।

কেন?

আছে অনেক ব্যাপার।

কবে যেতে হবে?

আজই। আজ দুপুরের মধ্যেই বওনা হতে হবে।

সে কি?

বড় সাহেব নিজেও যাবেন, আমিও যাবছি। দু'দিনের মামলা। কোম্পানির মাইক্রোস বাবে।

নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। দুপুরে রওনা হতে হলে হাতে একেবারেই সময় নেই। বাসায় যেতে হবে। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হবে। সফিককে খবর দিতে হবে। আচ্ছা টুনীকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না? না তা কি আর হয়। সে থাকবে অফিসের কাজে ব্যস্ত, টুনী গিয়ে কি করবে? কি বিশ্রী ঝামেলা।

নীলু রওনা হলো একটার সময়। সে সফিকের সঙ্গে দেখা করে গেল। কিন্তু টুনীর সঙ্গে দেখা হলো না, টুনীর পড়ার টেবিলে একটা চিঠি লিখে গেল-

"মাগো, আমার দশটা নয় পাঁচটা নয় একটা মাত্র মেয়ে। সেই মেয়ে যদি আমার উপর রাগ করে তাহলে আমার খুব কষ্ট হয়।"



আনিস গিয়েছিল দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে। সেখানে হাত সাফাইয়ের একজন বড় ওস্তাদ থাকেন। ঠিকানা জানা ছিল না। স্টার ফার্মেসির উল্টো দিকে তার বাসা। নাম-ইনাম শেখ।

স্টার ফার্মেসি নামে কোনো ফার্মেসির সন্ধান পাওয়া গেল না। ইনাম শেখের নামও কেউ শুনেনি। এতগুলি টাকা খরচ করে আসা। আনিসের ইচ্ছা করছে ডাক ছেড়ে কাঁদে। যাদের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে তারা ভুল খবর দেবে এটা বিশ্বাস্য নয়। ইনাম শেখ আছে নিশ্চয়ই-কেউ খোঁজ জানে না। ম্যাজিশিয়ানদের খোঁজখবর কে আর রাখবে? এককালে মুগ্ধ ও বিস্মিত হবার জন্যে মানুষ ম্যাজিক দেখতে, আজকাল মানুষকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার আয়োজনের কোনো অভাব নেই।

আনিস হাল ছাড়ল না। রিকশাওয়ালা, টেলিফোনওয়ালা, চায়ের দোকানের মালিক, সিনেমা হলের গেট কিপার সবাইকে জিজ্ঞেস করে-ভাই আপনারা একটা খোঁজ দিতে পারেন? ইনাম শেখ। ম্যাজিক দেখায়। হাত সাফাইয়ের খেলা জানে।

উত্তরে সবাই বলে-উনার বাসা কোথায়? মানুষের নির্বুদ্ধিতায় তার গা জ্বালা করে বাসা কোথায় জানা থাকলে সে জনে জনে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে কেন? নিজেই উপস্থিত হতো সেখানে।

আনিস ঠিক করল সে সব মিলিয়ে একশ' জনকে জিজ্ঞেস করবে। তারপর ঘাবড়া করে হারানো বিজ্ঞপ্তি দেবে-ভাইসব। ইনাম শেখ নামে একজন ম্যাজিসিয়ান সন্ধান-প্রার্থী। বয়স পঞ্চাশ। মুখে দাড়ি আছে- বোগা, লম্বা। পরনে নীল বৃষি।

আনিস অবশ্যি জানে না ইনাম শেখের বয়স পঞ্চাশ কি না। মুখে দাড়ি, বোগা, এসব তার কল্পনা। দরিদ্র মানুষ এরকমই হয়।

শেষ পর্যন্ত মাইকে বিজ্ঞপ্তি দেয়ার দরকার হলো না। ইনাম শেখকে পাওয়া গেল। বয়স ষাটের উপরে। দু'টি চোখেই ছানি পড়েছে। চলাফেরার সামর্থ্য নেই। হেঁসে বাড়িতে থাকে। ছেলে মটর মেকানিক। বাসা মেয়েদের হাই স্কুলের পেছনে। দু'কামরার একটা টিনের ঘর। চট দিয়ে ঘেরা বারান্দায় ইনাম শেখের জন্যে খাটিয়া পাতা। বিকল দুর্গন্ধ আসছে লোকটির গা থেকে। কিছুক্ষণ পরপরই সে প্রবল বেগে মাথা চুলকাতে এবং বিড়বিড় করে বলছে-শালায় উকুন।

ঢাকা থেকে একজন লোক তার কাছে হাত সাফাইয়ের কাজ শিখতে এসেছে বলে সে বলল-“যা শালা ভাগ।”

বাড়ির ভেতর থেকে দশ-এগারো বছরের একটি বালিকা বের হয়ে বলল, দাদা মাথা খারাপ। আপনে যান গিয়া। আপনেরে মারব। আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, সবাইকে মারে নাকি?

হ মারে। থুক দেয়। খুব বজ্জাত।

বুড়ো ছানি পড়া চোখে তাকিয়ে আছে। যেভাবে তাকিয়ে আছে তাতে মনে হচ্ছে কিছু একটা করে বসতে পারে।

তোমার দাদা ম্যাজিক জানে?

না। খালি মানুষের শইলে থুক দেয়। খুব বজ্জাত। আফনে যান গিয়া। আপনেকে থুক দিব।

আনিস একটু সরে দাঁড়াল। এ বুড়োর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। এত দূর এসে চলে যেতেও মন সরছে না। আনিস অনুনয়ের স্বরে বলল, চাচা মিয়া হাতের কাজ কিছু জানেন?

বুড়ো কুণ্ঠসিত একটা গাল দিয়ে আনিসের দিকে সত্যি থুথু ফেলল। অদ্ভুত নিশানা। সেই থুথু এসে পড়ল আনিসের প্যান্টে। ছোট মেয়েটা মজা পেয়েছে বলে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। হাসি ঝামিয়ে বলল, আপনেরে কইলাম না বুড়ো খুব বজ্জাত। বিশ্বাস হইল?

তোমার নাম কি খুকি?

ময়না।

স্কুলে পড়ো?

না।

বুড়া আবার থুথু দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। আনিস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে এলো। ওধু ওধু এতগুলি টাকা নষ্ট হল। ঢাকায় ফিরে গেলেও সমস্যা হবে। যে দু'টি ব্যাকাকে

এ প্রাইভেট পড়ায় তাদের মা কাঁটা কাঁটা স্বরে কথা শুনাবেন-কোথায় ছিলেন এই দিন?

বাক্যদের পরীক্ষার সময় আপনি যদি এ রকম ডুব মারেন তাহলে কি ভাবে হবে।
একটা কাজ করছেন দায়িত্ব নিয়ে করবেন না? আপনাকে তো রেগুলার বেতন দিচ্ছি।
দিচ্ছি না?

এইসব কথা অবশিষ্ট সে গায়ে মাখে না। কোনো কথাই আজকাল সে গায়ে মাখে
না। কেউ যদি গায়ে থুথু ফেলে ভাও সে অগ্রাহ্য করতে পারে। এসব সহ্য হয়ে গেছে।
এর টিউশনী দু'টি চলে গেলে তার কষ্ট হবে। রাস্তায় রাস্তায় ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতে
হবে।

ঢাকায় ফিরবার পথে জাপানি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হলো।
ভদ্রলোকের নাম 'কাওয়ানা'। বাসে তিনি বসেছেন আনিসের পাশে। টেকনিক্যাল টিমের
সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিন বছর কাটিয়ে দেশে ফিরবেন। দেশে যাবার আগে
বাংলাদেশ ঘুরতে বের হয়েছেন। হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ কিন্তু দেখায়
ত্রিশের মতো। ভালো বাংলা বলতে পারেন। শুধু ক্রিয়াপদগুলি একটু উনটপালট হয়ে
যায়। আনিস একজন ম্যাজিশিয়ান শুনে তিনি খুবই অবাক হলেন।

আপনি কি একজন পেশাদার ম্যাজিশিয়ান?

শব্দের ম্যাজিশিয়ান। পেশাদার ম্যাজিশিয়ান হবার মতো সুযোগ নেই।

সুযোগ থাকলে হতেন?

হ্যাঁ হতাম।

ম্যাজিকের ব্যাপারে আমার নিজেস্ব অগ্রহ। আমি দেশের একটা ম্যাজিক ক্লাবের
সদস্য।

আপনি নিজে ম্যাজিক জানেন?

না আমি জানি না, আমার দেখতে ভালো লাগে। আপনি কি ধরনের ম্যাজিক
দেখান? যন্ত্রনির্ভর?

জি না। যন্ত্রপাতি কোথায় পাব? বেশিরভাগই পামিংয়ের কৌশল।

পামিং কেমন জানেন?

ভালোই জানি। এই সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে লুকাতে পারবেন?

হ্যাঁ পারব।

আনিস মুহূর্তের মধ্যেই সিগারেটের প্যাকেট নুকিয়ে ফেলল। প্রথম ডান হাতে
সেখান থেকে অতি দ্রুত বাঁ হাতে। বাঁ হাত থেকে আবার ডান হাতে। জাপানি ভদ্রলোক
মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। এতটা তিনি আশা করেননি।

দয়া করে আরেকবার করুন।

আনিস দ্বিতীয় বার করল। বাসের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে দেখছে। দু'টি ছোট
বাক্সা উঠে এসেছে আনিসের কাছে। জাপানি ভদ্রলোক ঝললেন-অপূর্ব। আমি এত
চমৎকার পামিং এর আগে দেখিনি। পামিংয়ের কৌশলটি 'সবচে' ভালো খেলা আপনার
কোনটি?

গোলাপ ফুলের একটি খেলা আমি দেখাই। শূন্য থেকে গোলাপ তৈরি করি। ঐটি
চমৎকার খেলা।

ক'টি গোলাপ বের করতে পারেন?

গোটা দশেক পাড়ি।

ভদ্রলোক আনিসের ঠিকানা রাখলেন। বললেন, আমি দেশে যাবার আগে আপনার খেলা দেখে যাব।

ভদ্রলোক তাঁর কথা রাখলেন না তবে কিছুদিন পর আনিস 'জাপান ম্যাজিশিয়ান সোসাইটি'র সম্পাদকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। যার হচ্ছে-তারা তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আনিসকে নিমন্ত্রণ করছে তার গোলাপের দেখানোর জন্যে। আনিসের যাওয়া-আসার খরচ এবং এক সপ্তাহ জাপানে থাকা সোসাইটি বহন করবে। আনিসের সম্মতি পেলেই তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আনিস দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল। কত আনন্দের খবর। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে কেন? সত্যি সত্যি তার চোখে পানি এসে গেছে।

পৃথিবী বড়ই রহস্যময়। সে যদি ইনাম শেখ বলে এক বুড়োর খোঁজে না তাহলে হৃদয়বান ঐ জাপানি ভদ্রলোকের সাথে তার দেখা হতো না। এই যোগাযোগে পেছনে কারো অদৃশ্য হাত সত্যি কি আছে? কেউ কি আড়ালে বসে লক্ষ্য আমাদের? অসীম করুণাময় কেউ?

টুকটুক করে দরজায় টোকা পড়ছে। শাহানা যেমন করে টোকা দিত। আনিস বলল, কে? বীণা বলল, আমি।

আনিস দরজা খুলল। বীণার মুখ গম্ভীর। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই সে কোঁচের চোখ ফোলা ফোলা।

কি খবর বীণা?

দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে আসতে দিন। আনিস সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল। ক্রান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল। আনিস বলল, কি হয়েছে বলো তো?

আপনাকে কি মা কিছু বলেছেন?

না কিছু বলেননি।

সত্যি করে বলুন।

সত্যি বলছি।

মা কিছুই বলেননি?

না।

আনিস ডাই আপনি এই বাসা ছেড়ে চলে যান।

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাব?

জানি না কোথায় যাবেন। মোটকথা আপনি এখানে থাকবেন না। আপনাকে আর না দেখি।

কি হয়েছে বলো তো বীণা।

কিছু হয়নি। কাল ভোরে চলে যাবেন।

আমার যাবার তো কোনো জায়গা নেই।

জায়গা না থাকলে রাস্তায় থাকবেন। ফুটপাথে ঘুমুবেন। এই শহরে হাজার হাজার লোক ফুটপাথে ঘুমায়। আপনিও ঘুমুবেন। যখন খাওয়া জুটবে না ডিনা করবেন।

বীণা উঠে দাঁড়াল। আনিসকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটে বেরিয়ে

গেল। অনিস বীণার অদ্ভুত কথাবার্তার কিছুই বুঝল না। বোঝার কথাও নয়। বীণা কখনো পরিষ্কার করে কিছু বলে না; অর্ধেক কথা বলে অর্ধেক নিজের মধ্যে রেখে দেয়।

গত রাতে মার সঙ্গে তার বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়ার শুরুটা এ রকম, রাতে ঘুমুতে যাবার আগে লতিফা একটা ছবি আঁচলে লুকিয়ে বীণার ঘরে ঢুকে নানান কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বীণা বলল, কি বলতে এসেছ বলে ফেলো, আমি ঘুমুব। আঁচলে ওটা কি? তার ছবি?

লতিফা বললেন, ছেলেটার নাম ইমতিয়াজ। ইন্টার্নি ডাক্তার।

ইন্টার্নি ডাক্তারের ছবি আঁচলে নিয়ে ঘুরছ কেন?

কি জন্যে ঘুরছি তুই ভালোই জানিস। এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন? আমি তোরা মা না?

মা, তুমি ছবি নিয়ে বিদেয় হও, এই ঘোড়ামুণী ছেলে আমার পছন্দ না। ছবি দেখলেই ইচ্ছা করে ব্যাটার গালে একটা খামচি দেই।

লতিফা স্তম্ভিত। কি ধরনের কথাবার্তা বলছে মেয়ে? সামান্য ভ্রূত্যা, আদব-কায়নাও কি সে জানে না? অশিক্ষিত মূর্খ মেয়েও তো নয়। লতিফা হিসহিস করে বললেন, তোরা সমস্যাটা কি আমি জানি।

জানলে বলো?

তোরা গলার দড়ি বাঁধা আছে দু'তলার ছাদে। ঐ দড়ি না কাটলে তোরা মুক্তি হবে না।

দড়ি কেটে মুক্তি দিয়ে দাও। দেবি করছ কেন?

তাই করব। হারামজাদাকে লাথি দিয়ে বের করব।

গালাগালি করছ কেন?

গালাগালি করব না তো কি করব? কোলে নিয়ে বসে থাকব? হারামজাদা ছোটলোক। সকাল হোক কানে ধরে বের করে দেব। ফুটপাথের ছোকরা ফুটপাথে থাকবে। ভিক্ষা করবে।

সকাল হলে বের করে দেবে?

হ্যাঁ দেবই তো।

বেশ দাও।

বীণা হাই তুলল। মশারি ফেলতে ফেলতে বলল, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কি? এখন বিদেয় করে দাও। অপ্রিয় কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। তুমি মা দয়া করে এখন উঠো। আমি এখন ঘুমুব।

লতিফা উঠলেন। সেই রাতে তার ঘুম হলো না। অজানা আশংকায় বুক কাঁপতে লাগল। অনিস ছেলেটি শনিগ্রহের মতো এ বাড়িতে ঢুকেছে। বড় কোনো সর্বনাশ সে করবে এটা তিনি অনুভব করছেন। যে করেই হোক একে বিদেয় করতে হবে। হাতে শ' পাঁচেক টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলা যায়—এখানে আমার কিছু অসুবিধা আছে—তুমি অন্য কোথাও যাও।

না এরকম বলা ঠিক হবে না। 'অসুবিধা আছে' বলার দরকার কি? কোনোই অসুবিধা নেই। বলতে হবে ছাদের ঘরটা আমাদের দরকার, কাজেই তুমি কোনো মেসেটেসে গিয়ে উঠো।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গলায় বলতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে এবার তাকে আসর ভেঙে উঠতে হবে।

লতিফা গভীর রাতে বাথরুমে গিয়ে মাথায় পানি ঢাললেন। কপালের দু'পাশে শিরা দপদপ করছে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠাণ্ডা পানি ঢেলেও সে যন্ত্রণার আরাম হলো না। বসার ঘরে একা জেগে বসে রইলেন। আনিসকে কি করে অতি ভদ্রভাবে অথচ শক্ত ভাষায় বাড়ি ছাড়ার কথা বলা যায় তাই ভাবতে লাগলেন।

তাকে কিছু বলতে হলো না। বীণার কথাতেই কাজ হলো। পরদিন সন্ধ্যাবেলা আনিস তার বিছানা ও স্টুকেস গুছিয়ে বিদায় নিতে এলো।

লতিফাকে বলল-বীণা কোথায় মামি?

পড়ছে।

ওকে একটু ডেকে দিন না।

পড়াশোনার মধ্যে ডাকাডাকি করলে ও খুব বিরক্ত হয়। যা বলবার অমাকে বলো ওকে আমি বলে দেব।

আমি চলে যাচ্ছি মামি। অনেক দিন আপনাদের বিরক্ত করলাম। লতিফা বিব্রত স্বরে বলল, না না বিরক্ত কিসের? নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছ খুব ভালো কথা।

যদি অজান্তে কোনো অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন। কিছু মনে রাখবেন না।

লতিফা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। অতিদ্রুত চিন্তা করেও এই ছেলেটির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাঁড়া করতে পারলেন না।

মামি আপনি কি কোনো কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট?

না না অসন্তুষ্ট হব কেন?

তাহলে যাই মামি। শ্রামালিকুম।

লতিফা প্রায় জিন্বেস করে ফেলছিলেন-কোথায় যাচ্ছ? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালেন। বাড়তি খাতির দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। যাক যেখানে ইচ্ছা। আবার উদয় না হলেই হলো।

আনিস চলে গিয়েছে এই স্ববর বীণা সহজভাবেই গ্রহণ করল। কখন গিয়েছে, যাবার সময় কি বলেছে এইসব নিয়ে কোন আগ্রহ দেখাল না। অবহেলার ভঙ্গি করে বলল- গিয়েছে ভালো হয়েছে। আপদ বিদেয় হয়েছে। তুমি এখন এক কাজ করো তো মা, চিলেকোঠার ঘরটা আমাকে পরিষ্কার করে দাও।

লতিফা বিস্মিত হয়ে বললেন ঐ ঘর দিয়ে তুই কি করবি?

ওখানে পড়াশোনা করব। ওটা হবে আমার রিডিংরুম, বেশ নিরিবিলি।

লতিফা আর কথা বাড়ালেন না। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো দরকার নেই। চাপা পড়ে থাকুক। চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল।

নীলু চিটাগাং গিয়েছিল দু'দিনের জন্যে। তাকে থাকতে হলো ছ'দিন। অফিসের কাজকর্মে এমন এক জট তারার পাকিয়ে রেখেছে যা খেলার কোনো রকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ছত্রিশ লক্ষ টাকার হিসেবের গরমিল। একবার অডিট হওয়ার পর দ্বিতীয়বার অন্য একটি কোম্পানিকে দিয়ে অডিট করানো হলো। তারা আবার সব ঠিকঠাক পেল। কোম্পানির আরেকটি মাইক্রোবাস হরতালের দিন পুড়ে গেছে এমন রিপোর্ট আছে।

এবার গোপন চিঠিও আছে যে বাসটি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। রং বদলে সেটা এখন চিটাগাং-নাকিরহাট লাইনে ট্রিপ দেয়। চিঠিতে চেসিস-এর নম্বর পর্যন্ত দেয়া।

অফিসে বিভিন্ন লোকদের ইন্টারভিউ নেয়ার সময় মনে হয় কেউ সত্যি কথা বলছে না। এটাও বিশ্বাস্য নয়, এতগুলি লোকের সবাই মিথ্যা কথা বলবে কেন?

নীলু অস্থির হয়ে পড়ল। অফিসের এই ঝামেলা তার সহ্য হচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলা গ্রাকবাংলায় ফিরে তার কান্ডাতে ইস্তে করে। চলে যাবে-সে উপায়ও নেই। তদন্তের দায়িত্ব অস্বীকার করার সাহস তার নেই।

রাতে তার ভালো ঘুম হয় না, এক রাতে ভয়াবহ একটা স্বপ্ন দেখল, উলের কাঁটা নিয়ে টুনী খেলছে হঠাৎ খোঁচা লাগল চোখে। রক্তারক্তি কাণ্ড। ডাক্তার এলো এবং গঞ্জির মুখে বলল- একটা চোখে খোঁচা লাগলেও দুটি চোখই নষ্ট। তবে চিন্তার কিছু নেই, পাথরের চোখ লাগিয়ে দেব। আসল-নকল কেউ বুঝতে পারবে না। নীলু স্বপ্নের মধ্যেই চোঁচিয়ে বলল, এসব আপনি কি বলছেন?

ডাক্তার তার দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, পাথরের চোখ আপনার পছন্দ না হলে দুটি মার্বেল বসিয়ে দিতে পারি। মার্বেলেও খারাপ হবে না। অনেক রকমের রঙ আছে, আপনি নিজে পছন্দ করে নিতে পারেন।

ঘুম ভেঙে গেল। নীলুর গা দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে, এ রকম কুৎসিত স্বপ্ন মানুষ দেখে? এরকম স্বপ্ন দেখার পরও কি কেউ বাসায় ফিরে না গিয়ে থাকতে পারে? নীলুকে থাকতে হলো।

ঢাকায় যেদিন রওনা হলো সেদিন তার মনে হলো যেন কত দীর্ঘকাল বাইরে কাটিয়ে ফিরছে। ঢাকা পৌঁছেই দেখবে সব বদলে গেছে। সবাইকে অচেনা লাগবে। টুনী সম্ভবতঃ লজ্জা লজ্জা মুখে পর্দার আড়ালে থাকবে। লজ্জা ভাঙতে সময় লাগবে। ইস কতদিন যে সে মেয়েটাকে দেখে না।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তব বোধ হয় কখনোই মিলে না। নীলু ঢাকায় পৌঁছল বিকেলে। কিছুই বদলায়নি। সব আগের মতো আছে। টুনীর হাতে একটা চকবার আইসক্রিম। আইসক্রিমে তার জামা মাখামাখি হয়ে আছে। নীলু ভেবেছিল তাকে দেখেই টুনী ছুটে আসবে তা হলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে টুনীর আইসক্রিমের একটা বড় অংশ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। সে তার ভাঙা টুকরো সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কেমন আছ মা?

ভালো। তুমি আজ আসবে আমরা জানতাম।

কিভাবে জানতে?

আবু টেলিফোন করেছিল।

তোমাদের আর সব খবর কি?

দাদির একটা দাঁত পড়ে গেছে।

তাই নাকি?

হঁ দাদিকে পেত্নীর মতো লাগছে।

হিঃ এসব বলতে নেই।

বললে কি হয়?

আল্লাহ পাপ দেন। কাছে আনো মা, আমাকে একটু আদর দাও।

উঁহ তোমার গায়ে আইসক্রিমের রস লেগে যাবে।

লাগুক। এসো আমাকে একটু চুমু দাও।

টুনী লজ্জিত মুখে মাকে চুমু খেয়ে ফিসফিস করে বলল-জানো মা বাবলু একজন আসেনি।

সে কি? কেন?

কি জানি!

বাসার আর সব লোকজন কোথায়? মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া কেউ নেই।

বুয়া আছে। দাদা-দাদিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে। আবু অফিসে। চাচাও অফিসে।

তোমাকে একা ফেলে গেছে?

একা কোথায় বুয়া তো আছে।

নীলু গোসল করতে ঢুকল। টুনীকে বলল- দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে। টুনী বলল- কেন মা? নীলু হেসে বলল, অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা তো তাই। তোমার কথা শুনতে ভালো লাগছে।

আমি খুব সুন্দর করে কথা বলা শিখেছি তাই না মা?

হ্যাঁ।

বাবলু কি আমার মতো সুন্দর করে কথা বলতে পারে?

না। সে তো কথাই বলে না।

ছেট চাচি কি আর আসবে না মা?

নিশ্চয় আসবে।

বীণা খালার মা বলেছে আর আসবে না।

তাই বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ।

গোসলের পানি কনকনে ঠাণ্ডা। শুভু নীলু মাথায় মগের পর মগ ঠাণ্ডা পানি ঢালছে। বন্ধ দরজার ওপাশে টুনী দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষি সব কথা বলছে। বড় ভালো লাগছে শুনতে।

তুমি আমার কথা ভেবেছিলে টুনী?

হ্যাঁ ভেবেছি।

কেন্দেছিলে আমার জন্যে?

না।

কান্দনি কেন?

আমি বড় হয়েছি যে তাই।

বড়রা বুঝি কান্দে না?

না।

বড় বড় মেয়েরা যখন বিয়ে করে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন তো কান্দে। কান্দে না?

হ্যাঁ কান্দে।

তুমি কানবে না?

হ্যাঁ কানব।

মনোয়ারা ফিরলেন সন্ধ্যা মিলাবার পর। নীলুকে দেখেও কিছু বললেন না। তাঁর মুখ গঞ্জীর। রাগী রাগী চোখ। হোসেন সাহেবও কেমন যেমন বিপর্যস্ত। নীলু বলল, কামেলায় এত দেরি হলো মা। আপনারা ভালো ছিলেন তো?

তিনি জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। হোসেন সাহেব বললেন, আজ আর তোমার শাওড়িকে কিছু জিজ্ঞেস করো না মা। জবাব পাবে না।

নীলু বিস্মিত হয়ে তাকাল। হোসেন সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার শাওড়ির সামনের দুটা দাঁত ডাক্তার ফেলে দিয়েছেন। আগে পড়েছে একটা। বিশ্রী দেখাচ্ছে। তাকানো যাচ্ছে না।

হোসেন সাহেবের মুখ করুণ হয়ে গেল। যেন তাঁর নিজেরই সামনের দুটি দাঁত নেই।

মেয়েদের সৌন্দর্যই হচ্ছে দাঁত বুঝলে মা।

বাঁধিয়ে নিলেই হবে বাবা।

বাঁধানো দাঁত কি আগের মতো হয়। তুমি ভালো ছিলে তো মা?

জ্বি ভালোই ছিলাম।

তুমি দূরে থেকে বেঁচে গেছ, তোমার শাওড়ি দাঁতের স্বত্বপায় চিৎকার-চোঁচামেচি করে সবার মাথা খারাপ করিয়ে দিয়েছে।

সফিক এবং রফিক দু'জন একই সঙ্গে এলো। রাত এগারোটায়। নীলুর চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে। তবু সে জেগে আছে। মনোয়ারাও জেগে। ডেনটিস্ট যে তাঁকে কি পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে এটা তিনি চতুর্থবারের মতো বলছেন।

ব্যাটা গর্দভ কিছুই জানে না। আমার মনে হয় নকল করে পাস করেছে। অবশ্য না করেই দাঁত তুলে ফেলেছে।

বলেন কি মা!

মহাহারামজাদা। উল্টা আমাকে ধমক দেয়।

সে কি!

হ্যাঁ, বলে কি-আপনি শুধু শুধু এত হৈচৈ করছেন কেন?

খুব অন্যায়।

ইচ্ছা করছিল ছোকরার কানটা টেনে ছিড়ে দেই।

আপনি শুয়ে পড়ুন মা। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।

মনোয়ারা ঘুমতে যেতে রাজি নন। তিনি আজকের ভরাবই সন্ধ্যার কথা তাঁর দুই ছেলেকে না শুনিয়ে ঘুমতে যেতে রাজি নন। সেই সুযোগ তাঁর হলো না। রফিক ঘরে ঢুকেই বলল, বাহ মা তোমাকে তো সুন্দর লাগছে। কেমন যেন ড্রাকুলার মতো দেখাচ্ছে।

মনোয়ারা কিছুক্ষণ অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রফিক বলল, ভাবী ভাড়াভাড়ি ভাত দাঁত দেখে লেগেছে।

এত দিন পর এলাম প্রথম কথাটাই এই? কেমন ছিলাম কি জিজ্ঞেস করো। সাধারণ ভদ্রতাটা দেখাও।

কেমন ছিলে ভাবী?

প্রশ্ন করে রফিক উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। বাথরুমে ঢুকে গেল।

রাতে ঘুমুতে যাবার আগে সফিক তার অভ্যাসমত এক কাপ চা খেতে চাইল।
বলল- তোমার যাবার দরকার নেই। কাজের মেয়েটাকে বলো ও দেবে।

আমিই বানিয়ে আনি।

নীলু রাতে শোবার আগে কখনো চা খায় না। আজ সে নিজের জন্যেও এক কাপ বানাল। সফিককে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

রাগ করব কেন?

দু'দিনের কথা বলে ছ'দিন কাটিয়ে এলাম এই জন্যে।

প্রয়োজন হয়েছে খেতে, এই নিয়ে রাগ করব কেন? তোমার কথা শুনে মনে হয় আমার স্বভাব হচ্ছে অকারণে রাগ করা। আমি কি সে রকম?

না।

সফিক হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, একবার ভাবছিলাম তোমাকে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ টুনীকে নিয়ে চিটাগাং উপস্থিত হব। দেখব তুমি কি করো।

এলে না কেন? তোমরা এলে আমার কত ভালো লাগত। বলতে বলতে কি যে হলো নীলু স্বরঝর করে কেঁদে ফেলল। সফিক অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার?

কি যে ব্যাপারতা কি নীলু নিজেও জানে? আমরা আমাদের কতটুকুই বা জানি?

সফিক আবার বলল, কি হয়েছে নীলু? তার গলার স্বর আশ্চর্য কোমন শোনাল।
নীলু বলল, কিছু হয়নি, এসো ঘুমুতে যাই।

বিছানার মাঝামাঝি টুনী শুয়ে আছে। নীলু নিজেই তাকে এক পাশে সরিয়ে দিল। সরিয়ে দিতে গিয়ে লক্ষ করল টুনীর বাঁ চোখের নিচে ছোট একটা কালো বিন্দু উঁচু হয়ে আছে। নীলু বলল, ওর এখানেই কি হয়েছে?

উলের কাঁটা দিয়ে খোঁচা লাগিয়েছে। আরেকটু হলে চোখে লাগত।

নীলু গা দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। সে তার মেয়ের কপালে হাত রাখল।
গা কেমন যেন গরম গরম লাগছে। নীলু বলল, দেখো তো ওর শরীরটা কি গরম?

সফিক গা করল না। সহজ স্বরে বলল, এই ঠাণ্ডায় পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে ঘুরে জ্বরজারি হয়েছে আর কি। বাচ্চাদের মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখ হওয়া ভালো এতে শরীরে এন্টি বডি হয়।

কে বলেছে তোমাকে?

কেউ বলেনি। কোথায় যেন পড়েছি।

এসো ঘুমুতে এসো।

নীলু আবার মেয়ের কপালে হাত রাখল। গা গরম থাকার উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাচ্চাদের জ্বরজারি সব সময়ই হয়। কত বার এখনি হয়েছে কিন্তু আজ নীলুর এ রকম লাগছে কেন?



শারমিন বিকেলে বাগানে হাঁটছিল।

তার গায়ে আকাশী রঙের একটা চাদর। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে বলে চোখ-মুখ ফোলা ফোলা। তার দুপূরে ঘুমানোর অভ্যাস নেই। আজ কেন জানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠলে মন কেমন করে। অজানা এক ধরনের কষ্ট হয়। কেন হয় কে জানে।

সে হাঁটতে হাঁটতে কুল গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। পেকে সব টসটস করছে। ঝাওয়ার মানুষ নেই।

আপা বরই পেড়ে দেই খান।

না। তোমার নাম কি?

আমার নাম কুন্দুস।

এই ছেলেটিকে সে আগে দেখেনি। সতেরো-আঠারো বছর বছর। দেখলে মনে হয় কলেজ টলেজে পড়ে। ঝকঝকে পরিষ্কার দাঁত।

টুথপেস্টের সুন্দর একটা বিজ্ঞাপন হয় একে দিয়ে।

কুন্দুস তুমি আমাকে চা বাওয়াতে পারবে?

এক্সুনি আনছি আপা। বড় সাহেবের সঙ্গে চা বাবেন না?

বাবা কি বাসায় নাকি?

জ্বি দোতলার বারান্দায়।

না আমি বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাব। তুমি এখানে নিয়ে এসো।

চেয়ার দেই আপা?

চেয়ার দিতে হবে না। হাঁটতে ভালো লাগছে।

ছেলেটি প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে গেল। নতুন যারা আসে প্রথম দিকে তাদের কাজের উৎসাহের কোনো সীমা থাকে না। কিছুদিন পার হলেই উৎসাহে ভাটা পড়ে। তখন আর ডাকাডাকি করেও পাওয়া যায় না। অবশ্যি এবার সবাই তার দিকে একটু বেশি নজর দিচ্ছে। কেউ না কেউ পাশে আছেই। এত যত্ন না করলেই সে ভালো থাকত। নিজের মতো থাকতে ইচ্ছে করে। নিজের মত থাকা সম্ভব হয় না।

মালী খুনতি দিয়ে মাটি ঠিক করছিল। খুনতি রেখে সে শারমিনের দিকে আসছে। সেও এখন দীর্ঘ সময় ধরে নানান কথা বলবে। অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কথা।

গোলাপের গাছের কি অবস্থা হইছে দেখছেন আপা?

না দেখিনি। কি অবস্থা?

ছোট ফুল। একদিনের বেশি থাকে না।

এরকম হলো কেন?

সেইটাই তো আফা বুঝি না। সার দেই। পোকা-মারা অমুখ দেই।

শারমিন চুপ করে রইল। মালী ঝানিকঞ্চণ চুপ করে থেকে বলল, মানুষজন বাগানে না আসলে ফুল হয় না আফা।

তাই নাকি?

জি আফা। মানুষের মায়া-মুহুরত গাছ পছন্দ করে। যে বাড়িতে দেখবেন মানুষজন নাই সেই বাড়িত ফুলও নাই।

বেশ মজা তো।

অখন আপনি আইছেন দেখেন কেমন ফুল ফোটে।

ঠিক আছে দেখব।

কয়দিন থাকবেন আফা?

শারমিন জবাব দিল না। সে ক'দিন থাকবে এটা নিয়ে সবাই বেশ উদ্বিগ্ন। সরাসরি কিংবা একটু বাঁকা পথে এ বাড়ির সবাই কিছু একটা সন্দেহ করছে। সন্দেহ কবাই স্বাভাবিক। এ বাড়িতে সে একা এসেছে। রফিক তার সঙ্গে আসেনি। প্রায় ন'দিন হয়ে গেল এর মধ্যে একবার দেখা করতেও আসেনি।

রহমান সাহেব ডাইনিং টেবিলে রফিকের প্রসঙ্গ একবার তুলেছিলেন। শারমিন কোনো আশ্রয় দেখায়নি। ঠাণ্ডা হয়ে বলেছে-কাজটাজ নিয়ে থাকে তাই আসে না।

রহমান সাহেব বললেন, এমন কোনো কাজ তো থাকার কথা নয়। শারমিন বলল, তাহলে হয়তো এ বাড়িতে আসতে লজ্জা পায়।

এ বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে লজ্জা নেই এ বাড়িতে আসতে লজ্জা? অন্য কোনো ব্যাপার কি আছে?

তা আমি কি করে জানব বাবা। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি? ওর কথা কি করে বলব?

তোর কথাই না হয় শুনি।

কোন কথাটা শুনতে চাও?

are you happy?

আমি জানি না বাবা।

জানো না মানে?

সত্যি জানি না। আমার মনে হয় আমার মধ্যে সুখী হবার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। যারা সুখী হয় তাদের মধ্যে সুখী হবার বীজ থাকে। জল, হাওয়া এবং ভালোবাসায় সেই বীজ থেকে গাছ হয়।

এই পর্যন্ত বলেই শারমিন থেমে গেলে। উচুদরের ফিলসফিক হয়ে যাচ্ছে। খাবার টেবিলে যা মানাচ্ছে না। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে রহমান সাহেব বললেন, তোর স্বপ্তর বাড়ির অন্য লোকদের সম্পর্ক বল।

কি বলব?

কে কেমন মানুষ।

জানতে চাও কেন?

পরিবেশটা কেমন জানতে চাচ্ছি।

পরিবেশ চমৎকার।

এক কথায় সারহিস কেন? প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা করে বল।

এখন থাক বাবা।

থাকবে কেন? এখনি বল। তোর স্বপ্নের সাহেব কেমন মানুষ?

ঐ বাড়ির সবচে' ভালো মানুষ। পাগলা ধরনের কিছু লোক থাকে না বাবা, যারা মনে করে পৃথিবী খুবই সুন্দর জায়গা। উনি সেই রকম একজন মানুষ। খুব সুখী মানুষ। এবং তাঁর ধারণা পৃথিবীর সবাই তাঁর মতো সুখী।

আর তোর শাতড়ি?

ষিটখিটে ধরনের মহিলা। চোঁচামেচি না করলে তাঁর ভালো লাগে না। অকারণে চোঁচান। কেউ তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না বলে আরো বেগে যান। তাঁর ধারণা সবাই তাঁকে অগ্রাহ্য করেছে। সংসারের কর্তৃত্ব তাঁর থেকে চলে যাচ্ছে।

সংসারের কর্তৃত্ব কার কাছে?

ভাবীর কাছে। পুরো সংসার তার মুঠোয় অথচ আমার শাতড়ি তা জানেন না। কারণ ভাবী যে কি চালাক তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। রোজ জিজ্ঞেস করবে-মা আজ কি রান্না হবে? আমার শাতড়ি হয়তো একটা কিছু বলবেন কিন্তু রান্না হয়তো তার আগেই হয়ে গেছে, শুধু শাতড়িকে খুশি করার জন্যে বলা।

মেয়েটার নাম কি যেন?

নীলু। নীলু ভাবী

তোর সঙ্গে ভাব আছে?

উনার সঙ্গে আমার খুব একটা ভাব নেই। উনি অতিরিক্ত রকমের বুদ্ধিমতী। এত বুদ্ধিমতী কাউকে আমার ভালো লাগে না। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী শুধু এই কারণেই তুই তাকে পছন্দ করিস না, নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?

অন্য কোনো কারণ নেই। তাছাড়া উনাকে পছন্দ করি না এই কথা কিন্তু আমি বলিনি। উনাকে পছন্দ না করে উপায় নেই।

মেয়েটির হাসবেত্ত সম্পর্কে বল। সফিক বোধ হয় ছেলেটির নাম তাই না?

হ্যাঁ। উনার সঙ্গে আমার কথাই হয় না।

কেন?

উনি কথা খুব কম বলবেন। বাবলু বলে একটা ছেলে ছিল, ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলতেন। এখন বাবলু নেই উনারও মুখ বন্ধ।

দু'ভাই তাহলে দু'রকম?

হ্যাঁ উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। বাবা আমি উঠি?

খাওয়া শেষ?

হ্যাঁ শেষ।

শারমিন উঠে গেল। রহমান সাহেবের সঙ্গে বেশিক্ষণ বসতে তার ভালো লাগে না। একটা অবস্তি মনের উপর চাপ ফেলাতে থাকে। মনে হয় এই বুঝি বাবা তাদের দু'জনে নিয়ে এমন এক প্রশ্ন করবেন যার জবাব দেয়া যাবে না।

এই যে একা একা বাগানে হাঁটছে সে জানে রহমান নাহেব তাকে লক্ষ্য করছেন।
হয়তো নিজেই বাগানে নেমে আসবেন।

আপা চা।

কুদ্দুস এ বাড়ির নিয়মকানুন জানে না। চা খাবার জন্যে শারমিনের আলাদা কাপ আছে। নিজের কাপ ছাড়া শারমিন খেতে পারে না। কুদ্দুস পেটমোটা একটা কাপে এনেছে। দেখেই রাগ লাগছে।

মিষ্টি হয়েছে আপা?

হ্যাঁ হয়েছে, তুমি এখন যাও।

কুদ্দুস গেল না। দূর থেকে শারমিনকে লক্ষ্য করতে লাগল। শারমিন ছোট নিশ্বাস ফেলল। কিছু ভালো লাগছে না। জীবন যদি নতুন ভাবে শুরু করা যেত তাহলে সে কি করত? রফিককে কি বিয়ে করত?

রহমান সাহেব নেমে এসেছেন। হাতের ইশারায় শারমিনকে ডাকছেন। শারমিন এগিয়ে গেল।

টেলিফোন এসেছে।

কে বাবা?

জিন্জেন্স করিনি মনে হচ্ছে রফিক।

শারমিন টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ রফিকই তবে গলার স্বরটা কেমন অন্য রকম। ঠাণ্ডা লেগেছে হয়তো।

হ্যালো-শারমিন?

হ্যাঁ।

সুখে আছ কি না জানার জন্যে টেলিফোন করলাম।

তার মানে?

আছ কেমন?

ভালোই আছি।

বাড়ি ফিরে আসার কোনো পরিকল্পনা কি আছে?

বাড়িতেই তো আছি।

এই বাড়ি নয় তোমার নিজের বাড়ির কথা বলছি।

শারমিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার তো মনে হয় এটা আমার নিজেরই বাড়ি। অন্য কারোর নয়।

আজকাল তাহলে জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

যা বলতে চাও সহজ করে বলো এত পেন্‌চিও না। কি বলতে চাও তুমি?

কিছু বলতে চাই না।

বেশ তাহলে টেলিফোন রেখে দেই।

তুমি কবে আসবে?

জানি না কবে আসব। ইচ্ছে হলেই আসব।

মনে হচ্ছে খুব সহজে ইচ্ছে হবে না।

শারমিন কথা বলল না। রফিক বলল, তোমার বিদেশ যাত্রার কত দূর?

বেশ অনেকদূর।

যাচ্ছই তাহলে।

সে তো তুমি জানো। তোমাকে আগেই বলেছি।

আমার ইচ্ছে নয় তুমি যাও।

তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা এখানে উঠছে কেন? যাচ্ছি তো আমি। তুমি তো যাচ্ছ না।

তোমার যাবার ব্যাপারে আমার কিছু বলার থাকবে না?

না থাকবে না।

তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ তুমি আমার স্ত্রী।

না ভুলিনি। তুমি আমাকে ভুলতে দিচ্ছ না। সারাক্ষণই মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছ।

মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভুলে যেতে চাও।

শারমিন জবাব না দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। তার মনে হলো সামনের সময়টা খুব খারাপ। এই সময় পার করা সহজ হবে না। সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গেল। নিজেকে খুব একা লাগছে। এরকম কখনো লাগে না। আজ মনে হচ্ছে এই বিরট বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই।



নীলগঞ্জ থেকে সোবাহানের চিঠি এসেছে। দীর্ঘ চিঠি। নীলুর কাছে লেখা। চিঠি পড়ে নীলু হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। এই লোকটির নির্বুক্তিতার কোনো সীমা নেই। একটা মানুষ এতটা নির্বোধ হয় কেন? গুটি গুটি হবকে লিখেছে—

কল্যাণীয়াষু নীলু/

আশা করি সবাইকে নিয়ে তুমি তোমার স্বভাবমতো ভালো আছ।
কদিন থেকেই ভাবছি এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে তোমাকে লিখব। বাবলু
প্রসঙ্গে যাতে কোনো দৃষ্টিভ্রান্তি করতে না পারে।

বাবলু ভালো আছে এবং বলা যেতে পারে সুখে আছে। গ্রাম তাকে
শ্রবণভাবে আকর্ষণ করেছে। খোলা মাঠ, নদী, বনজঙ্গল এসব তাকে
কখনো দেখেনি। সে দেখছে মানুষ- মানুষের মধ্যে যেসব স্বাভাবিক ব্যাপার
আছে সেই সব। মানুষের বাইরেও যে আরেকটি সুন্দর শক্তি জগৎ আছে
তা সে জানত না। এখন জানল। ঘন্টার পর ঘন্টা দেখি নদীর ধারে
দাঁড়িয়ে আছে। বনের ভেতর থেকেও কয়েকবার তাকে লোক পাঠিয়ে
ঝুঁজে আনতে হয়েছে। ও তার নিজের একটি পৃথিবী ঝুঁজে পেয়েছে। সেই
পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে আনতে মন চলেছে না। আমি তাকে এখানের
একটি স্থলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি।

আমি জানি তুমি আমার নির্বিকিতায় হাসছ। আমি সামনে থাকলে হয়তো খুব কড়া কড়া কিছু কথা শুনিতে দিতে তবু তুমি একটু ডাবলেই বুঝবে আমি যা করছি তার ফল শুভ হবার সম্ভাবনা আছে। আমি নিজেও এখানে থেকে গেলাম। নীলগঞ্জ স্কুলে একটা মাটারি জুটে গেছে। সুখী নীলগঞ্জের যে কাজ শুরু হয়েছিল তা শেষ করা যায় কিনা তাও দেখছি। দূর থেকে যে কাজটি অসম্ভব বলে মনে হতো এখন তেমন অসম্ভব বলে হচ্ছে না।

মজার ব্যাপার কি জানো নীলগঞ্জের লোকজন কেন জানি আমাদের বেশ পছন্দ করছে। আমাদের আড়ালে ডাকে 'পাগলা মাটারি'। যদিও পাগলামির কিছুই আমি করছি না। নামটা আমার পছন্দ হয়েছে কারণ এরা কবির মনকেও পাগলা মাটারি ডাকত। যে কোনোভাবেই হোক আমাদের মানুষদের উপর আমি কিছুটা প্রভাব ফেলেছি বলে মনে হয়। গত শুক্রবার বড় রকমের একটা গ্রাম্য বিবাদ হলো। সবাই দল বেঁধে এলো আমার কাছে। আমি যেন একটা নীমাংসা করে দেই। আমি যা বলব তাই নাকি তারা শুনবে। আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় ওরা আমার মধ্যে কবির মামার ছায়া দেখতে চায়। কিন্তু এত বড় যোগ্যতা কি আমার আছে? আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র মানুষ।

তোমরা কবির মামার কুলখানিতে কেন এলে না বলো তো? শওকত পর পর দুদিন টেশনে কাটাল। কখন তোমরা আসো। এসে কষ্টেই পড়ো কি না। তোমরা না আসায় তার কষ্ট দেখে আমি কষ্ট পেয়েছি। চলে এসো না একবার। দেখে যাও আমরা কেমন আছি। শিকনিক করতেও তো মানুষ আসে।

কবির মামা প্রসঙ্গে মজার কথা শোনো। মাঝে মাঝে দূর দূর থেকে লোকজন আসে পীর সাহেবের কবর জিয়ারত করতে। পীর কে বুঝতে পারছ তো? কবির মামা। কি মুশকিল বলে দেখি। একজন নাস্তিক মানুষকে এরা মনে হয় পীর বানিয়ে ছাড়বেই। দূর দূর গ্রামের লোকজন মোমবাতি আগরবাতি এইসব দিয়ে যায়। আজ থেকে পাঁচ বছর পর যদি দেখো এখানে বিরাট মাজার শরীফ বসে গেছে। উরস হচ্ছে। আমি সেই মাজার শরীফের প্রধান খাদেম, তাহলে অবাক হয়ো না। এ দেশে সবই সম্ভব।

আজ্ঞা নীলু, তোমার শরীর ভালো আছে তো? কোনো কারণে তোমার মনটন খারাপ না তো? পরশ রাতে স্বপ্ন দেখলাম তুমি মাটির গড়াগড়ি করে কান্দছ। স্বপ্ন স্বপ্নই। তবু কেমন যেন লাগছে। তুমি ভালো আছ এই খবর জানিও, যদি সময় পাও। যা বাস্তব থাকে সময় পাওয়ার কথা নয়। বিশাল এই চিঠি কেঁদে নিজেই বিব্রত হোক করছি। কিছু মনে করো না। ভালো থাকো।

তোমার দুলাডাই,

সোবাহান।

পুনঃঃ বাবলুর আর একটি শিল্পকর্ম পাঠানাম। দু'মাথাওয়ালা ছাগল।

নীলু তার দুলাইভায়ের চিঠি বেশ কয়েকবার পড়ল। প্রথমে পড়বার সময় লোকটিকে যতটা নির্বোধ মনে হচ্ছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না। হয়তোবা খুব গুছিয়ে লেখা চিঠির কারণে। এই লোকটি যে এত গুছিয়ে লিখতে পারে তা নীলু জানত না। চিঠির ভেতর খুব সহজ-সরল একটা ভঙ্গি ঢুকে গেছে। অথচ এই মানুষটির জীবন খুব সহজ-সরল নয়।

কোনো রকম আদর্শবাদ, মহৎ চিন্তা, উচ্চস্তরের ভাবানুভূতি নীলু তার মধ্যে কখনো দেখেনি। এই লোক হঠাৎ বদলে গিয়ে গ্রাম উন্নয়ন শুরু করবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো দু'দিন পরই দেখা যাবে গ্রাম আর তার ভালো লাগছে না। সব ছেড়েছুড়ে আবার অন্য কোথাও চলে যাবে। যাবার আগে বাবলুকে এ বাড়িতে ফেলে যাবে। মাস দুই পর চোরের মতো আসবে। নীন ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে থাকবে। তার কাপড়ের ব্যাগে থাকবে বাবলুর জন্যে আনা কোনো সস্তা খেলনা। অক্ষম বাবার ভালোবাসা সেই খেলনায় থাকবে কিন্তু তা বাবলুর মনোহরণ করবে না। আজকাল শিশুরাও সস্তা খেলনা এবং দামি খেলনার তফাৎটা ভালোই বুঝে।

সন্ধ্যায় নীলু সফিককে চিঠি পড়তে দিল। সফিক হাই তুলে বলল, এত লম্বা চিঠি আমি পড়তে পারব না। বিষয়বস্তু কি আমাকে বল।

বিষয়বস্তু কিছু নেই। পড়ো না। কতক্ষণ আর লাগবে।

সফিক চিঠি শেষ করে আশ্চর্য হয়েই বলল, সুন্দর চিঠি তো! নীলু বলল, কোন জিনিসটা সুন্দর?

ঘরোয়া ভঙ্গিটা। মনে হয় উদ্ভুলোক যেন গল্প করছেন। তোমরা এক কাজ করো না কেন-ঘুরে আসো নীলগঞ্জ থেকে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসে।

নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

টুনীর ভালো লাগবে। গ্রামে গিয়ে নদী, বন, এইসব দেখবে বেচারি একা একা থাকে।

সত্যি যেতে বলছ?

হ্যাঁ যাও। আমিও টলম্যানকে বলে দেখি যদি ছুটি পাই। সম্ভাবনা অবশ্যি কম তবু দু'একদিনের জন্যে হয়ত ছাড়বে।

সত্যি সত্যি তুমি যাবে?

হ্যাঁ মানে চেষ্টা করব। বিদেশে ছুটির দিনগুলোতে সবাই বাইরে টাইরে যায়। আমাদের তো এসব বালাই নেই। কাল আমি টলম্যানের সঙ্গে কথা বলে দেখব ব্যাটাকে ভেজানো যায় কি না।

হঠাৎ তোমার এত উৎসাহের কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভেমন জোরালো কোনো কারণ নেই। যেতে ইচ্ছে করছে। তুমি বাবা-মার সঙ্গেও কথা বলো। ওরা যদি যেতে চান।

মনোয়ারা নীলগঞ্জে যাবার কথায় বেশ বিরক্ত হচ্ছিল। তাঁর বিরক্তির কারণ স্পষ্ট নয়। তিনি শুকনো গলায় বললেন-এইসব এখনো সাদা দাও। আম-কাঁঠালের সিজনে গেলেই হবে।

টুনীর আক্সা সবাইকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

দল বেঁধে গেলে থাকবে কোথায় তুমি? শীতের দিন। এতগুলি মানুষের লেপ-কাঁথা কে দিবে। হুট করে একটা কিছু করলেই তো হয় না।

শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে নিয়ে করে গেলে হয় না মা?

যদি হয় তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। মুখ দিয়ে একবার যখন বের করেছ ওখন তো এটা করবেই। যাও নিওমেনিয়া বাড়িয়ে আসো।

হোসেন সাহেব যাবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখালেন। মনোয়ারার অনগ্রহ শেষে চোখে লাগে তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহও তেমনি চোখে লাগে। তিনি নানান রকম লিষ্ট করতে লাগলেন। সময়ে-অসময়ে নীলুর সঙ্গে বসে পরামর্শ-হারিকেন নিতে হবে বুঝলে বোঝা। এটা খুবই দরকার।

ওখানে নিশ্চয়ই হারিকেন আছে বাবা।

তা তো আছেই। হয়তো একটা বড়জোর দুটা। এতগুলি মানুষ আমরা যাচ্ছি। দুটা হারিকেনে আমাদের কি হবে বলো? টর্চ লাইট নিতে হবে, মোমবাতি নিতে হবে। একটা কেরোসিনের চুলাও নেয়া দরকার। ধর চট করে এক কাপ চা খাবার দরকার হলো, কোথায় পাবে? সেখানে তো আর গ্যাসের চুলা নেই। কি বলো মা?

তা তো বটেই।

তুমি জহীর আর শাহানাকেও বলো। ওদেরকে নিয়ে যাই।

জি তাদেরও বলব। টুনির বাবার ছুটি কি না এখনো বুঝতে পারছি না। ছুটি হলো বলব।

না না তুমি মা আগে থেকেই বলো।

শাহানা বেড়াতে যাবার কথায় ঠোট উল্টে বলল, তোমাদের ব্যাপারে তোমরা যাও আমাকে টানছ কেন?

নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, আমাদের ব্যাপারে মানে? তুমি কি আমাদের কেউ নও?

না ভাবী। আমি তোমাদের কেউ না।

ও তাই নাকি! আমি অবশিষ্ট এটা আগে জানতাম না। এখন জানলাম। না হয় তুমি বাইরের গেষ্ট হিসেবেই আমাদের সঙ্গে চলো। বাইরের গেষ্টও কিছু যাচ্ছে।

বাইরের কে যাচ্ছে?

আমাদের বাড়িওয়ালার মেয়ে বীণা।

আনিস ভাই যাচ্ছে না?

না।

দুনিয়াসুন্দর লোককে তোমরা নিচ্ছ। তাকে নিচ্ছ না কেন? সে কি দোষ করল? বলেছিলে তাকে?

নীলু গম্ভীর মুখে বলল-না।

বলোনি কেন? এটা তো ভাবী সাধারণ ভদ্রতা। এক বাড়িতে থাকে দিনরাত এটা ওটা ফরমাস করে দেয় আর

শাহানা কথা শেষ করল না। নীলুর কঠিন চোখের দ্বারা খতমত খেয়ে গেল। নীলু কড়া গলায় বলল, ঐ চিন্তা এখনো মাথায় নিয়ে ঘুরছে?

শাহানা টেনে টেনে বলল, কোন চিন্তা?

তুমি ভালোই জানো কোন চিন্তা। অনেক তো হলো শাহানা আর কেন?

তুমি কি বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাবী। আমি শুধু বলছি-ভদ্রতা করে
হলেও তোমার উচিত ছিল আনিস ভাইকে বলা। সবাই যখন যাচ্ছে।

আনিস এ বাড়িতে এখন থাকে না। থাকলে নিশ্চয়ই বলতাম।

আনিস ভাই তাহলে থাকে কোথায়?

আমি জানি না।

সে কি কথা ভাবী, তুমি জানো না কেন?

আমাকে কিছু বলে যারিনি, কাজেই আমি জানি না।

শাহানাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এফুগি কেঁদে ফেলবে। নীলুর বিবক্তির সীমা রইল
না। এসব কি শুরু করেছে শাহানা?

আনিসকে নিয়ে বাড়াবাড়িটাই তার অসহ্য লাগছে। নীলুর কেন জানি মনে হচ্ছে
এই বাড়াবাড়ির খানিকটা লোক দেখানো।

নীলু বলল, আমি এখন উঠব শাহানা, তুমি জহীরকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে গেলে
আমাদের ভালো লাগত।

শুধু তোমাদের ভালো লাগলে তো হবে না, আমরা ভালো লাগতে হবে। আমার
ভালো লাগবে না।

কি করে বুঝলে ভালো লাগবে না?

জানি না কি করে বুঝলাম।

নীলু উঠে দাঁড়াল। শাহানার এখানে এসে তার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। অনেক
রকম ঝামেলা করে আসা। অফিস থেকে এই কারণে তাকে ছুটি নিতে হয়েছে।
ভেবেছিল প্রথম আসবে শাহানাদের বাড়ি সেখান থেকে যাবে শারমিনদের বাড়িতে।
কিন্তু এখন আর কোথাও যেতে হচ্ছে করছে না। নীলু অবাক হয়ে লক্ষ করল শাহানা
দোতলা থেকে নিচে নামল না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলল-ঠিক আছে ভাবী পরে দেখা
হবে। সময় পেলে আবার এসো। অবশিা যদি তোমার ইচ্ছা করে।

গেটের কাছে জহীরের গাড়ি। ড্রাইভার বলল, আপনি এসেছেন শুনে স্যার পাঠিয়ে
দিয়েছেন। যেখানে যেখানে যাবেন নিয়ে যাব। নীলু বলল, আমার গাড়ি লাগবে না,
রিকশা নিয়ে চলে যাব।

স্যার তাহলে খুব রাগ করবেন। আপা আসেন।

বাসায় ফিরে দেখে বসার ঘরে আনিস। জড়সড় হয়ে বসে আছে। নীলুর কেন জানি
খুব খারাপ লাগছে। হচ্ছে করছে খুব কড়া কড়া কিছু কথা শুনাতে।

ভাবী ভালো আছেন?

হ্যাঁ ভালো।

আমার নামে কি কোনো চিঠি এসেছে ভাবী?

না কোনো চিঠিফিঠি আসেনি।

যদি আসে একটু রেখে দেবেন, আমি নিয়ে যাব।

ঠিক আছে রাখব।

ভাবী আপনার কি শরীর খারাপ?

শরীর ঠিকই আছে। তুমি এখন যাও। আমি শুয়ে থাকব। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

আনিস ইতস্তত করে বলল, ভাবী আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবেন-শ' দুই।

নীলু ঠাণ্ডা গলায় বলল, এখন আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।

আনিস চলে গেল। সে প্রচণ্ড লজ্জা পেয়েছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজাটা একটা ধাক্কা খেল। হাঁটতে গিয়ে লক্ষ্য করল ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। সে ভেবেই পেল না নীলু ভাবীর মতো মানুষ তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার কেন করলেন। তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। নিজেকে সামলাতে না পারলে টপ টপ কমে চোখ থেকে পানি পড়বে। রাস্তার লোকরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। রাস্তায় নামবার আগে থেকেই হোক নিজেকে সামলাতে হবে। সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গেল।

ছাদে তার নিজের ঘরটির দরজা খোলা, সুন্দর পর্দা ঝুলছে। কে থাকে এখানে? আনিস কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। বীণা, গভীর মনোযোগে পড়ছে। পিঠময় খোলা চুল। চেয়ারে পা তুলে কি অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসা। ঘরটি কি সুন্দর সাজিয়েছে।

এই বীণা।

বীণা চমকে উঠল।

আরে আনিস ভাই। আপনি কোথা থেকে?

আকাশ থেকে।

আসুন ভেতরে আসুন তো।

আনিস ভেতরে ঢুকল। বীণা বলল, আপনার ঘরের দখল নিয়ে নিয়েছি।

তাই তো দেখছি।

নিরিবিলা পড়াশোনার জন্যে এটা করলাম। আপনাকে তাড়িয়েছিও এই কারণে।

ভালো করেছ।

উপায় ছিল না কারণ আমাকে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

সারাজীবন ফাস্ট-সেকেন্ড হতে হবে। কেন বলুন তো?

বলতে পারছি না।

কারণ আমি এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করব যার কাজ হবে দিনরাত ঘরে বসে থাকা। কাজেই চাকরিটাকরি করে এই লোককে খাওয়াতে হবে। তার জন্যেই আমার খুব ভালো রেজাল্ট দরকার। যেন পাস করলেই চাকরি হয়ে যায়। বুঝতে পারছেন? পারছি।

এখন বলুন তো আমি কেমন মেয়ে?

তুমি খুব ছেদী মেয়ে।

ঠিক বলেছেন, আর আপনি হচ্ছেন একজন ভাবদা পুরুষ। এখন বলুন ও বাড়িতে কেন এসেছেন?

এম্মি এসেছি।

না এম্মি না। নিশ্চয়ই কোনো কাজে এসেছেন।

নীলু ভাবীর কাছে এসেছিলাম।

কেন?

আমার কিছু টাকার দরকার হলো মানে ইয়ে

পেয়েছেন টাকা?

না উনার হাত খালি।

কত টাকা দরকার?

তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করব।

আহ্ যেটা জিজ্ঞেস করেছি সেটা বলুন-কত টাকা দরকার?

শ' দুই।

বসুন এখানে আমি নিয়ে আসছি। স্ববরনার পালাবেন না।

বীণা নিচে নেমে গেল। মা-বাবা দু'জনের কেউই বাসায় নেই। এক খালা আছেন ষ্টিল আলমারীর চাবি তাঁর কাছে নেই। লতিফা তোষকের নিচে ভাংতি টাকা-পয়সা রাখেন, সেখানে দু'টি ময়লা ন্যাভন্যাতে পাঁচ টাকার নোট ছাড়া কিছুই নেই। বীণা খালি হাতেই উপবে উঠে এলো। ক্ষীণ স্বরে বলল, আনিস ভাই আপনি কোথায় থাকেন ঠিকানাটা লিখে যান, আমি সন্ধ্যার আগেই টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

তুমি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ বীণা।

আমি যা বলছি করুন-এই নিন কাগজ-কলম। পরিষ্কার করে ঠিকানা লিখুন। আমি চা বানিয়ে আনছি, চা খেয়ে তারপর যাবেন।

বীণা আবার নিচে নেমে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় আনিসের বিশ্বস্তের সীমা রইল না।

তার কেন জানি মনে হচ্ছিল বীণা এ রকম কিছু করে বসতে পারে। সত্যি সত্যি করলও তাই। নিজেরই এসে উপস্থিত। নোংরা ঘর। চারপাশের নোনাধরা দেয়াল, আস্তুর উঠে আসছে। দীনহীন পরিবেশের কিছুই মেয়েটিকে প্রভাবিত করল না। কিংবা হয়তো করেছে সে তা বুঝতে দিচ্ছে না। সে আনিসের চৌকিতে বসে আছে বেশ সহজ ভঙ্গিতে, যেন এটাই তার ঘরবাড়ি। কথাও বলছে সহজ স্বরে।

পাশের চৌকিটায় কে থাকেন?

আমার ক্রমমেট।

উনি এখন নেই?

না অফিস শেষ করে টিউশনিতে যান, ফিরতে ফিরতে দশটা-এগারোটা বাজে।

আপনারা কি নিজেরাই রান্না করেন-হাঁড়ি-পাতিল দেখছি।

হ্যাঁ নিজেরাই করি। খরচ কম পড়ে।

রান্না করেন কে?

বেশির ভাগ সময় আমিই করি। আমার অবসর বেশি।

আজ কি রান্না করলেন?

এখনো কিছু করিনি।

আজকের রান্নাটা আমি করে দেই?

আনিস আঁতকে উঠে বলল, কি বলছ এসব? তুমি কি রান্না করবে?

আপনার কি ধারণা আমি রান্না জানি না?

জানবে না কেন? নিশ্চয়ই জানো। কোনোরকম খাবেনা না করে তুমি চুপচাপ বসে থাকো তো।

আমি কিন্তু এখানে অনেকক্ষণ থাকব।

অনেকক্ষণ থাকব মানে?

অনেকক্ষণ থাকব মানেও জানেন না? বাংলা ভুলে গেছেন নাকি?

আনিস কি বলবে কি করবে ভেবে পেল না। এই মেয়েটা তাকে মনে হচ্ছে সত্যি। সত্যি বিপদে ফেলবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাশের ঘরগুলির বোর্ডাররা দারদার উঠে খুঁকি দিচ্ছে। আনিস হারিকেন ধরাল। বীণা অবাক হয়ে বলল, হারিকেন কেন আপনাদের ইলেকট্রিসিটি নেই?

ছিল। বাড়িওয়ালা এক বছর যাবৎ ইলেকট্রিসিটির বিল দিচ্ছে না, লাইন কেটে দিয়েছে।

বাড়িওয়ালাও মনে হয় আপনাদের মতো গরিব।

আসলেই তাই। এই এতটুকু বাড়ি এর সাতজন শরিক। শরিকে-শরিকে বিবাদ লেগেই আছে। বিবাদ মানে কঠিন বিবাদ। মারামারি হচ্ছে ভালোভাবে। পরশু একজন আরেকজনকে রামদা নিয়ে তাড়া করেছিল।

বলেন কি?

আজও হয়তো করবে।

করে করুক। এই ঘরে না ঢুকলেই হলো।

রাত দশটা বেজে গেছে। বীণা ফিরছে না। বীণার বাবা থানায় ডায়েরি করতে গিয়েছেন। ওসি সাহেব চোখ মটকে জিজ্ঞাস করেছেন মেয়ের কোন 'লভ' টত আছে নাকি? তিনি শুকনো গলায় বলেছেন-আমার মেয়ে ঐ রকম না।

আগে ভালো করে খোঁজ নিন। মেয়ের ট্যাংক স্যুটকেস এসব খুলে দেখুন চিঠিপত্র পান কি না। তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ওরা এইসব ভালো জানবে। টাকা-পয়সা কিছু নিয়ে গেছে?

তার মার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে গিয়েছিল। নিউ মার্কেট থেকে কি একটা বই কিনবে। টেক্সট বুক।

এটা ফালতু কথা। যাওয়ার ভাড়া নিয়ে গেছে। সপ্তাহে এ রকম তিন-চারটা কেইস আমরা ডিল করি। মেয়ে পালিয়ে যায় পেয়ারের লোকের সঙ্গে। সস্তার একটা হোটেলে উঠে ফুটি করে।

এইসব কি বলছেন আপনি?

সত্যি কথা বলছি রে ভাই। তাও তো সবটা বলছি না। রেখে-ঢেকে বলছি। মাঝে মাঝে কি হয় জানেন? ছেলে মেয়েটাকে ভুজুং ভাজুং করে বের করে নেয়। একটা হোটেলে নিয়ে তুলে, সেই হোটেলে আগে থেকেই তার বন্ধুবান্ধব অপেক্ষা করছে। তারপর মজ্জাটা বুঝতে পারছেন তো? এইসব হারামজানাদের ধরতেও পারি না। মেয়ে বা মেয়ের আত্মীয়স্বজন কেউ কেইস করে না। সম্মানহানির ভয়। মান হ্রাসের ভয়। মেয়ের আবার বিয়ে দেয়ার প্রশ্ন আছে।

ভাই, আপনি এসব কি বলছেন?

যা বলছি সত্যি বলছি। একটা শব্দও মিথ্যা না। যান হ্যাঁ যান। যা করতে বললাম করেন। চিঠিপত্রে কোন নাম-ঠিকানা পেলে আমাদের খবর দিবেন-টাইট দিয়ে দিব।

তিনি বাড়ি ফিরলেন ঘোরের মধ্যে। কয়েকবার এমন হলো যেন-

রিকশা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছেন। শরীর দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। তাঁর ধারণা হলো হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। হার্ট এ্যাটাকের সময় নাকি খুব ঘাম হয়।

কি করে বাড়ি পৌছলেন তিনি নিজেই জানেন না।

বারান্দায় একটা মোড়াতে আনিস বসে আছে। বাড়ির ভেতরে বেশ কিছু লোকজন। এদের গোলমাল ছাপিয়েও লতিফার গলা ছেড়ে কান্না শোনা যাচ্ছে। তিনি কাঁপা গলায় আনিসকে বললেন, এখনো পাওয়া যায়নি? আনিস বিব্রত স্বরে বলল, বীণার কথা বলছেন তো? ওকে নিয়ে এসেছি।

নিয়ে এসেছ? কোথায় ছিল সে?

ইয়ে মানে আমার ওখানে একটা বিশেষ প্রয়োজনে

বিশেষ প্রয়োজনে তোমার কাছে? ওয়রের বাচ্চা তুমি মানুষ চেনো না। জুতিয়ে আমি তোমার দাঁত খুলে ফেলব, বেইমান, নিমকহারাম

তিনি সত্যি সত্যি তাঁর স্যাভেল খুলে ফেললেন। হঠাৎ ওনে ভেতরের বাড়ির সবাই বেরিয়ে এলো। লতিফা এসে স্বামীর হাত ধরে প্রায় টেনে-হেঁচড়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। হিস হিস করে বললেন, কেলঙ্কারি আর বাড়িও না। যা হবার হয়েছে। এই রাতেই মেয়ের আমি বিয়ে দেব।

কি বলছ এসব? কার সাথে বিয়ে দেবে?

এই হারামজাদাটার সঙ্গেই দেব, উপায় কি? এত রাত পর্যন্ত একসঙ্গে ছিল কি না কি হয়েছে কে জানে। আগুন আর ঘি।

তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন। লতিফা কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, দাঁড়িয়ে থেকো না। কাজির জোগাড় দেবো।

মাথাটা তোমার খরাপ হয়ে গেল নাকি? ঐ হারামজাদাকে আমি জেলের ভাত খাওয়াব। জুতাপেটা করব।

লতিফা কঠিন স্বরে বললেন, আমি কোনো কথা শুনব না। আজ রাতেই বিয়ে হবে। মেয়ে কি না কি করে এসেছে আমার গা ঘিন ঘিন করছে। আমি এসে যাচ্ছে।

সত্যি সত্যি তিনি হড়হড় করে একগাদা বমি করলেন।

রাত বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আনিসের বিয়ে হয়ে গেল। লতিফা ট্যাংকে তুলে রাখা তাঁর নিজের বিয়ের শাড়িতে বৌ সাজালেন। সফিকের একটা ধোয়া পাঞ্জাবি আনিসকে পরানো হলো। পাঞ্জাবি একটু বড় হলো। কাঁধের খুল অনেকখানি নেমে গেল তবু সেই মাপে বড় ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবিতে অপূর্ব দেখান আনিসকে। লতিফারও এক সময় মনে হলো ছেলেটার চেহারা তো ভালোই। সুন্দরই তো লাগছে। মেয়ে জামাই খরাপ কেউ বলবে না।

তুখু বীণার বাবা কোনো কিছুতেই অংশগ্রহণ করলেন না। অন্ধকার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে রইলেন। হোসেন সাহেব গেলেন কথাবার্তা ঝুলে তাঁর মন ভালো করে দিতে। বিভিন্ন দিক তিনি চেষ্টা করলেন। সব শেষে অত্যন্ত অসুখ পালসেটিলা নিয়ে কথা বলা শুরু করতেই বীণার বাবা বললেন—এত ফালতু কথা বলেন কেন? ভাজব ভাজব করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছেন। যান বাড়িতে গিয়ে ঘুমান।

চিলেকোঠার ঘরে তাড়াহুড়া করে বাসর সাজানো হয়েছে। আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা এসে জুটেছে। এদের আনন্দের কোনো শেষ নেই। সমস্ত ছাদ জুড়ে ছোঁটাহুটি। একটি রেডিওর গান আনা হয়েছে ছাদে। বিশাল দু'টি শিকারে তারস্বরে গান হচ্ছে। সন্ধ্যা, কিন্নর কণ্ঠে গাইছেন—ও বাক বাক বাকুম বাকুম পায়রা। অপূর্ব সুবন্ধনিতো

শীতের বাতাসে যেন নেশা ধরে গেছে। আনিসের চোখ বারবার ভিজে উঠছে। সে জানে এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে চূপচাপ। প্রায় শেষ রাতের দিকে নীলু এসে বলল, আনিস তোমার ঘরে যাও। বীণাকে আমরা নিয়ে আসছি।

আনিস কিছু বলল না। নীলু বলল, আজ আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ বাগান করেছিলাম। কিছু মনে রেখো না ভাই। অন্য কারণ ছিল। আমি এমন খারাপ মেয়ে না আনিস। আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করি।

ভাবী আমিও জানি।

আজ যা হলো তোমার জন্য ভালো হলো। বীণা একটি অসাধারণ মেয়ে। দেখবে ও তোমার জীবনটাই বদলে দেবে।

তাও আমি জানি ভাবী।

এসো ঘরে এসো।

আপনার আঁচলে কি?

গোলাপ। টবের গাছ থেকে ছিড়ে এনেছি। ফুল ছাড়া কি বাসর হয়? তোমার খুব ভাগ্য ভালো। আজ অনেকগুলি গোলাপ একসঙ্গে ফুটেছে।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। আনিস অপেক্ষা করছে। তাকে ঘিরে আছে গোলাপের সৌরভ। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। এই ঘরে এমন একটি নাটক হবে কে জানে।

আনিসের মাথা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে জ্বর এসে যাচ্ছে।

বীণা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপাশে। তার সঙ্গে বেশ ক'টি মেয়ে, সবাই চাপা হাসি হাসছে। বীণার মাথা নিচু। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সে মাঝে মাঝে কঁপে কঁপে উঠছে।

কঁদছে নাকি মেয়েটা? কান্নার কি আছে?



শেষ পর্যন্ত নীলগঞ্জ যাবার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। দলটা মোটামুটি বড়ই। রক্ষিক-শারমিন ছাড়া সবাই যাচ্ছে। শাহানা এবং তার বরও যাচ্ছে। শাহানার জীবন ছিল না। যাচ্ছে জহীরের কারণে। জহীর কেন জানি যাবার জন্যে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। অবশি শেষ সময়ে এই দু'জনও বাদ পড়ল। ট্রেন রাত নটায়। জহীর সন্ধ্যাবেলা এসে বলল, একটা সমস্যা হয়েছে ভাবী। নীলু হেসে ফেলল। জহীর বলল, বানানো সমস্যা নয় সত্যি সমস্যা।

তোমরা তাহলে যেতে পারছ না?

না।

সমস্যাটা কি?

জহীর ইতস্তত করে বলল, চলুন ভাবী ছাদে যাই, সেখানে বলব।

বলতে না চাইলে বলার দরকার নেই।

ভাবী, আমি আপনাকে বলতে চাই। বলা দরকার।

নীলু চিন্তিত মুখে ছাদে উঠে গেল। নির্যাত শাহানা খুব ঝামেলা বাধিয়েছে। সেই ঝামেলার প্রকৃতিটি কি কে জানে। নিশ্চয়ই জটিল কিছু। নয়তো জহীর এতটা অস্থির হতো না। সে সহজে অস্থির হবার ছেলে নয়।

কি ব্যাপার বলো?

বুঝতেই পারছেন শাহনাকে নিয়ে একটা সমস্যা। আজ তোরবেলায় নাস্তা খাবার সময় সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হলো। তারপরই সে ছুটে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সেই বন্ধ দরজা এখনো খুলেনি। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা বলতে পারেন। মানে এই জাতীয় অবস্থায় পড়ে আমার অভ্যাস নেই। খুব বিব্রত বোধ করছি।

কথা কাটাকাটি কি নিয়ে হচ্ছিল?

আনিস সাহেবকে নিয়ে। ও বলল আনিস সাহেবকে একদিন দাওয়াত করে খাওয়াতে চায়। আমি বললাম-খুব ভালো কথা। উনাকে এবং উনার স্ত্রীকে বলো। তাতেই ও বেগে আশুন।

আমি বুঝলাম না তাতে বেগে আশুন হবার কি?

আমি বুঝতে পারিনি। শাহানা বলেছিল-তুমি এখানে তার স্ত্রীর কথা কেন বললে? তোমার কি ধারণা আমি শুধু তাকে একা খেতে বলব? তা যদি চাইতাম তাহলে তো অনেক আগেই বলতে পারতাম। তা তো বলিনি। বিশী ব্যাপার ভাবী। কাজের লোকদের সামনে হেঁচো-চিৎকার। প্রায় হিস্টিরিয়ার মতো অবস্থা।

শাহানার কথা শুনে তুমি কি বললে?

আমি কিছু বলিনি। যা বলার মনে মনে বলেছি। লোকজনের সামনে সিন ক্রিয়েট করতে চাইনি।

চলো তোমার সঙ্গে যাই, ওকে নিয়ে আসি।

বাদ দিন ভাবী। আপনারা ঘুরে আসুন। নীলগঞ্জ গিয়ে আরো ঝামেলা করবে। আপনাদের আনন্দই মাটি করবে।

আমি সব ঠিক করে দেব।

কোনো দরকার নেই ভাবী। এই ব্যাপারটা আমি ঠিক করতে চাই। বিশ্বাস করুন আমি ভালোমতই করব।

ও খুবই ছেলেমানুষ জহীর। ওর বয়সটা দেখো।

আমি জানি। চলুন নিচে যাই। আপনাদের অনেক গোহুগাহ্ বাকি। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি আপনাদের ট্রেনে তুলে দেবে।

শারমিন না যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মনোয়ারা নতুন করে কথা তুললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে গত ক'দিন ধরেই তিনি চোঁচামেচি করছেন। রফিকের সঙ্গে একদিন তুমুল ঝগড়া হলো। শারমিন এ বাড়িতে আসছে না কেন এর জবাবে রফিক বিরক্ত হয়ে বলেছে-আমি কি করে বলব? সেটা শারমিনকে জিজ্ঞেস করো। ওই তার ব্যাপার। হয়তো এ বাড়ি তার ভালো লাগছে না।

এ বাড়ি ভালো লাগবে না কেন?

খুব সম্ভব তোমার জন্যেই লাগে না। দিন-রাত কাঁচ কাঁচ করো।

দিন রাত ক্যাচ ক্যাচ করি।

রফিক এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেটে পড়ল। মনোয়ারা সারাদিন হৈচৈ করে কাটালেন। আজ আবার শুরু হলো। নীলু টিফিন কেয়িয়ারে খাবারদাবার ভর্তি করছিল। মনোয়ারা তাকে ধরলেন-বৌমা হচ্ছেটা কি? নিলু বিম্বিত হয়ে বলল, কিসের কথা বলছেন?

ছোট বৌমা এ বাড়িতে আসে না কেন?

নীলু বলল, অনেকদিন পরে বাবার বাড়ি গিয়েছে, কটা দিন থাকছে থাকুক না। নীলগঞ্জ থেকে ফিরে এসে আমি ওকে এ বাড়িতে নিয়ে আসব। এখন নিজের বাড়িতেই থাকুক।

নিজের বাড়ি তুমি কি বলছ? বিয়ের পর মেয়েদের বাড়ি থাকে একটাই। সেটা হচ্ছে স্বামির বাড়ি।

আপনাদের সময় তাই ভাবা হতো। এখন দিনকাল পাণ্টেছে।

কি রকম পাণ্টেছে? এখন বুঝি আর স্ত্রীরা স্বামীদের বাড়িতে থাকে না? তাহলে তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?

নীলু কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, আপনার কি সব গোছগাছ হয়েছে মা?

গোছগাছ আর কি করব? আমার হলো গিয়ে মাথার ঘায়ে কুস্তা পাগল অবস্থা। সংসারে কি শুরু হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না।

রাত আটটায় স্টেশনের দিকে রওনা হবার কথা। হোসেন সাহেবের দেখা নেই। শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে। দুটি খুবই প্রয়োজনীয় অমুখ তাঁর সঙ্গে নেই একটি হচ্ছে নাকস ভূমিকা অন্যটি পালসেটিলা। গ্রামে যাচ্ছেন দরকারের সময় হাতের কাছে অমুখ পাওয়া যাবে না। বিপদে পড়তে হবে। তিনি কাউকে কিছু না বলে অমুখের খুঁজে গেলেন।

ফিরলেন রাত সাড়ে আটায় যখন সবাই প্রায় নিশ্চিত যাওয়া হবে না। স্টেশনে রওনা হবার সময়ও কেউ জানে না ট্রেন ধরা যাবে কি যাবে না। ট্রেন অবশিষ্ট ধরা গেল। এবং ট্রেন ছেড়ে দেবার পর জানা গেল তাড়াহুড়ায় মনোয়ারার স্যুটকেসটাই আনা হয়নি। তিনি মুখ হাঁড়ির মতো করে নীলুকে বললেন, আমার জিনিসের দিকে কেউ কি আর লক্ষ রেখেছে? তা রাখবে কেন? আমি কি একটা মানুষ।

ট্রেনে ওঠার উত্তেজনা, নতুন জায়গায় যাওয়ার আনন্দে টুনীর জ্বর এসে গেল। হোসেন সাহেব তাকে এক ফাঁটা পালসেটিলা টু হানড্রেড খাইয়ে হাঙ্গামা সফিককে বললেন-অমুখটা সঙ্গে না থাকলে কি অবস্থা হতো চিন্তা করেছিস? তোরা স্ত্রীরা হৈচৈ করিস, কিছু বুঝিস না।

টুনীর জ্বর এসে যাওয়ায় তাকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হলো।

কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম। রজনী নিঝুম। ট্রেন ছুটে চলেছে। গুরুগায়ে অনেকক্ষণ লেট করেছে সেটা বোধ হয় কাটিয়ে উঠতে চায়। নীলু ছাড়লো নাকস সবাই ঘুমিয়ে। নীলুর ঘুম আসছে না। শীতের দিন। জানালার কাচ উঠানো হচ্ছে না। তার খুব ইচ্ছে করছে কাচ উঠিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে-অন্ধকার গ্রামের উপর হালকা জোছনা। কে জানে আজ হয়তো জোছনা হয়নি। গাড়ি আধারে চারদিক ঢাকা। মাঝে মাঝে দূরে-বহু দূরে কুপি জ্বলছে। কোনো জায়গায় লক্ষ লক্ষ জোনাকি একসঙ্গে জ্বলছে আর নিভছে। বন্ধ ট্রেনের

কামরা থেকে এসব দৃশ্যের কিছুই দেখার উপায় নেই। নীলু মেয়ের কপালে হাত রাখল। জ্বর মনে হয় আরো বেড়েছে। সে তার উপর কয়লটা ভালোমত টেনে দিল। মাথা কাত হয়ে ছিল-সোজা করে দিল।

সফিক বলল, চান্কে কি চা আছে নীলু?

আছে। তুমি ঘুমাওনি?

উই চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিলাম। গাড়িতে আমার ঘুম আসে না।

সফিক উঠে নীলুর পাশে বসল। নীলু কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, মেয়েটা দু'দিন পর পর জ্বরে ভোগে, ওকে একজন ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার।

ঢাকায় ফিরেই একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আমাকে মনে করিয়ে দিও।

নীলু বলল, জানালাটা একটু খুলে দেবে? বাইরের দৃশ্য দেখব।

ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকবে।

অল্প একটু খোলো।

সফিক পুরোটাই খুলে দিল। আকাশে চাঁদ নেই তবু নক্ষত্রের আলোয় আবছাভাবে সব কিছু চোখে পড়ে। নদীর পানি ঝিকঝিক করে জ্বলে। খোলা মাঠ থেকে চাশা আলো বিচ্ছুরিত হয়। কি অদ্ভুত লাগে দেখতে। এইসব দৃশ্য যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। এদের হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়।

তারা চারদিন কাটাল নীলগঞ্জে।

টুনির আনন্দের সীমা নেই। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ঘরে পাওয়া যায় না। বাবলুর সঙ্গে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরছে। বাবলুও আগের মতো নেই, তার মুখে কথা ফুটেছে। এই ক'দিনেই গ্রামের কথা বলার টান তার গলায় চলে এসেছে। টুনীকে এই ব্যাপারটি খুব অবাক করেছে। সেও টেনে টেনে কথা বলার চেষ্টা করছে। মনোয়ারা যা একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। তিনি টুনীকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেন। পারেন না। তাঁর সবচে' বড় ভয় কখন এই মেয়ে হট করে পানিতে নেমে যায়। চোখে চোখে রেখেও কোনো লাভ হয় না।

সুযোগ পেলেই পানিতে নেমে পড়ে। টুনী পানিতে নেমেছে এই খবর শুনলেই তিনি বিশ্রী বকমের হৈচৈ শুরু করেন। নীলুকে বলেন, তুমি হচ্ছ মা, তোমার গায়ে লাগে না? চুপচাপ আছ। মেয়েটাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখো।

ওর কিছু হবে না মা। ওর সঙ্গে সব সময় একদল ছেলেপুলে থাকে, ওরা দেখবে। গ্রামের ছেলেমেয়ে ওরা হলো পানির পোকা।

কথা সত্যি, টুনির সঙ্গে থাকে বিরাট এক বাহিনী। শওকত একদিন এক মহিষ ধরে আনল। বিশাল মহিষ। টকটক রক্তবর্ণ চোখ, বাকানো শিং। মনোয়ারা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন-কি সর্বনাশ। এই আজরাইল উঠানে কেন? শওকত হাসি মুখে বলল-বড় ঠাণ্ডা জানোয়ার, টুনির জন্যেই আনলাম।

কি বলছ তুমি? টুনী এটা দিয়ে কি করবে?

উপরে বসব।

পাগল নাকি?

খুব ঠাণ্ডা জানোয়ার।

বের হও। এক্ষুণি এটা নিয়ে বিদেয় হও। পাগলের কারবার। বলে কি ঠাঞ্জ জানোয়ার।

শওকত মহিষ নিয়ে বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই মনোয়ারা আতংকিত হয়ে লক্ষ করলেন টুনী সেই মহিষের পিঠে। মহিষ গনাইলক্ষরি চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পেছনে একদল ছেলেপুলে। নীলু মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছে। সে বলল, একটা ক্যামেরা থাকলে ভালো হতো। ছবি তুলে রাখা যেত। সুন্দর লাগছে না মা?

মনোয়ারা চোঁচিয়ে উঠলেন, এর মধ্যে তুমি সুন্দর কি দেখলে? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এক্ষুণী ঝাড়া দিয়ে গা থেকে ফেলে নিবে।

নীলুকে তেমন উদ্ভিগ্ন মনে হলো না। হোসেন সাহেব এই দৃশ্য খুব মজা পেলেন। মহিষের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলেন।

সফিক খুব আগ্রহ নিয়ে সুখী নীলগঞ্জের কর্মকাণ্ড ঘুরে ঘুরে দেখল। এতটা সে আশাই করেনি। এতদিন সে এটাকে একজন বুড়ো মানুষের শখের ব্যাপার বলেই ধরে নিয়েছিল। এখন কাণ্ডকারখানা দেখে হকচকিয়ে গেছে। লাইব্রেরি ঘরে রাজ্যের বই। এত বই শহরের কোনো লাইব্রেরিতেও নেই। দু'টো পত্রিকা আসে এই গণগ্রামে। সফিক অবাক হয়ে বলল, কে পড়ে এই পত্রিকা? আপনি পড়েন সেটা বুঝতে পারি। আর কে পড়ে?

ডাক্তার বাবু পড়েন। হরিনারায়ণ বাবু।

ডাক্তার আছে নাকি?

ডাক্তার ঠিক না। সরকারি হাসপাতালের কম্পাউন্ডার ছিলেন, এখন রিটায়ার করে এই গ্রামে আছেন।

ও আচ্ছা।

গ্রামের লোকজনও কেউ কেউ পত্রিকা নাড়াচাড়া করে। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা একজন পত্রিকা পড়ে শুনায়। অনেকেই শুনতে আসে।

বলেন কি?

কবির মামা যে কাজ শুরু করেছিলেন তার সুফল দিতে শুরু করেছে।

কি রকম সুফল?

সোবাহান হাসতে হাসতে বলল, নীলগঞ্জের মেয়েদের বিয়ের বাজারে খুব কাটতি। আশেপাশের গ্রামের সবাই মনে করে নীলগঞ্জের মেয়ে মানে আদব-কায়দার মেয়ে। এখানকার কোনো মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেয়া হয় না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কবির মামার নিষেধ ছিল। যৌতুক নিয়ে কোনো মেয়ের বিয়ে দেয়া হবে না। কবির মামার জীবদ্দশায় এটা মানা হতো না। এখন মানা হয়।

আমার তো ভাই রূপকথার মত লাগছে।

আসলেই রূপকথা। বেশিরভাগই হয়েছে উনার মৃত্যুর পরে। যেমন গ্রামের ভেতরের রাস্তাগুলি। কেউ নিজের জায়গার এক ইঞ্চি ছাড়তে রাজি নয়। মামা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। লাভ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের দিন সবাই ঠিক করল কবির মাষ্টার যেসব রাস্তা চেয়েছিলেন, সেগুলি করে দেয়া হবে। করাও হলো তাই। লোকটি যখন বেঁচে ছিল তার মর্ম কেউ বোঝেনি।

আপনি কি উনার বাকি কাজ শেষ করতে নেমেছেন?

হ্যাঁ তাই।

কি মনে হয়, পারবেন?

হয়তো পারব। খুবই কঠিন কাজ। দীর্ঘদিনের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অস্বকার চট করে এগুলি যায় না। সময় লাগে। আমিও হয়তো পারব না, অন্য একজন আসবে। এটা হচ্ছে একটা চেইন রিএকশন। গুরুটাই মুশকিল। একবার গুরু হলে চলতে থাকে।

ঠিক বলেছেন। গুরুটাই ডিফিকাল্ট।

গ্রামের লোকদের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে আমি খানিকটা প্রতারণাও করছি। তাও কাজে লাগছে।

আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। কি ধরনের প্রতারণা?

নামাজ পড়ছি নিয়মিত। যদিও ধর্ম, বিধাতাপুরুষ এসব জিনিসে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু যেহেতু ধর্মপ্রাণ মানুষদের জন্যে গ্রামের লোকদের খুব মমতা আমি তার সুযোগ নিচ্ছি।

সফিক হেসে ফেলে বলল, কে জানে একদিন হয়তো দেখা যাবে তান করতে করতে আপনি ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। বেরুতে পারছেন না। বিরাট বুজুর্গ ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

হতে পারে। পৃথিবী বড়ই রহস্যময়। রহস্যের কোনো শেষ নেই।

ঢাকায় ফেব্রার আগের রাতে পিঠা বানানোর উৎসব হলো। সেই উৎসবে গ্রামের মেয়েরা দলবেঁধে যোগ দিল। টুনী এক ফাঁকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে সবাইকে দাওয়াত করে এসেছে। উঠোনে খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনে তৈরি হচ্ছে পোড়া-পিঠা। বিশাল আকৃতির কদাকার পিঠা। আগুনে পোড়ার পর পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন তা কেটে দুধে জ্বল দিয়ে ঝাওয়া। শওকত কোথা থেকে এক গাতক ধরে এনেছে। সে একটু দূরে তার একতায় নিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে পুরুষদের একটা দল। গাতকের নাম কেরামত মিয়া। তার গলায় সুর তেমন নেই। সুরের অভাব সে পূরণ করেছে আবেগে। একটি চরণে টান দেবার পরই তার চোখ ছলছল করতে থাকে। তৃতীয় চরণে যাবার আগেই চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ে। গাতক কেরামত মওলা গান ধরে-

“নিমের পাতা তিতা তিতা

জামের পাতা নীল,

কোথায় আমার প্রাণের মিতা

কোথায় বন কোকিল?”

সবাই স্তব্ধ হয়ে গান শুনে। পুরানো সব দুঃখ হৃদয়ের অন্তর গহ্বর থেকে ভেসে ওঠে। বড়ই মন খারাপ করে সবাই। তবু ভালো লাগে। হৃদয়ের গহিনে চাপা পড়ে থাকা দুঃখগুলি মাঝে মাঝে দেখতে আমরা ভালোবাসি। সেই সুযোগ বড় একটা হয় না। কেরামত মওলার মতো গ্রাম্য গাতকরা কখনো কখনো তা পারেন। তাঁদের সাহায্য করে প্রকৃতি।

উঠানে আশুন জ্বলছে। তাকে ঘিরে বসে আছে বৌ-ঝিরা। আকাশে ছোট্ট একটা চাঁদ। তার হিম হিম আলো পড়েছে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে। শীতল কনকনে হাওয়া বইছে। দুঃখ জাগানিয়া পরিবেশ তো একেই বলে।



নীলুরা ঢাকায় পৌছান সোমবার ভোরে। নীলুর ইচ্ছা ছিল সোমবারে অফিস ধরা। তা করা গেল না। নটা বাজতেই জহীর এসে উপস্থিত। জহীর বলল, আমার সঙ্গে একটা আসতে হবে ভাবী। দশ মিনিটের জন্যে। আমি আপনাকে অফিসে পৌঁছে দেব।

ব্যাপার কি বলো তো?

তেমন কিছু না। আবার কিছুটা আছেও। ভাবী একটু চলুন আমার সঙ্গে।

বেশ চলো। আমি কাপড় বদলে নেই। তোমরা ভালো ছিলে তো?

জহীর শুকনো গলায় বলল, ভালোই ছিলাম। টুনী কোথায় ভাবী?

ওর বাবার সঙ্গে গিয়েছে। ওর শরীরটা ভালো না, জ্বর। যাবার সময়ও জ্বর নিয়ে গিয়েছে। ফেরার পথেও জ্বর নিয়ে ফিরল।

জামাইয়ের খোজ পেয়ে হোসেন সাহেব বেরিয়ে এলেন। নীলগঞ্জের বিস্তারিত গল্প জুড়ে দিলেন।

রাস্তাঘাট চেনা যায় না। বড় একটা রাস্তা করে ইট বিছিয়ে দিয়েছে। রিকশা চলে। ইচ্ছা করলে তুমি গাড়ি নিয়েও যেতে পারবে। এইটুকু গ্রামে চারটা টিউবওয়েল। দাতব্য চিকিৎসালয় একটা করেছে, অমুখপত্র অবশ্য তেমন নেই। আসলে দরকার ছিল একটা হোমিও হাসপাতাল। অমুখ সন্তা, ইচ্ছা করলে বিনামূল্যে দেয়া যায়। তাই না?

জহীর বিরস মুখে হ্যাঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে। তাকে নেবে যে কেউ বলে দিতে পারবে সে কিছুই শুনেছে না। তার মন অন্য কোথাও। হোসেন সাহেব অবশ্য বুঝতে পারছেন না। তিনি উৎসাহের সঙ্গে একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছেন। নীলু কাপড় বদলে তৈরি হয়ে এসেছে তখনো তাঁর গল্প থামেনি। নীলুকে বললেন, পাঁচটা মিনিট দেবি করো মা। জহীরের সঙ্গে একটা দরকারি কথা বলছি। তুমি বরং এর মধ্যে আমাদের জন্যে চট করে চা বানিয়ে আনো। আমারটার চিনি কম।

নীলু চা আনতে গেল। হোসেন সাহেব শুরু করলেন মহিষের গল্প।

মহিষ দেখেছ নাকি জহীর?

দেখব না কেন?

আরে না। ঐ দেখার কথা বলছি না। কাছ থেকে দেখো। প্রাণী হিসেবে মহিষ অসাধারণ। বড় ঠাণ্ডা প্রাণী। দেখতেই বিশাল কিন্তু এর মনটা শিশুদের মতো।

তাই বুঝি?

আমি অবাক হয়েছি। এই টুনী, পর্বতের মতো এক মহিষের পিঠে বসে থাকত। সে দিব্যি বসে আছে আর মহিষ নিজের মনে হেলেদুলে ঘাস খাচ্ছে।

বাহ্ চমৎকার তো।

জিনিসটা নিয়ে আমি ট্রেনে আসতে আসতে অনেক চিন্তা করলাম। আমার ধারণা মহিষকে যদি ঠিকমত ট্রেনিং দেয়া যেত তাহলে ঘোড়ার মতো একে ব্যবহার করা যেত। এই জিনিসটা কারোর মাথায় খেলেনি। তুমি কি বলো?

হতে পারে।

মহিষের পিঠে বসাও খুব আরামের। পিঠ অনেক চওড়া। জীন ব্যবহার করার দরকার হতো না।

শেষ পর্যন্ত জহীর বলতে বাধ্য হলো, আমি পরে এসে দাকিটা গুনব। আমার একটা বিশেষ জরুরি কাজ।

সন্ধ্যাবেলা চলে এসো। শাহানাকে নিয়ে এসো, অনেক গল্প বাকি রয়ে গেছে।

আচ্ছা দেখি।

দেখাদেখির কিছু না। নিয়ে আসবে। রাতে আমাদের সঙ্গে থাকবে। মনে থাকে যেন।

জি মনে থাকবে।

আসল গল্পগুলিই বলা হয়নি।

জহীরের কথা শুনে নীলু আকাশ থেকে পড়ল। তার মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না। সে বহু কষ্টে বলল, এসব তুমি কি বলছ?

যা ঘটেছে তাই বললাম।

আমাদের খবর দিলে না কেন?

আপনারা আনন্দ করতে গিয়েছেন, এর মধ্যে ইঠাৎ.....তবু খবর নিশ্চয়ই দিতাম। দেখলাম খবর না দিয়ে যদি পারা যায়।

শাহানা এখন আছে কেমন?

এখন ভালো।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে?

ই্যা। গতকাল সন্ধ্যায় বাসায় এনেছি।

কথা হচ্ছিল জহীরদের বাড়ির একতলায়। নীলু বলল, তুমি আবার গোড়া থেকে বলা কি হয়েছে।

আপনারা যেদিন নীলগঞ্জ গেলেন ঐদিনই ঘটনা ঘটল। সারাদিন দরজা বন্ধ করে ছিল। রাত দশটার সময় কাজের মেয়েটা বলল-সে নাকি ধপ করে কি পড়ার শব্দ শুনেছে। আমি দরজা খান্কা দিলাম। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম। তখনো বুঝতে পারিনি ঘুমের অধুধ খেয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন। যমে-মানুষে টানাটানি কাকে বলে এই প্রথম দেখলাম। ডাক্তারদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে ভাবী। ওরা অসাধ্য সাধন করেছে।

নীলু উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, আমি শাহানার কাছে যাচ্ছি। জহীর বলল, আমিও কি আসব?

না তোমার আসার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাকো।

কড়া কথা কিছু বলবেন না ভাবী, মনের খেঁচাবস্থা।

আমি সেটা দেখব। তোমাকে ভাবতে হবে না।

শাহানা নীলুকে দেখে হাসি মুখে বলল, কবে ফিরলে ভাবী?

আজই ফিরলাম। তুমি আছ কেমন?

এই আছি। আমার কাছে থাকা না থাকা সমান।

তোমার কোনো লজ্জা লাগছে না?

লজ্জা লাগবে কেন?

ভবিষ্যতে যদি মরার চেষ্টা করো এমনভাবে করবে যেন বেঁচে ফিরে আসতে না হয়।

কি বলছ তুমি ভাবী?

খবরদার আমাকে ভাবী বলবে না। ফাজিল মেয়ে।

শাহানা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। নীলুব এই উগ্রমূর্তি সে কখনো দেখেনি। নীলু রুদ্ধ গলায় বলতে লাগল,

এতটুকু মেয়ে ছিলে। চোখের সামনে বড় হয়েছ। কত আদর কত মমতা। আর এই মেয়ে এমন করে? তোমার মরার উচিত। তুমি উঠে আসো। দোতলা থেকে আমার সামনে নিচে লাফিয়ে পড়ো। এসো বলছি।

এই বলেই সে সত্যি সত্যি শাহানার হাত ধরে খাট থেকে নামল।

শাহানা কিছু বোঝার আগেই নীলু গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। শাহানা কাত হয়ে খাটে পড়ে গেল। সে চোখ বড় বড় করে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। তার ফর্সা গালে আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে। যেন সেখানে রক্ত জমে গিয়েছে। নীলু কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপর একটি কথা না বলে নিচে নেমে গেল। জহীরকে বলল, তুমি এখন শাহানার কাছে যাও। আমি চলে যাচ্ছি।

আসুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসছি।

তোমাকে পৌছে দিয়ে আসতে হবে না। তোমাকে যা করতে বললাম করো।

জহীর দোতলায় উঠে এলো। শাহানা চূপচাপ খাটে বসে আছে। মাথায় ঘোমটা। শাড়ির আঁচল এমনভাবে টানা যে মুখ দেখা যাচ্ছে না। জহীরকে দেখে সে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। হাসিমুখেই বলল, ভাবী আমাকে মেবেছে। জহীর বিস্মিত হয়ে বলল, সে কি? দেখো না গালে দাগ বসে গেছে।

গালের দাগ দেখাতে গিয়ে শাহানা আবার হাসল। মৃদু স্বরে বলল, ভাবী এর আগে আরো একবার আমাকে চড় দিয়েছিল। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। আমার এক বান্ধবী খুব খারাপ একটা বই দিয়েছিল আমাকে। কুৎসিত সব ছবি ছিল সেই বইটাতে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছিলাম। আমার হাতে এই বই দেখে ভাবী কি যে অবাক হলো। কেমন অবসন্নভাবে আমার দিকে তাকচ্ছিল। তারপর আমি কিছু বোঝার আগেই একটা চড় মারল আমাকে। হাত থেকে বই কেড়ে নিল না বা কিছু বলল না। এই ঘটনার কথা কাউকে বললও না। আমি কি যে লজ্জা পেয়েছিলাম। আজ আবার সেদিনের মতো লজ্জা পেলাম।

জহীর লক্ষ্য করল শাহানা কাঁদছে। খুব সহজেই সেই কান্নাও তার খেমে গেল। চোখ মুছে বলল, আমাকে ভাবীর কাছে নিয়ে চলো।

এখনি যাবে?

হ্যাঁ। আমার এই ব্যাপারে ভাবী খুব কষ্ট পেয়েছে। আরেকটা কথা তোমাকে বলি-আমি আর কোনোদিন এরকম করব না।

ডাই নাকি?

মাঝে মাঝে আমার এ রকম হয়। মনে হয় কেউ আমাকে ভালোবাসে না। তখন অদ্ভুত সব কাণ্ড করি। ক্রাস নাইনে যখন পড়ি তখন একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। স্থলে যাবার নাম করে বের হয়ে সোজা হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে সাত্রাবাড়ি বলে একটা জায়গা সেখান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।

তার পর।

এখান থেকে ফিরে এসেছি। কেউ জানে না। কাউকে বলিনি। আমি বোধ হয় একটু পাগল। একটু না। অনেকখানি। তোমাকে আমি খুব ভালো একজন ডাক্তার দেখাব। দেখিও। তুমি আমার উপর রাগ কর নিতো?

না!

সত্যি না?

হ্যাঁ সত্যি।

আমার গা ছুঁয়ে বলো।

জহীর হেসে ফেলল। তার সঙ্গে গলা মিনিয়ে হাসল শাহানা। জহীর মুখ চোখে শাহানার দিকে তাকিয়ে আছে। কি অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী-কুঁচ বরণ কন্যারে তার মেঘ বরণ চুল।

শাহানা।

বলো। তোমার গান কেমন এগুচ্ছে?

মোটাই এগুচ্ছে না। সকালবেলা উঠে ভ্যা ভ্যা করতে আমার ভালোও লাগে না। আমি আর গান শিখব না। আমি পড়াশোনা শুরু করব।

খুব ভালো কথা।

মাটার-টাটার রাখতে পারবে না। আমি নিজে নিজে পড়ব।

সেতো আরো ভালো।

কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত?

আমি যতক্ষণ পড়ব তুমি আমার পাশে বসে থাকবে। চুপচাপ বসে থাকবে।

শর্ত খুব কঠিন বলে তো মনে হচ্ছে না।

জহীর কিছু বোঝার আগেই শাহানা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। জহীর কিছু বলল না, শাহানার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।



ডাক্তার সাহেবের চেহারা রাশভারী। মাথাভর্তি নিকল ইসলামের মতো বাবড়ি চুল। কথাও বলেন খুব কম। ঘন ঘন নিজের মগধাচুল টানেন। দেখে মনে হয় কোনো কারণে খুব রেগে আছেন। কঠোরটি খুব সুন্দর। শুনতে ভালো লাগে। এই জন্যই বোধ হয় নিজের গলার স্বর বেশি শুনতে চান না।

তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে টুনীকে দেখলেন। আজকালকার ব্যস্ত ডাক্তাররা এত সময় রুগীদের দেন না। ইনিও ব্যস্ত। ইনার ওয়েটিং রুগী গিজগিজ করছে। তবু প্রতিটি রুগীকে অনেকখানি সময় দিচ্ছেন।

ওর এই জ্বর জ্বর ভাব, এটা প্রায়ই হয় বলছেন?

জ্বি।

এর আগে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?

না। বাবা হোমিওপ্যাথি করেন। টুকটাক অযুধ দেন। সেরে যায়।

ও আচ্ছা আপনার মেয়ে তো খুব রূপবতী। পুতুল পুতুল দেখাচ্ছে। কি খুকি তুমি কি পুতুল?

টুনী হেসে ফেলল। ডাক্তার সাহেব ক'গজে অতি মনোযোগের সঙ্গে কি যেন লিখতে লাগলেন। আগের মতো সুরেলা মিষ্টি স্বরে বললেন, আমি এখানে কিছু স্পেসিফিক টেস্টের কথা লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলি করাতে হবে। সব জায়গায় টেস্ট ভালো হয় না। কোথায় করাবেন তাও লিখে দিচ্ছি।

আপনার সঙ্গে আবার তাহলে কখন দেখা করব?

আপনি আজ দেখা করবেন। রাত আটটা পর্যন্ত আমি বাসায় থাকব। আপনি রিপোর্টগুলি নিয়ে বাসায় চলে আসবেন।

সফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার সাহেব বললেন, বাসার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলি জরুরি ভিত্তিতে করানোর জন্যে যা প্রয়োজন আপনি অবশ্যই করবেন।

আপনি কি আশংকা করছেন?

কিছুই আশংকা করছি না। যা বলার রিপোর্টগুলি দেখে তারপর বলব।

ওর তো তেমন কিছু না, সামান্য জ্বর-জারি সর্দি।

আমি খুবই আশা করছি ওর কিছু না, সামান্য ব্যাপার। তবু আপনাকে যা করতে বললাম করবেন। মেয়েকে সন্ধ্যাবেলা অন্যর দরকার নেই।

আপনার কথায় কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে।

স্যরি। আপনাকে যা করতে বললাম করবেন।

ডাক্তার সাহেবের বাসায় পৌছাতে পৌছাতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন। সফিককে দেখে বললেন, আমি ভাবছিলাম আসবেন না বুঝি।

ব্লাড রিপোর্টটা পেতে একটু দেরি হয়ে গেল।

বসুন আপনি।

ডাক্তারের স্ত্রী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন-কতক্ষণ লাগবে তুমি।

অল্প কিছুক্ষণ। পাঁচ মিনিট। তুমি গাড়িতে অপেক্ষা করো। অদ্রমহিলা তিত্ত গলায় বললেন, বাসাতেও যদি তুমি এসব ঝামেলা করো তাহলে আমি যাব কোথায়?

বললাম তো পাঁচ মিনিট।

ডাক্তার সাহেব সব ক'টি রিপোর্ট টেবিলে ঝিঁয়ে দিলেন। তিনি কিছু দেখছেন বলে মনে হলো না। রিপোর্টগুলি আবার একটির উপর একটি সাজিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে

মাথার চুল টানলেন। সফিক বলল, কি দেখলেন? ডাক্তার কিছু বললেন না। সফিক আবার বলল, কি দেখলেন?

আপনার মেয়ের একটা খুব খারাপ অসুখ হয়েছে। হজকিনস ডিজিজ। এক ধরনের লিউকেমিয়া। লোহিত রক্তকণিকা গঠিত সমস্যা। অসুখটা খুবই খারাপ। এর বিরুদ্ধে আমাদের হাতে এখনো তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। তবে বিদেশে প্রচুর কাজ হচ্ছে ইফেকটিভ কেমিথেরাপি-ডেভেলপ করেছে। এতে লাইফ এক্সপেকটেনসি অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়া গেছে। এই ফিল্ডে প্রচুর গবেষণাও হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে মোক্ষম অসুখ বেরিয়ে আসবে। সেই মুহূর্তটি আগামীকালও হতে পারে।

বাইরে ভ্রমহিলা ক্রমাগত গাড়ির হর্ন দিচ্ছেন। পাঁচ মিনিট সম্ভবত হয়ে গেছে। তিনি আর দেবি সহ্য করতে পারছেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, আপনাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দেই?

দিন।

তিনি পানি এনে দিলেন। শান্ত স্বরে বললেন, আপনার যদি টাকা-পয়সা থাকে মেয়েকে জার্মানি পাঠিয়ে দিন। জার্মানির এক হাসপাতালে আমি দীর্ঘদিন পোস্টডক করেছি, আমি সব ব্যবস্থা করব।

আমার মেয়ে ভালো হবে?

হতে পারে। তবে এটা কালান্তক ব্যাধি, এটা আপনাকে মনে রেখেই এগুতে হবে। মেডিক্যাল সায়েন্স প্রাণপণ করছে। আমার মন বলছে খুব শিগগিরই কিছু একটা হবে। আগামীকাল, আগামী পরশ, আগামী মাস কিংবা আগামী বৎসর। আশা হারাবার মতো কিছু নয়।

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী এসে ঢুকলেন। তীব্র গলায় বললেন-ভুঁ কি যাবে-না যাবে না? যাব। চলো আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে।

সফিক উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। ডাক্তার সাহেব গভীর মমতায় সফিকের হাত ধরলেন। বললেন- আসুন আমি আপনাকে বাড়ি পৌছে দেব।

দরকার নেই। আপনাদের দেবি হয়ে যাবে।

হোক দেবি।

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী বিড়বিড় করে কি বললেন। সফিক তা শুনল না শুধু শুনল ডাক্তার সাহেব বলছেন-আমি প্রথমে ইনাকে বাসায় পৌছে দেব। তোমার পছন্দ হোক না হোক আমার কিছু করার নেই।



কিছু কিছু গল্প আছে যা কখনো শেষ হয় না। এইসব দিন-রাত্রির গল্প তেমনি এক শেষ না হওয়া গল্প। এই গল্প দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর চলতেই থাকে। ঘরের চার দেয়ালে সুখ-দুঃখের কত কাব্যই না রচিত হয়। কত গোপন আনন্দ কত লুকানো

অশ্রু। শিতরা বড় হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সাত্রা করে অনির্দিষ্টের পথে। আবার নতুন শিতরা জন্মায়।

অজ্ঞ এই বাড়িতে নতুন একটি শিত জন্মাবে। সে রহস্যময় এই পৃথিবীতে পা রাখার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাতৃগর্ভের অন্ধকার তার অসহ্য বোধ হয়েছে।

শিতটি শাহানার। শাহানা এই বিরাট খবরটা এখনো টের পায়নি। তার বোধগম্য ধারণা এমনিতেই তার খারাপ লাগছে। তবু সে নীলুকে এসে বলল, ভাবী আমার শবীষ্টা ভালো লাগছে না। নীলু আথকে উঠে বলল, ভালো লাগছে না মানে? কেমন লাগছে? বুঝতে পারছি না ভাবী, কেমন যেন পিপাসা লাগছে। আর...

আর কি?

জানি না ভাবী, বড় ভয় লাগছে।

নীলু পাশের বাড়ি থেকে জহীরকে টেলিফোন করল। সে তার চেয়ারে নেই, বাসায়ও নেই। বাসায় ফিরবে সন্ধ্যার পর। কিংবা কে জানে হয়তো সরাসরি চলে আসবে এ বাড়িতেই। কি সর্বনাশা কাণ্ড! নীলু অস্থির হয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব এবং মনোয়ারা দু'জনের কেউই বাসায় নেই। যাত্রাবাড়ি গিয়েছেন। ফিরতে ফিরতে রাত নটা।

শাহানা বলল, ভাবী আমার কি সময় হয়ে গেছে?

বুঝতে পারছি না শুয়ে থাকো। এখনো কি আগের মতো খারাপ লাগছে!

না এখন আর আগের মতো খারাপ লাগছে না। তুমি আমার পাশে বসে থাকো।

নীলু বসল তার পাশে। শাহানা লাজুক স্বরে বলল, আমি জানি আজই সেই দিন।

কি করে জানলে?

দেখছ না বাসায় একটা মানুষ নেই, শুধু তুমি আর আমি। টুনির জন্মের সময়ও তো এরকম হলো। তোমার মনে নেই ভাবী?

নীলু জবাব দিল না। বিকেলের স্নান আনোয় তার চেহারাটা দ্রুত অন্যরকম হয়ে গেল। টুনির কোনো কথা সে মনে করতে চায় না। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে না। কারণে-অকারণে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আসে।

টুনি দু'বছর আগে জার্মানীর এক হাসপাতালে মারা গেছে। নিঃসঙ্গ মৃত্যু অবশিষ্ট হয়নি। রুইনবার্গ শহরের সব ক'টি বাড়ালি পরিবার সেদিন হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিলেন। আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছোট বালিকাটিকে ঘিরে বসেছিলেন। টুনি যতবার বলেছে, 'আমার আশ্বি', ততবারই তাঁদের চোখে জল বন্যা নেমেছে। এইসব প্রবাসী বাড়ালিরা চাঁদা তুলে নীলুর জার্মানি ভ্রমণের টিকিট পাঠিয়েছিলেন, যাতে নীলু তার মেয়েটির পাশে থাকতে পারে। অশ্রুকারী নীলু তাতে রাজি হয়নি। বার বার বলেছে ভিল্লার টাকায় আমি যাব না। নীলু এবং সফিক এই দু'জনের জার্মানি যাওয়া-আসা এবং থাকার যাবতীয় ব্যয় শারমিনের বাবা দিতে চেয়েছিলেন। তাতেও কেউ রাজি হয়নি। উনার টিকিট কেন নেবে? শারমিন এবং সফিকের ডিভোর্স হয়ে গেছে। এই পারিবারটির মধ্যে তাদের এখন আর কি সম্পর্ক? কিন্তু একেবারেই কি সম্পর্ক নেই?

শারমিন থাকে আমেরিকায়। টুনির মৃত্যুর আগের দিন আমেরিকা থেকে সে জার্মানি

চলে এলো। টুনী মারা গেল শারমিনের কোলে মাথা রেখে। তার ছোট ছোট হাতে সে সাদাফুই তার ছোট চাটিকে জড়িয়ে ধরে ছিল। যেন হাত ছাড়লেই চাটি কোথাও চলে যাবে। সেইসব হৃদয় ভেঙে দেয়া কাহিনী খুব গুছিয়ে শারমিন লিখেছিল। নীলু প্রায়ই ঐ চিঠি বের করে পড়ে। পড়তে পড়তে তার কান্দতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কান্না আসে না। টুনীর মৃত্যুর পর কি যে হয়েছে সে কান্দতে পারে না। যদিও প্রায়ই তার কান্দতে ইচ্ছা করে।

কতদিন হয়ে গেল টুনী নেই। তবু তার ছোট ফুল আঁকা বালিশ প্রতি রাতেই বিছানায় পাতা হয়। বালিশটা মাঝখানে রেখে একপাশে শোয় সফিক অন্য পাশে নীলু। তারা দু'জনই কল্পনা করে মেয়েটি দু'জনের মাঝখানেই শুয়ে আছে। সফিক মেয়ের গায়ে হাত রাখতে যায়। নীলুও হাত বাড়িয়ে দেয়। টুনীকে তারা খুঁজে পায় না। একজন হাত রাখে অন্যজনের হাতে। শব্দহীন ভাষায় দু'জন দু'জনকে সাধুনার কথা বলে।

কত বদলে গেছে সব কিছু। সবচে' বেশি বদলেছে রফিক। প্রায় রাতেই মন খেয়ে বাড়ি ফেরে। কারো চোখের দিকে তাকায় না। মাথা নীচু করে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। সারাক্ষত তার ঘরে বাতি জ্বলে। বাতি নিভালেই সে নাকি কি সব দেখে। কবির মামা নাকি তাঁর ঘরে হাঁটাইটি করেন। একদিন নাকি টুনীকেও দেখেছে। টুনী তাকে বলেছে তুমি এমন হয়ে গেছ কেন, সবাই তোমাকে খারাপ বলে।

কি করব রে মা। আমি মানুষটাই খারাপ।

তোমাকে খারাপ বললে আমার খুব খারাপ লাগে।

না আর খারাপ হব না। তোকে কথা নিলাম। মন ছেড়ে দিলাম। নো লিকার।

কিন্তু পরদিন আরো বেশি করে খায় যোর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে ফিসফিস করে বলল, সব বাতি জ্বলে রাখবে ভাবী। বাতি নেভালেই গুণ্ডা আসে। বড় বিরক্ত করে। সবচে' বেশি বিরক্ত করে টুনী। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান অসহ্য।

টুনীর কথা নীলু মনে করতে চায় না। তবু বারবার সবাই তাকে টুনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। হোসেন সাহেব শ্রাব্য রাতেই ঘুমের ঘোরে চেঁচান। ও টুনী টুনী নিজের চিংকারে তাঁর নিজেরই ঘুম ভেঙে যায়। বাকি রাতটা তিনি ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কান্দন। নীলু ও সফিক সেই কান্না শুনে। আহ কি কষ্ট! কি কষ্ট! বেঁচে থাকা বড় কষ্টের।

শাহানা বলল, ও ভাবী আবার যেন কেমন লাগছে। ওরা তো কেউ এলো না। আমার বড় ভয় লাগছে। আমাকে তুমি হাসপাতালে নিয়ে যাও।

নীলু উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরুল। আনিস কোথেকে যেন ফিঁসেছে। নীলু বলল, আনিস একটা এম্বুলেন্স নিয়ে আসো তো মনে হচ্ছে শাহনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

আমি এম্বুলি নিয়ে আসছি। আপনি ওর কাছে গিয়ে বসুন।

শাহানার কাছে বসতে ইচ্ছা করছে না। নীলু কোঁকায় এসে দাঁড়াল। রফিকের ঘর হাট করে খোলা। এই সময় সে কখনো ঘরে থাকে না। থাকলে ভালো হতো। প্রয়োজনের সময় কাউকেই পাওয়া যায় না।

ভাবী!

নীলু চমকে তাকাল। রফিক দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে।

হচ্ছে কি ভাবী?

শাহানার পেইন উঠেছে উমি সবাইকে খবর দাও।

এম্বুলেন্স নিয়ে আসব?

এম্বুলেন্স লাগবে না। আনিস আনতে গেছে। তুমি জহীদকে খবর দেবার ব্যবস্থা করে ফ্যাক্সবাড়িতে চলে যাও। বাবা-মাকে নিয়ে এসো।

রফিক চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে লাজুক গলায় বলল, শারমিন এগারো তারিখে দেশে ফিরছে ভাবী। আমাকে চিঠি লিখেছে।

হঠাৎ তোমাকে চিঠি।

আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। চিঠিতে তাই লেখা। আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে।

ভালো খুব ভালো।

রফিক হাসছে। কত দীর্ঘদিন পর নীলু ওর মুখে হাসি দেখল। নীলু ভুলেই গিয়েছিল রফিক হাসতে পারে। ভেতর থেকে শাহানা ভয়ার্ত গলায় ডাকছে ভাবী, ভাবী। নীলু নড়ছে না। অবাক হয়ে দেখছে অনেক দিন পর তাদের পাশের জলা জায়গাটায় ঝাঁকে ঝাঁকে বালি হাস নামছে। পাকিরা শহর পছন্দ করে না। এবার কি হলো তাদের? ঝাঁকে ঝাঁকে পাকি নামছে কেন? বিদ্যুৎ চমকের মতো নীলুর মনে হলো টুণীর জনের সময়ও ঝাঁকে ঝাঁকে হাস নেমেছিল।

নীলু ঘরে ঢুকল। নতুন শিশু আসছে। কত দীর্ঘদিন সে এই পৃথিবীতে থাকবে। হাসবে, খেলবে, গাইবে। তার আগমনের সমস্ত প্রতুতি সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকা চলবে না।

শাহানা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি বারবার কোথায় চলে যাচ্ছ ভাবী?

আর যাব না। এই বনলায় তোমার পাশে।

বড় ভয় লাগছে ভাবী।

নীলু কোমল স্বরে বলল, কোনো ভয় নেই।

ঘরের জানালা খোলা। ঘন হয়ে সন্ধ্যা নামছে। বালি হাঁসের পাখার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। অনেক দিন পর ওরা আবার এলো।

নীলু লক্ষ করল তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। ভুলে যাওয়া কান্না সে আবার ফিরে পেয়েছে। ব্যথায় ছটফট করছে শাহানা। মাড়গর্ভে বন্দি শিশু মুক্তির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কত না বিষয় অপেক্ষা করছে শিশুটির জন্যে।